রুণোদয় সাহা

অরুণোদয় সাহা

কথায় কথায়

আগরতলা, ত্রিপুরা

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি, ২০০৯

অক্ষর বিন্যাস ঃ নিউ হরাইজন, আগরতলা

কথায় কথায়

KATHAY KATHAY

A Collection of Monologues

by Arunoday Saha

প্রচ্ছদ ঃ অপরেশ পাল

ভাষা প্রকাশন-এর পক্ষে প্রকাশ করেছেন কল্যাণব্রত চক্রবর্তী,
'শান্তি কুটির', কৃষ্ণনগর, নতুনপল্লী, আগরতলা-৭৯৯০০১, ত্রিপুরা থেকে।
মুদ্রণ ঃ কমলা প্রেস, ২০৯ এ, বিধান সরণি, কলকাতা-৬।
e-mail : bhasatripura@rediffmail com
web : www.bhasa co in

ISBN : 81-8306-028-5

মূল্য ১১০ টাকা

বাংলাদেশের প্রখ্যাত কথাশিল্পী
হুমায়ূন আহমেদকে
যাঁর আমি একজন অনুরাগী

সূচিপত্র

তালিবানের মা

আফগানিস্তানে তখনও তালিবানদের রমরমা। কারজাই তখনও রাষ্ট্রপতি হননি। তালিবানি সন্ত্রাসে আফগানিস্তানের থরহরি কম্পমান অবস্থা। একজন প্রৌঢ় ধনাঢ্য তালিবানের শরীরটা বেশ কিছুদিন ধরে ভালো যাচ্ছে না। কাবুলের সবচেয়ে নামিদামি হেকিম ডাক্তার গুলে খাওয়া হয়েছে। তাঁরা ভালো করে দেখেছেন — কিছুই বে-ঠিক নেই। তবু সান্ত্বনাব জন্য, ডাক্তারদের মধ্যে একজন এক্স-রে, সোনোগ্রাফি আর মলমূত্র পরীক্ষার পরামর্শ দিয়েছেন। প্যাথলজি ল্যাবরেটরি থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্টগুলো পেতে কয়েকদিন সময় লাগবে। কাঁচা পাকা দাড়িঅলা তালিবান পকেট থেকে একটা তার ভিজিটিং কার্ড বের করে ডাক্তাবের হাতে তুলে দিয়ে বলল — ফিস্, অন্যান্য টাকা পয়সা সব মিটিয়ে দিয়ে গেলাম। আপনি রিপোর্টগুলো দেখে নেবেন। আর যদি কিছু গোলমাল ধরা পড়ে মেহেরবানি করে আমাকে টেলিফোনে জানিয়ে দেবেন। আমি চলে আসব।

ডাক্তার ভিজিটিং কার্ডটি ইতিমধ্যে উল্টেপাল্টে দেখলেন — তাতে পর পর পাঁচটা ফোন নাম্বার রয়েছে। কোন্‌টায় জানাতে হবে রিপোর্ট? ডাক্তারের সংশয় দূর করাব জন্য তালিবান বলল — প্রথম ফোন নাম্বারটি আমার প্রথম স্ত্রীর — আমি ওখানে থাকি না। দ্বিতীয়টা আমাব দ্বিতীয় স্ত্রীর। তৃতীয়টা আমার তৃতীয় স্ত্রীর। চতুর্থটা আমার চার নম্বর বিবির — বর্তমানে যার সঙ্গে আমি থাকি। কিন্তু তারপরেও তো আর একটা ফোন নাম্বার রয়েছে। সেটা কী? সেটা কার? ডাক্তার অবাক হয়ে জিগ্যেস করলেন। তালিবান তখন দুঃখী দুঃখী গলায় বলল, ঐ চার নম্বর বিবির কাছেও আমার সব সময় থাকা হয় না। চিৎকার চেঁচামেচি আর অশান্তিতে আমার জিন্দেগি জেরবার। যখন এক দুই তিন চার — কোনও বিবির কাছেই টিঁকতে পারি না — তখন পাঁচ নম্বর মহিলার কাছে দুদণ্ড শান্তির জন্য চলে আসি। ঐ মহিলা আমার মা। প্রথমে সব জায়গায় ফোন করে কোথাও আমাকে না পেলে — শেষ ফোন নাম্বারটিতে ফোন করবেন — আমি সেখানে থাকবই। সংসারে শান্তির বড় অভাব — যদি এখনও কিছু শান্তি অবশিষ্ট থাকে তবে ঐখানে আমি তা খুঁজে পাই।

ডাক্তার কী বুঝলেন কে জানে! তবে এটা তিনি নিশ্চিত বুঝতে পারলেন — এ

সংসার বড় কঠিন জায়গা। কট্টর নারীবিদ্বেষী একজন তালিবানকেও শান্তির জন্য শেষ অব্দি মায়ের আঁচল খুঁজতে হয়।

ভাড়াটিয়া মা

বেশ কয়েক বছর আগেকার কথা। মনু সাতচান্দের একটা চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছি। আমাদের উল্টোদিকে টেবিলে বসে চা সহযোগে আড্ডা মারছে কয়েকজন স্থানীয় লোক। তাদের মধ্যে একজনের কাঁচাপাকা চুলদাড়ি — প্রৌঢ় গোছের, ভারিক্কি গলা। লোকটা চা খাচ্ছে সুরুৎ সুরুৎ শব্দ করে। তাতে তার ব্যক্তিত্ব অন্যদেরকে ছাপিয়ে যাচ্ছে। কী প্রসঙ্গে যেন লোকটা বলল, মায়ের অজান্তে বাপ নাই। মনের অজান্তে পাপ নাই।

আমি শুনে অবাক হয়ে গেলাম। লোকটির বলার মধ্যে এমন একটা দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে অন্যান্যদের মতো আমিও বিনা প্রতিবাদে মেনে নিলাম। গ্রামের কিছু লোক আছে যারা শেষ কথাটি বলে। শেষ কথাটি বলার অধিকার তারা তাদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা এবং সাংসারিক চড়াই-উৎরাইয়ের শেষে প্রাপ্ত হয়েছে।

'মায়ের অজান্তে বাপ নেই' কথাটি আমাকে দীর্ঘদিন ভাবিয়েছে। এটা কি বিজ্ঞানসম্মত, নাকি নিছক মনগড়া একটা সামাজিক বিশ্বাস? সাতচান্দের চায়ের দোকানের বয়স্ক লোকটির বলার মধ্যে এমন একটা পাণ্ডিত্য প্রকাশ পেয়েছিল যে অবিশ্বাস করতে ভরসা হচ্ছিল না। পরে অবশ্য কিছু পড়াশুনো করে এবং বিশেষজ্ঞ বন্ধুদের কাছে খোঁজখবর করে জেনেছি, 'মায়ের অজান্তে বাপ নেই' কথাটি সর্বাংশে সত্যি নয়। অর্থাৎ মায়ের অজান্তে বা অজ্ঞাতসারে সন্তানের জনক থাকতে পারে বা থাকা সম্ভব। এখন বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির সুবাদে টেস্ট টিউব শিশুর জন্ম হচ্ছে। মায়ের গর্ভে নয়, গর্ভের বাইরে ভ্রূণের মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। তারপর মাতৃগর্ভে সঞ্চারিত করা হচ্ছে প্রাণবিন্দুকে। এসব ক্ষেত্রে মার পক্ষে সঠিকভাবে বলা মুশকিল, বাপ কে? তাছাড়া স্পার্ম ব্যাঙ্ক থেকে অজ্ঞাত কুলশীলের বীর্য নিয়ে মাতৃগর্ভে ডিম্বাণু সহযোগে সন্তানের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা যায়। পিতৃত্বের ব্যাপারে এতকাল সংশয়ের অবকাশ থাকলেও,

নবজাত শিশুর যে কে মা, তা নিয়ে কোনও সংশয় ছিল না। ভূমিষ্ঠ হবার আগে যে জঠরে শিশুটি দশমাস দশদিন থেকেছে, সেই জঠরের মালিকই হল মা। এতকাল তাই আমাদের ধারণা বা বিশ্বাস ছিল। কিন্তু ইদানীং তারও ব্যতিক্রম ঘটছে। সংবাদে প্রকাশ, মেয়ের গর্ভাশয়ে শারীরিক সমস্যা ছিল বলে, মেয়ের প্রৌঢ়া মা তার জঠরে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব সময়ে আশ্রয় দিয়ে সুস্থ সবল নাতিকে জন্ম দিয়েছে। এক্ষেত্রে মা কে? গর্ভধারিণী যদি মা হয়, তবে দিদিমাই মা; মা, মা নয়।

যেসব দম্পতির নিজের সন্তান হবার সম্ভাবনা নেই, তারা দত্তক হিসেবে পুত্র বা কন্যা গ্রহণ করতে পারে। ইদানীং একটা অন্য ধরনের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, সক্ষম দম্পতিরা সন্তানের জনক জননী হতে অভিলাষী হলেও অনেক জননী তার গর্ভে সন্তান ধারণ করতে অনাগ্রহী। তাতে অবশ্য কারোর মা হতে আটকাচ্ছে না। মাতৃগর্ভ ভাড়া পাওয়া যাচ্ছে — উপযুক্ত দাম দিতে রাজি থাকলেই হল। মাতৃজঠর ভাড়া পাওয়া, অনেকটা শহরে বিয়েবাড়ি ভাড়া পাওয়ার মতোই। বিয়ের অনুষ্ঠানে অতিথি অভ্যাগতরা এল, খাওয়া-দাওয়া করল, নোংরা হল উঠোন ঘর-দুয়ার, তারা চলে গেল। ভাড়াটে বিয়েবাড়ির ওপর দিয়ে গেল ঝড়ঝাপটা। শুধু পয়সা দিলেই হল, ঝুটঝামেলা পোয়াবে অন্যেরা। সব পরে পরে। সন্তানের জন্ম দেওয়া তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। ঝুঁকিটা অন্য কেউ বহন করলে মন্দ হয় না। পরিবারে আর্থিক সাচ্ছল্য যত বাড়ছে, ততই বাড়ছে অন্যের কাঁধে ঝুঁকি চাপিয়ে দেবার প্রবণতা।

ইদানীং পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে মাতৃজঠর ভাড়া নেবার এবং দেবার একটি নতুন বাজার গড়ে উঠছে। গুজরাতের একটি আধাশহর আধাগ্রামের মায়েরা-বউয়েরা তাদের মাতৃগর্ভ ভাড়া দিতে আগ্রহী। বিদেশ থেকে অনাবাসী ভারতীয়েরা এখানে মাতৃগর্ভ ভাড়া নিতে ভিড় করতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে দুটি সন্তানের জননী যে কিনা তার গর্ভ ভাড়া দিতে রাজি, সে জানিয়েছে, উপযুক্ত মূল্য পেলে তার জঠরটিকে অন্যের সন্তানকে রেখে ভূমিষ্ঠকাল পর্যন্ত লালন করার জন্য ব্যবহার করতে দিতে সে প্রস্তুত। খোলাখুলি কেউ কিছু না বললেও, মাতৃজঠরের জন্য ভাড়ার মূল্য বর্তমানে পঞ্চাশ হাজার থেকে দেড় লাখ টাকার মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। এই টাকাতে অনেক পরিবারের দারিদ্র্য অনেকাংশে দূর হবে। নিজস্ব সন্তানের স্বাস্থ্যশিক্ষা এবং পরিবারটির জন্য বাসস্থান আরও সহজলভ্য হবে এবং জীবন হবে আর একটু কম নির্মম এবং অধিক সহনীয়।

সত্যি কথা বলতে কী, এই জঠর ভাড়া দেওয়া ব্যাপারটা খুব একটা নতুন কিছু নয়। ত্রিপুরার রাজবাড়িতে দুধমা বলে একজন থাকত, যে তার বুকের দুধ রাজপুত্র রাজকন্যাদেরকে খাইয়ে বড়ো করত। মহাশ্বেতা দেবীর একটি বিখ্যাত গল্পের নাম স্তন্যদায়িনী। স্তন্যদান করে তার জীবিকা নির্বাহ হত। একটুখানিক সুখের মুখ দেখতে সংসারে যেমন কর্তারা মাথার ঘাম

পায়ে ফেলে, শরীরের রক্ত জল করে, এখন গৃহিণীরাও তাদের জঠর ভাড়া দিয়ে শরীরের রক্ত জল করতে পেছপা নয়।

সবই ঠিক আছে। অবাক হবার কিছু নেই। মানুষ এক অদ্ভুত জীব। নিজের স্বার্থের জন্য কী না করতে পারে ? সবই করতে পারে। রক্ত বেচে, কিডনি বেচে। যা বেচা যায় না, তা ভাড়া দেয়।

সংবাদে প্রকাশ, মাতৃজঠর ভাড়া দিয়েছিল এক মা। ভাড়া বাবদ অগ্রিম টাকাও নিয়েছিল। শিশুটি নির্দিষ্ট সময়ে মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর, মা তার মত বদলে ফেলেছে। শিশুটিকে সে দেবে না, বরং টাকা সে ফেরত দিতে রাজি। এ নিয়ে আইন আদালত হচ্ছে এখন। মোকদ্দমার বিষয়টি নতুন তো, তাই আইনও এ সম্পর্কে স্পষ্ট নয়।

জীবন এরকমই। সবকিছু স্পষ্ট নয়। কিছুটা অস্পষ্টতা শত চেষ্টা সত্ত্বেও জীবনে থেকে যায়। ভাড়াটিয়া মা কেন সব জেনেশুনেও অবুঝ হয়ে কাঁদে — সেটাও কখনও স্পষ্ট হয় না।

হাবাগোবার মা

ছোটবেলায় রামায়ণ পড়েছিলাম। যদিও মূল কাহিনিটি ছাড়া অনেক গল্প উপ-গল্পই ভুলে গিয়েছি, তবে রামায়ণের একটি গল্প অবশ্য আমি ভুলিনি। গল্পটি আমাকে অনুক্ষণ ভাবিত করে, তাড়িত করে। গল্পটি মহাকাব্যের কোন্ পরিচ্ছেদে বা কোন্ অধ্যায়ে আছে, আমার কিছু মনে নেই। আসলে মূল রামায়ণে আদৌ গল্পটি আছে কিনা, নাকি পরবর্তী সময়ে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে তাও আমার জানা নেই। এমনিতে গল্পটি খুব সাদামাটা। দীর্ঘ বনবাসের পর রামচন্দ্র ফিরে এসেছেন অযোধ্যায়। বহু আকাঙ্ক্ষিত রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অবশেষে। আপামর প্রজাবৃন্দ যারপরনাই খুশি। জঙ্গলের ভেতর একটি হরিণ-দম্পতির মধ্যে কথোপকথন হচ্ছে। হরিণী বলছে, রাম রাজা হয়েছেন। আজকে কী খুশির দিন। ভ্রূ সংকুচিত করে হরিণের প্রশ্ন, এত খুশির কী আছে তাতে? 'ওমা, খুশি হব না। এখন রামরাজত্ব। কারোর দুঃখ কষ্ট থাকবে না এখন। দেখছ না, অযোধ্যাবাসী প্রজারা এখন খুশিতে উচ্ছল।'

'তাতে আমাদের কী যায় আসে?' হরিণ ব্যথাতুর কণ্ঠে বলছে, রামরাজত্ব বলে কি, হরিণহত্যা বন্ধ থাকবে? রাজাদের খেলাচ্ছলে হরিণ-নিধন নামে মৃগয়া কি নিষিদ্ধ হবে? যাদের রামরাজত্ব তাদের রামরাজত্ব, আমরা যেমন আছি, তেমনই থাকব। আমাদের আর রামরাজত্ব হলে কী, না হলেই বা কী।'

হরিণ হরিণীর বাক্যালাপের মাধ্যমে যে কথাটি বলার চেষ্টা করা হয়েছে তা হল, কিছু পরিবর্তনের মাধ্যমে অনেকের ভালো হলেও সবার পক্ষে তা ভালো হয় না। কারোর পৌষমাস হলে, অন্য কারোর সর্বনাশের দুয়ার সে সময় উন্মুক্ত হতে পারে। কিছু বলার নেই। রামায়ণের গল্পটিতে বলা হয়েছে, রামরাজত্বের ফলে মানুষের ভালো হলেও, পশুপ্রাণীদের পক্ষে তা ভালো হয়নি। বসুন্ধরা তো শুধু মানুষের জন্যই নয়, পশুপাখিদেরও।

বনজঙ্গলের মধ্যে খোঁজাখুঁজি না করে, আমাদের চারপাশের সংসারের মধ্যেও এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে, যেখানে দেখা যায়, একজনের হাসিখুশি অন্য আর একজনের পক্ষে হৃদয়বিদারক হতে পারে। একজন ডাক্তার সকাল বেলায় চেম্বারে বেরোবার আগে ঠাকুরকে প্রণাম করে বিড়বিড় করে বলে, আজকের দিনটা যেন ভালো যায়, ঠাকুর!

ডাক্তারবাবুর পক্ষে দিনটা ভালো যাওয়া মানে চেম্বারে বা নার্সিংহোমে রোগীব ভিড়, ভিজিটের টাকা মানিব্যাগ থেকে উপচে পড়া — অথচ উল্টো দিকে, রোগীদের সর্বনাশ। ডাক্তারের রমরমা মানে রোগীদের অসুখ বিসুখের বাড়াবাড়ির ফলে জেরবার অবস্থা। উকিল মোক্তার, দোকানি বা যে কোনও পরিসেবা প্রদানকারীর পক্ষে ঈশ্বরের অনুগ্রহে দিনটা ভালো যাওয়া অর্থাৎ পরিসেবা গ্রহীতারা ঈশ্বরের করুণা থেকে তার ফলে সঙ্গত কারণেই বঞ্চিত হতে বাধ্য। এখন পর্যন্ত যা সাংসারিক বিন্যাস, ঈশ্বর চাইলেও একই সঙ্গে পরস্পর স্বার্থবিরোধী দুটি পক্ষকে তিনি করুণা বিতরণ করতে পারেন না।

বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণকালে ক্লাসে আমার সাহেব অধ্যাপক এই প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ দিয়েছিলেন, যেখানে একটি পক্ষের ভালো হলে, অন্য পক্ষেরও ভালো। মৌমাছিপালক এবং আপেল বাগিচার মালিক। দৃষ্টান্তটি দিয়ে অধ্যাপকমশায় দেখিয়েছিলেন, মৌমাছিপালকের উন্নতি হলে আপেল বাগিচার মালিকেরও উন্নতি ত্বরান্বিত হয়। আপেল বাগিচায় মৌমাছিরা যায় — মধু সংগ্রহ করে নিয়ে আসে। মধু সংগ্রহের সময় আপেল ফুলের কুঁড়িতে মৌমাছিরা পরাগ মিলন সংগঠিত করে। বেশি মধু — বেশি পরাগ মিলন — বেশি আপেল। মধুবিক্রেতা বড়োলোক, আপেল বিক্রেতাও ফুলে ফেঁপে বড়োলোক। দুপক্ষেরই উত্তরোত্তর লাভ বেড়ে চলে। মধু এবং আপেলের উদাহরণটির মতো পরস্পর স্বার্থ পরিপূরক দৃষ্টান্ত খুব একটা বেশি নেই। সংসারের সর্বত্র এরকম ভুরি ভুরি উদাহরণ রয়েছে; একজন বেশি পেলে অন্যজন কম পায়। কম না পেয়ে তার উপায় নেই। অনেক সময় দেখা যায়, আগের চেয়ে পরিবর্তিত

পরিস্থিতিতে বেশি পেলেও, আপেক্ষিকভাবে সে কমই পায়। এটাও বঞ্চনার নামান্তর। সংসারে এমন অনেকেই আছে যারা বঞ্চনার অত সাতপাঁচ বোঝে না। আগের চেয়ে খানিকটা বেশি পেলেই খুশি, সেটা তুলনামূলকভাবে বেশি কিনা অত শত জটিলতার ভেতর যেতে চায় না। অল্পেতেই খুশি যারা, তারা চালাক চতুরদের কাছে হাবাগোবা বলে পরিচিত হয়। অনেক কাঠখড় পুড়িয়েও ওদের অসন্তোষকে চাগিয়ে তোলা যায় না। ওরা বস্তুত খরচের খাতায় থেকে যায় সবসময়। এমনই তথাকথিত একজন হাবাগোবার মাকে জিগ্যেস করা হয়েছিল, আপনার পুত্রটি কি জন্ম থেকেই এমন কম বুদ্ধি নাকি পরে এমন হয়েছে?

মা অনেক ভেবে চিন্তে বলল, আমার এই ছেলেটি যখন জন্মায়, তখন আমি আমার বাপের বাড়িতে চলে গিয়েছিলাম। তাই আমি অত শত জানি না।

মাদারস্ ডে

প্রায় ত্রিশ চল্লিশ বছর আগে একটা ছোট্ট গল্প পড়েছিলাম। সেটি এরকম গল্প যে একবার পড়লে আর জীবনে ভোলা যায় না। গল্পটা লিখেছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। গল্পটা অবশ্য সুনীলবাবুর নয়, তিনি নিজে সম্ভবত বিদেশি সাহিত্যে কোথাও পড়েছিলেন। হৃদয়স্পর্শী গল্পটি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সেদিন বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের উপহার দিয়েছিলেন।

উদ্‌ভ্রান্ত এক প্রেমিক গভীর প্রেমে নিমজ্জিত। প্রেমিকার মন পাওয়ার জন্য সে যেকোনও কার্য করতে প্রস্তুত। প্রেমিকার মনোরঞ্জনের জন্য সে পাহাড় ডিঙোতে বা সমুদ্র পার হতেও রাজি। প্রেমিকা একবার মুখ ফুটে বললেই হয়, প্রেমিক না করতে পারে হেন কর্ম নেই। একদিন নিভৃতে প্রেমিকের সঙ্গে প্রেমিকার দেখা। ভ্রূ কুঞ্চিত করে প্রেমিকা জিজ্ঞেস করল, 'সত্যি তুমি আমাকে ভালোবাস?'

'তাতে কি কোনও সন্দেহ আছে?' প্রেমিক প্রবরের উত্তর। 'তোমাকে ভালোবাসি কিনা তার তুমি যেকোনও পরীক্ষা নাও, আমি পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত।' রহস্যময় হাসি হেসে প্রেমিকা বলল, 'আমি ছাড়া আর এ পৃথিবীতে তুমি কাকে বেশি ভালোবাস?'

প্রেমিক বলল, 'আমার মাকে।'

'মাকে বেশি ভালোবাস তার মানে আমাকে কম ভালোবাস!' প্রেমিকার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এল। প্রেমিক বুঝল, বেফাঁস কথা বলে ফেলেছে সে। এরকম বলাটা বোকামি হয়েছে। আগের কথা শুধরে প্রেমিক তখন বলল, 'মিথ্যে বলব না। মাকে ভালোবাসি বটে, তবে তোমাকে ভালোবাসার তুলনায় তা কিছুই না।' অভিমানে ঠোঁট উল্টে প্রেমিকা বলল,'থাক থাক অনেক হয়েছে। বানিয়ে বানিয়ে আমাকে খুশি করার জন্য কিছু বলতে হবে না আর।'

প্রেমিকার গোমড়া মুখ দেখে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেল। মরিয়া হয়ে প্রেমিক বলল, 'তোমার চেয়ে পৃথিবীতে আর কাউকে বেশি ভালো যে বাসি না তা কী করে প্রমাণ দেব, তুমি বলো?'

'ঠিক আছে।' প্রেমিকা ভাবাবেগহীন গলায় বলল, 'তুমি যদি সত্যি তোমার মা-র চেয়ে আমাকে বেশি ভালোবাস, তবে তুমি তোমার মা-র বুকের কলিজাটাকে এনে আমাকে উপহার দাও। তাহলে বুঝব, তুমি আমাকেই অধিক ভালোবাস।'

প্রেমিক তক্ষুনি ছুটল তার মা-র কাছে। মা-র বুক চিরে তার কলিজা বা হৃৎপিণ্ড নিয়ে এসে প্রেমিকার হাতে তুলে দেয়া, এ একটা ব্যাপার হল নাকি! ঘরে এসে দেখল, মা খাটে শুয়ে আছে। ছুরি দিয়ে মা-র বুক চিরল সে। তারপর দুহাতের করতলে রক্তাক্ত কলিজাটা নিয়ে ছুটল প্রেমিকার উদ্দেশ্যে। তড়িঘড়ি ঘর থেকে বেরোতে গিয়ে চৌকাঠে হোঁচট খেল। তাতে তার হাত থেকে ছিটকে মেঝেতে পড়ে গেল মার কলিজা। কলিজা তখন কথা বলে উঠল, 'চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে ব্যথা পাওনি তো, বাছা আমার!'

গল্পটা এখানেই শেষ। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, এ গল্পটি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প। স্মৃতি থেকে গল্পটা লিখলাম। সম্ভবত মাতৃহৃদয়ের চিরন্তন হাহাকারের এই গল্পটি ফরাসি সাহিত্য থেকে সংগৃহীত হয়েছে। যদিও কোনও এক ফরাসি মা-র কথা সাহিত্যে বলা হয়েছে, তবে পৃথিবীর সবদেশের সব মা-রই গল্প এটি। অপত্য স্নেহে জর্জরিত সব মায়েরই একই চিত্র।

সাহিত্যে মাকে যে ভাবেই বর্ণিত করা হোক না, জীবনে এবং সংসারে মায়েরা উপেক্ষিতা এবং অনাদৃতা। এ চিত্রটিও ভৌগোলিক সীমারেখার ধার ধারে না। ইদানীং মাকে যথাযোগ্য সম্মান এবং শ্রদ্ধা জানানোর জন্য বছরে একদিন 'মাদারস্ ডে' উদ্‌যাপন করার রেওয়াজ হয়েছে।

বিদেশে থাকাকালীন 'মাদারস্ ডে'তে আমি একটি বাড়িতে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি, বাড়িতে ছেলে বউমা নাতি নাতনি সবাই গলদঘর্ম হয়ে গৃহস্থালির কাজকর্ম করছে। প্রৌঢ়া মা চেয়ারে বসে মিটিমিটি হাসছেন। মাকে সেদিন কোনও কাজ করতে দেয়া হচ্ছে না। রান্নাঘর বা

হেঁশেলে সেদিন তাঁর ঢোকা বারণ। প্রিয় স্যুপ বানিয়ে নিয়ে এসে বউমা শাশুড়ি-মার হাতে তুলে দিয়ে বলছে, 'মা খান?' সেদিন তাঁর মেয়েরাও এসেছে জামাইদের নিয়ে। জামাই বাবাজীবনেরা মাদার-ইন-ল-র প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাঁর কন্যারত্নদের দৌলতে তাদের জীবন ধন্য। 'মাদারস্ ডে'-তে মাকে সংসারের কুটোটিও নাড়তে দেয়া হয় না। রাজেন্দ্রাণীর মত তাঁর প্রতি ব্যবহার করা হয় সেদিন। 'মাদারস্ ডে'র পরে একদিন আমি কোনও কারণে আবার সেই বাড়িতে গিয়েছি। এবার দেখি সব বিপরীত চিত্র। মা চরকিবাজির মতো হেঁশেল থেকে এঘর ওঘর করছেন। সন্তান-সন্ততিরা পায়ের ওপর পা তুলে টিভি দেখতে দেখতে বা বই পড়তে পড়তে কফি বা অন্য কিছু খাচ্ছে। নীরবে মা যার যেটা দরকার তার হাতে সেটা তুলে দিচ্ছেন। প্রতীকী 'মাদারস্-ডে'র শোধবোধ হচ্ছে যেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুত্র বউমা আলাদা আলাদা গাড়ি নিয়ে অফিসে চলে গেল। যথাসময়ে স্কুলের বাস এলে নাতি নাতনিরা স্কুলের উদ্দেশ্যে রওনা হল। ব্যস্ততা হ্রাস পেলে মা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন যেন। প্রৌঢ়া মেমসাহেব মা এবং আমি মুখোমুখি। একথা সেকথা বলতে বলতে 'মাদারস্ ডে'র প্রসঙ্গ এল। মা বললেন, 'তুমি তো ইন্ডিয়া থেকে এসেছ, তাই না?' 'হ্যাঁ' আমি বললাম। অর্থময় হেসে মেমসাহেব মা বললেন, এদেশে তো বছরে মাত্র একদিন 'মাদারস্ ডে' হয়। তোমরা নাকি ইন্ডিয়ায় পর পর তিনদিন 'মাদারস্ ডে' কর। তোমাদের মায়েদের কী আনন্দ! আমি আকাশ থেকে পড়লাম। আমরা তিনদিন ধরে দেশে মাতৃবিদস পালন করি — সে আবার কবে? মেমসাহেব মা বললেন, তোমরা নাকি গডেস দুর্গার ওয়ারশিপ কর তিনদিন ধরে। দুর্গাপূজা তো মায়ের পূজা এটাই তো 'মাদারস ডে', তাই না?

সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী — এ তিন দিন ধরে মায়ের পুজো হয় দেশে। আমি অবাক হয়ে গেলাম। মেমসাহেব মা এসব কথা জানলেন কোত্থেকে? 'তোমার আগে এখানকার য়ুনিভার্সিটিতে পড়তে আর একটি ইয়ংম্যান এসেছিল। সে তোমার মতোই ইন্ডিয়ান এবং বেঙ্গলি। সে আমাকে ইন্ডিয়াতে 'মাদারস ডে' উদযাপনের কথা বলেছে।' আমি বুঝলাম, বাঙালি তরুণটি সব কথা খুলে বলেনি মেমসাহেব মাকে। তিনদিন আনন্দানুষ্ঠানের শেষে চতুর্থদিন দশমীতে মাকে আমরা জলে বিসর্জন দিয়ে দিই — সে কথা গোপন রেখেছে সে।

মায়ের ইচ্ছা

গৌহাটির কামাখ্যা মন্দিরে মাতৃদর্শনে ভক্তদের জন্য আমূল পরিবর্তন আনা হয়েছে। আগে দর্শনার্থীদের বিরাট লাইন হত — অপরিসর মন্দিরের অভ্যন্তরে ধূপকাঠির ধোঁয়া, মোমবাতির শিখা থেকে নির্গত কালো বায়ু, ভিড়ে ঠাসাঠাসি ভক্তদের নিঃশ্বাস নিঃসৃত কার্বন-ডাই-অক্সাইডে মিলেমিশে শ্বাসরুদ্ধ অস্বাস্থ্যকর অবস্থা। এখন এগুলো অতীত। মূল মন্দিরের অভ্যন্তরে বসানো হয়েছে শীততাপ নিয়ন্ত্রণের বিশাল যন্ত্র। আছে ভেন্টিলেটার। বৈদ্যুতিক আলোয় মন্দিরের প্রবেশপথ এবং মন্দিরের অন্দর উদ্ভাসিত। মনে হয়, ধর্মীয় কারণে, মায়ের গর্ভগৃহ ইচ্ছে করে এখনও অনুজ্জ্বলভাবে সংরক্ষিত করা আছে। আগে, বিশেষ পুজো পার্বণের দিনে মন্দিরে প্রবেশ করে মাকে দর্শন এবং প্রণাম করতে কম করে হলেও চার থেকে ছয় ঘন্টা লাগত। দর্শনার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলার অভাবে অনেক পুণ্যার্থীকে হয়তো নিকটে গিয়ে মাকে প্রণাম করা থেকে বঞ্চিত থাকতে হত। এখন সব কিছুতে শৃঙ্খলা আনয়ন করা হয়েছে। সাধারণ দর্শনেচ্ছুদের পাশাপাশি রয়েছে অর্থ দিয়ে সময় সাশ্রয় করে মন্দিরে প্রবেশের অধিকার। একশো টাকা দিয়ে অল্প সময়ে মায়ের দর্শন পাওয়ার জন্য টিকিট কাটা যায়। অবশ্য এ টাকা দিয়ে টিকিট সংগ্রহ করলেও লাইনে দাঁড়াতে হয়। পাঁচশো এক টাকার টিকিট আছে — যা কিনলে আর লাইনে দাঁড়াতে হয় না। সরাসরি মা কামাখ্যার চরণতলে পৌঁছোনো যায়। ভক্তদের মধ্যে শিশু এবং বৃদ্ধবৃদ্ধা থাকলে তাদেরকে প্রবেশের জন্য টিকিট কাটতে হয় না। বিনামূল্যে তাদের জন্য প্রবেশাধিকার। যথার্থ পরিচয়পত্র দেখাতে পারলে সামরিক বা আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ানদের জন্য প্রবেশপত্রের মূল্যে কনসেশান আছে। সংস্কার শুধু প্রবেশ ব্যবস্থায় নয়, মন্দিরের পাণ্ডাদের আচরণবিধিতে আনা হয়েছে। এখন পাণ্ডাদের জন্য গেরুয়া রংয়ের ইউনিফর্ম পরা বাধ্যতামূলক। নিরীহ ভক্তদের ওপর পাণ্ডাদের গায়ের জোরামি এবং অত্যাচার নেই বললেই চলে। তাঁরা এখন অনেক বেশি নম্র এবং অমায়িক।

এখন প্রশ্ন হল, মায়ের মন্দিরে টাকা দিয়ে টিকিট কেটে প্রবেশ করতে পারাটা কি উচিত বা মানায়? ভক্তদের মধ্যেও গরিব ধনী প্রভেদ সৃষ্টি করা কি সমীচীন? মায়ের কাছে সব সন্তানই তো সমান, নয় কি? মায়ের কাছে পৌঁছুতে লাইনে কয়েক ঘন্টা দাঁড়ালে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়? সংসারের ঝুট ঝামেলায় আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকার ফলে মায়ের

কাছে এমনি আসতেই দেরি হয়ে গিয়েছে — এখানে এসে আবার দেরি কেন?

এই তর্কাবলির বিপক্ষেও জোরালো যুক্তি আছে। দর্শনার্থীদের কাছ থেকে আদায়কৃত অর্থ দিয়ে মন্দিরের প্রাঙ্গণ এবং অভ্যন্তর অনেক বেশি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা যায়। প্রবেশে এবং মন্দিরের অভ্যন্তরে পূজা অর্চনায় শৃঙ্খলা আনার ফলে সময়ের অনেক সাশ্রয় হয়েছে। অনেক কম সময়ে মাকে দর্শন করা এবং পূজা দেয়া সম্পন্ন করা যায় এখন। অবশ্য অর্থ দিয়ে মন্দিরে প্রবেশাধিকার কামাখ্যা মন্দিরেই প্রথম চালু হয়েছে এমন নয়। দক্ষিণ ভারতের তিরুপতি মন্দিরে এ ব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরে চালু রয়েছে। সেখানেও শুধু দর্শন আছে, আছে বেশি টাকা দিয়ে স্পেশাল দর্শন। তিরুপতি মন্দিরে স্পেশাল দর্শনের জন্য টাকা দিয়ে টিকিট কেটেও লাইনে দাঁড়াতে হয়। শম্বুক গতিতে লাইন এগোয় — ভক্তদের এত ভিড়। লাইনের মাঝে মাঝে ঘরের মধ্যে গ্যালারি রয়েছে, সেখানে বসে ক্লান্তি দূর করা যায়। চা কফি পাওয়া যায় সেখানে, পাওয়া যায় পটেটো চিপস্ এবং অন্যান্য মুখরোচক খাবার। অনেক ব্যস্ত ভক্ত আছে, যাদের পক্ষে কোথাও তিনচার ঘন্টা বসে থাকার সময় নেই। তাহলে তারা কি ঠাকুরের দর্শন থেকে বঞ্চিত হবে? না, তা নয়। ইদানীং তিরুপতি মন্দিরে প্রবেশ করার জন্য টিকিট কিনলে দর্শনার্থীর হাতের কব্জিতে একটা কাগজের ফিতে পরিয়ে দেয়া হয় — রিস্ট ওয়াচের বেল্টের মতো। তাতে কম্পিউটারের সাঙ্কেতিক ভাষায় টাইম লেখা থাকে। কোনও ভক্ত, এটা কিনে নিয়ে তারপর অন্য কাজেকর্মে চলে যেতে পারে। পরে সময়মতো এলেই হবে — সরাসরি মন্দিরের অভ্যন্তরে ঠাকুর দর্শনের জন্য ঢুকতে পারবে। অহেতুক লাইনে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করার সময় যার নেই — সেই ভক্তদের জন্য এরকম ব্যবস্থা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভগবৎ ভক্তিকেও সরলীকৃত এবং গণমুখী করতে যে সক্ষম — এর চেয়ে আর কী উজ্জ্বল উদাহরণ থাকতে পারে। মন্দিরে যেখানে ঈশ্বরের পুজো আরতি হয় সেখানেও টাকা পয়সার অবাধ দাপট — তা মেনে নিতে কষ্ট হয়। অনেক ভক্তের শ্রদ্ধালু সুকুমার মন অর্থকড়ির অবাঞ্ছিত দাপটের জন্য ম্রিয়মাণ হয়ে থাকে। এ সমস্যার সমাধান কী?

এই প্রসঙ্গে ত্রিপুরা সরকারের উচ্চপদস্থ একজন বিচক্ষণ আমলার সুচিন্তিত মতামত হল, সর্বত্র প্রবেশাধিকারের ব্যাপারে লটারি পদ্ধতি চালু করা উচিত। অগণিত ভক্তদের মধ্যে স্বল্পসংখ্যক দর্শনার্থী লটারিতে মন্দিরে বিনামূল্যে প্রবেশের অধিকার জিতে মাতৃদর্শন করে পুণ্য অর্জন করবে। অন্যদের এতে ক্ষোভের বা দুঃখ করার কিছু নেই। মায়ের তাই ইচ্ছা। তাই এমন হয়েছে।

ত্রিপুরার কোনও কোনও অভিজাত স্কুলে শিশুদের ভর্তির সময় লটারি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এমনিতে ত্রিপুরাতে লটারি নিষিদ্ধ। রাজ্য সরকারের লটারি চালু নেই। অন্যান্য রাজ্যের লটারির টিকিটও এ রাজ্যে বিক্রি করা আইনত দণ্ডনীয়। রাজ্যের বেসরকারি মেডিক্যাল

কলেজে জয়েন্ট এন্ট্রাস পাশ করা ছেলেমেয়েরা বিনা ক্যাপিটেশান ফি দিয়ে সরাসরি ভর্তি হতে পারে। অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরা যাদের আর্থিক সামর্থ্য আছে, তারা লাইনে না দাঁড়িয়ে অর্থের বিনিময়ে সরাসরি ডাক্তারি পড়ায় ভর্তি হয়। কোন্‌টা ভালো, কোন্‌টা মন্দ এটা এখানে বিবেচ্য নয়।

যেখানে ভিড়, যেখানে যোগানের চেয়ে চাহিদা বেশি — সেখানে মূল্য জারির মাধ্যমে সমতা আনতে হয়। মাতৃদর্শনও এ পর্যায়ে পড়ে। মাতৃদর্শনের সময়ে যদি কিছু মূল্য দিতে হয় — যা দিয়ে মন্দির প্রাঙ্গণ এবং পরিবেশ শুভ্র ও স্বচ্ছ রাখা যায় — তাহলে ক্ষতি কী? ধরে নেয়া যাক, এটাও মায়েরই ইচ্ছা।

ধন বড় মা

আমাদের ছোটবেলায় একটি বহু প্রচলিত ঘুম পাড়ানিয়া গান ছিল - 'খোকা ঘুমাল, পাড়া জুড়াল বর্গি এল দেশে ...।' মা-মাসিরা তখনকার সময়ে শিশুদের ঘুম পাড়ানোর জন্য দুলে দুলে গানটা গাইতেন। গানটা প্রথমে উচ্চ স্বরে এবং পরে ক্রমশ নিচুস্বরে গুনগুন করে গেয়ে যেতেন তাঁরা যতক্ষণ না দামাল শিশুটি নিদ্রাদেবীর কোলে ঢলে পড়ছে ততক্ষণ। এমনও হয়েছে ছন্দময় গানটা গাইতে গাইতে মা-মাসিরা নিজেরাও খাটে বসে বসে ঘুমিয়ে পড়তেন, শিশুটি হয়তো তখনও ঘুমোয়নি। বাচ্চারা খুব দুষ্টু হয়, তারা যতক্ষণ জেগে থাকে ততক্ষণ দস্যিপনা করে বেড়ায়। ওদের ঘুম পাড়াতে মা মাসিদের মাঝে মাঝে জুজুর ভয়, বর্গির ভয়, ছেলেধরার ভয় দেখাতে হয়। কী জানি, ঘুম-পাড়ানি গানের সুর লয়ের জন্য নয়, হয়তো বা জুজু বা ছেলে ধরার ভয়েই শিশুরা জড়োসড়ো হয়ে শেষ পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়ত।

এখন দিনকাল বদলে গিয়েছে। একান্নবর্তী পরিবারগুলো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া পরিবার নিয়ন্ত্রণের সুবাদে অনেকেরই মা আছে, তবে মাসি নেই। প্রায় পরিবারের আয়তন হল — বাবা মা এবং একটি বা দুটি সন্তান। সন্তানদের মধ্যে একটি পুত্র অন্যটি কন্যা হলে তো কথাই নেই। এটি একটি আদর্শ এবং কাঙ্ক্ষিত পরিবার। আধুনিক

অনেক বাবা মা-ই এরকম একটি এক পুত্র এক কন্যার সংসার পেতে সংসারের অন্যান্য একাধিক সুখ শান্তি বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। এই টুনাটুনির সংসারের একমাত্র পুত্রটির এবং একমাত্র কন্যাটির যখন বয়ঃপ্রাপ্তির পর, অন্য দুটি পরিবারের মধ্যে বিয়ে হয়, যে দুটি পরিবার এদেরই মতো এক কন্যা এক পুত্রের পরিবার — তখন যে এক অদ্ভুত পরিস্থিতির উদ্ভব হয় বা হতে পারে তা কেউ ভেবে দেখে না। এক পুত্র এক কন্যার পরিবারগুলোতে পরবর্তী প্রজন্মে এক আশ্চর্যজনক শূন্যতার সৃষ্টি হয় যা আর কোনওদিনই পূরণ করা সম্ভব নয়। পরবর্তী প্রজন্মের নবজাতক শিশুটির মাসি নেই, মামা নেই, কাকা নেই, পিসি নেই। স্বাভাবিকভাবেই সেই শিশুটির মেসো থাকবে না, মামিমা থাকবে না, কাকিমা থাকবে না, থাকবে না পিসোমণি। খোদার ওপর খোদকারি করলে এমনই হয়, অনেক দুর্লভ স্নেহ এবং মমতা হারাতে হয়।

আজকালকার বাচ্চাদের কী গান গেয়ে ঘুম পাড়ানো হয়, কে গান গেয়ে ঘুম পাড়ায়, 'খোকা ঘুমাল, পাড়া জুড়াল' ঘুম পাড়ানিয়া গানটা এখনও গাওয়া হয় কিনা — আমি অত বিস্তৃত জানি না। নিজের না-জানার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। দিনকাল বদলেছে, বদলেছে অনেক কিছু। এখন মায়েরা শিশুর মুখে মধুমাখা রাবারের নিপ্‌ল্‌ গুঁজে দিয়ে অফিসে চলে যায়। চুকচুক করে নিপ্‌ল্‌ চুষতে চুষতে শিশুটি আধো ঘুম আধো জাগরণে এই হাসে এই কাঁদে। অনেক কিছু বদলালেও ঘুম পাড়ানিয়া 'খোকা ঘুমাল পাড়া জুড়াল, বর্গি এল দেশে' গানটির তাৎপর্য এবং প্রাসঙ্গিকতা এখনও বদলায়নি বলেই মনে হয়। মাতৃক্রোড়ের শিশুটি যখন একদিন ষোলো বা আঠেরো বছর বয়সে মাধ্যমিক বা হায়ার সেকেন্ডারি পাস করে উচ্চ শিক্ষাঙ্গনে পা দেবার জন্য প্রস্তুত, তখনই আবার ঘুম পাড়ানিয়া গানটির প্রাসঙ্গিকতা নতুন করে খুঁজে পাওয়া যায়।

মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার রেজাল্ট বের হবার কিছুকাল আগে থেকেই এবং বের হবার পরে পরেই, তথাকথিত কিছু উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা বর্গিদের চেয়ে কোনও অংশে কম না। এদের কাজ ছেলেধরা। ছেলে-মেয়েদের রকমারি টোপ দিয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করিয়ে নেয়া। ওদের বিজ্ঞাপনের ভাষা পড়লে মনে হয়, এম বি বি এস / বি ই/ এম বি এ / এম সি এ ডিগ্রিগুলো যেন হাতের মোয়া ! ডিগ্রির শেষে চাকরি পাওয়া জলভাত আর কী। চাকুরি প্রাপ্তির শতকরা শতভাগ গ্যারান্টি।

এরকম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে শিক্ষা গ্রহণের শেষ নিশ্চিত চাকরি পেতে হলে গাঁটের অনেক কড়ি খরচ করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। শিক্ষা এখন একটি পণ্য। এই পণ্যটির জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একটি সুসংগঠিত বাজার। সেই বাজারে শিক্ষা কেনা বেচা হচ্ছে — টাকার অংকে যার বাৎসরিক পরিমাণ হচ্ছে আনুমানিক দশ হাজার কোটি টাকা। অনেকক্ষেত্রে

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সরাসরি ক্রেতাদের কাছে পৌঁছুতে না পারলে সেক্ষেত্রে তাদের কমিশন এজেন্ট রয়েছে। একটি ছাত্রকে ভর্তি করাতে পারলেই তারা নগদ তাদের কমিশনের টাকাটা পেয়ে যায়। এটা অনেকটা এল আই সি বা অন্যান্য ইন্স্যুরেন্সের প্রথম প্রিমিয়ামটির মতো।

শিক্ষার বাণিজ্যিকরণের বিপক্ষে অনেকে মতামত ব্যক্ত করেন। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ উৎসাহে শিক্ষার বাণিজ্যিকরণ অব্যাহত রয়েছে। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আয়োজিত ভর্তিমেলাতে সরকার এবং প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা উপস্থিত থেকে উৎসাহ দিচ্ছেন। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েও অধিক অর্থ দিয়ে কোর্স শেষে এরকম ডিগ্রি পাওয়া যাচ্ছে। অর্থনৈতিক পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শিক্ষার বাণিজ্যিকরণে দোষের কিছু নেই। দোষের হলে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্যিকরণের রমরমা হত না। কিন্তু কথা হল, শিক্ষা যদি পণ্য হয়, তাহলে তার জন্য ছলে বলে কৌশলে অত্যধিক দাম আদায় করা উচিত কিনা? এভাবে ক্রেতাদের প্রতারিত করলে তার জন্য প্রতিরোধ এবং প্রতিবাদ করা উচিত। ঘুম পাড়ানিয়া গানে আছে, খোকা ঘুমিয়ে পড়লে যখন পাড়াটা জুড়োয়, তখনই বর্গিরা আসে। অর্থাৎ খোকা না ঘুমোলে পাড়া না জুড়োলে বর্গিরা আসে না, আসতে পারে না। ক্রেতাস্বার্থ সুরক্ষার জন্য সচেতন হওয়া দরকার। 'খোকা ঘুমাল, পাড়া জুড়াল, বর্গি এল দেশে' এর দুটি লাইন হল, 'কিসের মাসি, কিসের পিসি কিসের বৃন্দাবন/এতদিনে জানিলাম, মা বড়ো ধন।' আজকালকার দিনে মাসি পিসি এবং বৃন্দাবন হারিয়ে গেছে বা যাচ্ছে, বাকি রইল মা। স্বভাবতই মা বড়ো ধন। তবে সবকিছুর পশ্চাতে কলকাঠি নাড়ছে অর্থ বা ধন। তাই 'মা বড়ো ধন' না বলে 'ধন বড়ো মা' বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না।

আপনিও নিমন্ত্রিত

নদীটির নাম চিত্রোৎফুল্লা। চিত্রোৎফুল্লা শব্দটি শুনলেই চিত্ত উৎফুল্ল হয়ে যায়, মন ভালো হয়ে ওঠে। ছত্তিশগড় রাজ্যের রাজধানী রায়পুরের খানিকটা দূর দিয়ে নদীটি বয়ে গিয়েছে। ছত্তিশগড়েই রয়েছে দণ্ডকারণ্য, রয়েছে চিত্রকূট পাহাড়। বনবাসের সময় রামচন্দ্র এই অঞ্চলে ঘুরে ফিরে বেড়াতেন। চিত্রোৎফুল্লা নদীটির তীরও রামচন্দ্রের পদস্পর্শে ধন্য হয়েছিল। রামচন্দ্রের পদচিহ্নকে ঘিরে নদীর পাড়ে গড়ে উঠেছে পবিত্র মন্দির।

উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে রয়েছে রামচন্দ্রের পদচিহ্ন বিজড়িত একাধিক মন্দির। ট্যুরিস্ট গাইডকে জিগ্যেস করলে বলে, মন্দিরের নাম রাম-ঝরোকা। রাম-ঝরোকা মানে কী? অনেক প্রশ্ন এবং উত্তরের পর জানা গেল, 'রাম-ঝরোকা' হল আসলে 'রামজি নে রোকা'র অপভ্রংশ। 'রামজি নে রোকা'ই বলতে বলতে হয়ে গিয়েছে 'রাম-ঝরোকা'। বনবাসের সময় রামজি চলার পথে কখনও কখনও এখানে সেখানে দুদণ্ড রুকেছিলেন বা থেমেছিলেন। রাম-ঝরোকা স্বভাবত-ই পুণ্যার্থীদের কাছে তাই অপরিসীম পুণ্যতীর্থ। ছত্তিশগড় রাজ্যের শিল্পনগরী ভিলাইয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যপদে আসীন থাকাকালীন আমাকে প্রায়শই রায়পুরে যেতে হত। ছত্তিশগড়ের রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন শেঠের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত কাজে দেখা করতে যেতাম আমি। শ্রীযুক্ত শেঠ একসময় ত্রিপুরার রাজ্যপাল ছিলেন।

ত্রিপুরার লোক বলে তিনি আমাকে অতিরিক্ত স্নেহ করতেন। দেখা হলেই ত্রিপুরা সম্পর্কে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খোঁজখবর নিতেন। রায়পুরের সবচেয়ে বড়ো এবং সুবিখ্যাত হোটেলটির নাম — হোটেল ব্যাবিলন। হোটেল ব্যাবিলনে বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত মিটিং কনফারেন্সগুলো হত। রাজ্যপাল শেঠ সভাপতিত্ব করতেন। দিল্লি থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের পদস্থ আমলারা আসতেন। হোটেল ব্যাবিলন সম্ভবত ফাইভস্টার। এটাই একমাত্র হোটেল যেখানে আধুনিক সুযোগ-সুবিধে মোটামুটি সবকিছুই আছে। এই হোটেলে অনেক বিদেশি শিল্পপতি ধনাঢ্য ব্যক্তিরাও থাকেন। ছত্তিশগড় রাজ্যটিতে প্রকৃতি অঢেল খনিজ সম্পদ দিয়েছে। দুর্মূল্য এবং দুর্লভ খনিজ সম্পদ অন্বেষণে বিদেশি শিল্প সংস্থাগুলো এসে হাজির। বিদেশি শিল্পসংস্থাগুলোর ভারতীয় প্রতিনিধিরাও তাই এই হোটেলে এসে আস্তানা গেড়েছে। ছ[illegible]রতের অন্যান্য রাজ্যগুলোর তুলনায় পশ্চাৎপদ এবং অনুন্নত।
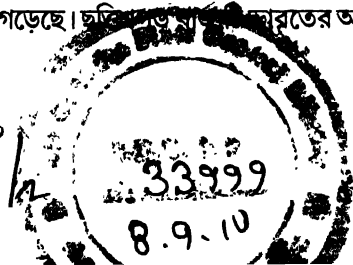
রাজ্য প্রশাসনের কয়েকজন বরিষ্ঠ আমলার সঙ্গে কথা বলে জেনেছি, আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই ছত্তিশগড় রাজস্বের মাপকাঠিতে ভারতবর্ষের অন্যান্য সমস্ত রাজ্যগুলোকে পশ্চাতে ফেলে রেখে শীর্ষস্থান অধিকার করবে। সেটা কী করে সম্ভব? রাজ্যে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদের ভগ্নাংশ বিক্রি করে এবং রয়্যালটি আদায় করে যে অর্থ পাওয়া যাবে তা কয়েকটি রাজ্যের মোট রাজস্বের যোগফলের চেয়েও বেশি হবে।

চিত্রোৎফুল্লা নদীর প্রসঙ্গে আবার আসা যাক। এই নদীগর্ভে রয়েছে দুর্লভ এবং দুর্মূল্য খনিজ সম্ভার — স্রোতধারায় প্রবাহিত হয়ে খনি উৎস থেকে জনপদে চলে আসছে। শুধু চিত্রোৎফুল্লাই নয়, ছত্তিশগড়ের অন্যান্য নদীগুলোও রত্নগর্ভা। এই রত্নের খোঁজে হাজির দেশ বিদেশের রত্নকারেরা। কেউ বললে বিশ্বাস করবে না, ছত্তিশগড়ে নদী বিক্রি হচ্ছে। চিত্রোৎফুল্লা নদীর একটা নির্দিষ্ট অংশ এখান থেকে ওখানে প্রায় পনেরো কিলোমিটার আগামী পাঁচ বছরের জন্য কিনে নিচ্ছে কেউ। এই অংশে প্রাপ্ত এবং প্রাপ্তব্য সমস্ত হিরা রত্নের মালিকানা, নদী যে কিনেছে তার কাছে আইনসম্মতভাবে হস্তান্তরিত। কার্যোপলক্ষে আমি কিছুদিন হোটেল ব্যাবিলনে ছিলাম। প্রায়সময় সকালবেলার প্রাতরাশ একসাথে করতাম রত্নব্যবসায়ী ধনকুবেরদের সঙ্গে। তারা কেউ কেউ আমাকেও তাদের মতো একজন ধনকুবের ভাবলেন কিনা কে জানে। যে কটা দিন আমি হোটেল ব্যাবিলনে ছিলাম সেটা ছিল বিয়ের মরশুম। রোজই সন্ধ্যায় হোটেলে বিয়ের পার্টি লেগে থাকত। ইলাহি কাণ্ড।

বরযাত্রীদের অভ্যর্থনা, আদর আপ্যায়ন — কোথাও কোনও ত্রুটি নেই। কন্যাযাত্রীরাও কোনও অংশে কম নয়। বিয়ের ঝলমলে সাজে সজ্জিত হাসিখুশি বরবধূকে দেখে মনে হবে কোনো হিন্দি সিনেমার সেটে শুটিংয়ে বুঝি ঢুকে পড়েছি। বিয়ের আসরে অতিথি আপ্যায়ন এবং পানীয় খাদ্য পরিবেশন সব কিছুর দায়িত্বে হোটেল কর্তৃপক্ষ। সব কিছু নিখুঁত — পান থেকে চুন খসবার জো নেই। বিয়ের রিসেপশান যে ঢাউস হল ঘরটায় হয়, তার কাউন্টারের সামনে বিরাট একটা বিজ্ঞাপন দেখে একদিন দুদণ্ড থমকে দাঁড়ালাম। হবু কন্যাকর্তা মেয়ের বাবাকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে — আপনি কি আপনার মেয়ের বিয়ের পার্টি নিয়ে চিন্তিত? আমরা আছি। আমাদেরকে দায়িত্ব দিন। আপনার মেয়ের বিয়েতে আপনিও নিমন্ত্রিত।

এ লেখাটি চিত্রোৎফুল্লা নদী বা হোটেল ব্যাবিলন সম্পর্কিত নয়। লেখাটি হল পরিবর্তিত মূল্যবোধ এবং বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ক। নিজের মেয়ের বিয়েতে মেয়ের বাবা নিমন্ত্রিত — ভাবা যায়!

আসলের চেয়ে সুদ বেশি মিষ্টি

দৃশ্য এক

দোকানে অনেক ক্রেতা। জিনিস বিক্রি করতে করতে দোকানের কর্মচারীরা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। ক্যাশবাক্স নিয়ে বসে আছে মালিক। কেনাকাটার শেষে দাম দিচ্ছে ক্রেতারা মালিকের কাছে। তাও লাইনে দাঁড়িয়ে। ক্যাশবাক্স উপচে পড়ছে পাঁচ দশ একশো টাকার নোটে। টাকা গুনতে গুনতে মালিকের ধৈর্য হারিয়ে যাচ্ছে। একেবারেই ফুরসত পাচ্ছে না। মালিকের মন খারাপ। এত বিক্রিবাটা কাঁহাতক আর সহ্য করা যায়! সহ্যেরও একটা সীমা আছে। ধৈর্য্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে বলে মালিক কর্মচারীরা ক্রেতাদের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করছে। ভাবটা এই, ক্রেতারা ভেগে গেলে তারা বাঁচে।

দৃশ্য দুই

দোকানে অনেক ক্রেতা। জিনিস বিক্রি করতে করতে দোকানের কর্মচারীরা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। ক্যাশবাক্স সামলাচ্ছে মালিক। তার ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি। কপালে দুহাত ঠেকিয়ে ঠাকুরকে বিড়বিড় করে বলল, আয়, লক্ষ্মী কাঁটা কাঁটা দিয়া। তাছাড়া দেয়ালে লটকে রাখা হয়েছে কাচে বাঁধানো বিরাট ফ্রেম একটা। ওখানে লেখা আছে, দোকান হল মন্দির, ক্রেতা হল দেবতা, দোকানি হল পূজারী, ক্রেতার তুষ্টিই দোকানির তুষ্টি — এটাই তার পরম প্রাপ্তি ইত্যাদি।

মালিক উঠে এসে নিজের পরনের ধুতির খুঁট দিয়ে চেয়ারের ধুলো ঝেড়ে বয়স্ক একজন ক্রেতাকে পাখার নিচে বসিয়ে দিয়ে বাড়ির সবাইয়ের কুশল-মঙ্গল জিজ্ঞেস করল। কয়েকদিন আগে মেয়ের বিয়ে কেমন হল, নতুন বেয়াইনের সঙ্গে হাসি-মস্করা হয়েছে কিনা, সে প্রসঙ্গও বাদ গেল না। দিনের শেষে দোকানের ঝাঁপি বন্ধ করার সময় দোকানি তার আরাধ্য দেবতাকে স্মরণ করে বলল, ঠাকুর, কালকে যেন আরও ক্রেতা আসে। আরও ক্রেতা মানে আরও বিক্রি। আরও বিক্রি মানে আরও মুনাফা। আয় লক্ষ্মী, কাঁটা কাঁটা দিয়া।

জীবনের রূঢ় সত্য হল, সবই দোকান। বিদ্যালয়, হাসপাতাল, সরকারি অফিস আদালত-এগুলোও দোকানেরই নামান্তর। স্কুলে বিদ্যা ক্রয় করা যায়, হাসপাতালে চিকিৎসা। সরকারি অফিস আদালতেও পরিসেবা বা বিচার কেনার সুযোগসুবিধে রয়েছে। বিদ্যালয়ের মাস্টারমশাই, হাসপাতালের ডাক্তারেরা মূলত বিক্রেতা। অন্য একটা পরিচয়ও তাদের আছে, তারা কর্মচারী। তাদের কাজের জন্য তারা মজুরি বা বেতন পান। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায়, দোকান বা প্রতিষ্ঠানটির মালিক সরকার। অবশ্য সরকার মালিক হলে পরিসেবা বা দ্রব্যটি বিনামূল্যে পাওয়া যাবে এটা ঠিক নয়। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা হাসপাতাল পরিচালনায় রয়েছে সরকার। যেখানে সরকারি মালিকানা থেকে ক্রেতাদের কাছে দ্রব্য বা পরিসেবা হস্তান্তরিত হয় কম বা নামমাত্র মূল্যে। একথা সত্যি যে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে সরকার অনেক দ্রব্য বিনামূল্যে দরিদ্র লোকদের মধ্যে বন্টন বা বিতরণ করে। কিন্তু প্রশ্ন হল, বিনামূল্যে কিছু দেয়া যায় কি না। শীতের সময়ে বছরে একবার আগরতলার মহারাজগঞ্জ বাজারে সংকীর্তনের শেষে বিনামূল্যে খিচুড়ি খাওয়ানো হয়। কথা হল, খিচুড়ি কি কখনও মাগনা হয়? খিচুড়ি বানাতে চাল ডাল তেল মশলা লাকড়ি লাগে। এগুলো কি বিনামূল্যে বা মাগনা পাওয়া যায়? আসল কথাটা হল, কিছুই মাগনা হয় না। আমি হয়তো জিনিসটা পাওয়ার সময় দাম দিতে না পারি, কিন্তু কাউকে না কাউকে তার জন্য দাম দিতে হচ্ছে। সে দাম নেবে কি নেবে না, এটা তার ব্যাপার। এমন অনেক দ্রব্যসামগ্রী আছে যার জন্য আপাতদৃষ্টিতে কাউকেই ব্যয় বহন করতে হয় না বা দাম দিতে হয় না। বন থেকে লাকড়ি এনে বনদপ্তরের শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে তা দিয়ে খিচুড়ি বানালে, লাকড়ির দাম দিতে হল না। লাকড়ি বিনামূল্যে পাওয়া গেল। কিন্তু ঘটনাটা কি তাই? এই সময়ের কাউকে দাম দিতে না হলেও, আগামী প্রজন্মকে তার জন্য দাম দিতে হবে। ভবিষ্যতের প্রজন্ম আজকের খিচুড়ি বানানোর জন্য বনজ সম্পদ থেকে প্রবঞ্চিত হয়েছে। আসল কথাটা হল, বিনামূল্যে বা মাগনা কিছু হয় না। কাউকে না কাউকে তার জন্য দাম দিতে হয়। ব্যক্তিগতভাবে কেউ দাম দিতে সম্মত না হলে, সমাজ বা আগামী প্রজন্ম সে দাম সুদে আসলে মিটিয়ে দিতে বাধ্য থাকবে।

যেসব প্রতিষ্ঠানে চাকরির নিরাপত্তা শতকরা শত ভাগ সেখানে পরিসেবার গুণ এবং পরিমাণ নিয়ে সংশয় থেকে যায়। এইসব প্রতিষ্ঠানে একবার চাকরি পেলে একমাত্র রিটায়ারমেন্টের বয়স এসে দোরগোড়ায় হাজির না হলে বা অকাল মৃত্যু এসে আচমকা যবনিকা টেনে না দিলে, চাকরি হারাবার কোনও অবকাশ নেই। এগুলো হল সেইসব প্রতিষ্ঠান বা দোকান, যেখানে ক্রেতাদের দীর্ঘ লাইন দেখলে বিক্রেতাদের মন খারাপ হয়ে যায়। বেশি বেশি বেচে কী লাভ? বেতন বা মজুরি তো বাড়বে না। তবে হ্যাঁ, যেসব ক্ষেত্রে কর্মচারীদের উৎসাহ প্রদান করার জন্য 'ওভার-টাইম' বা অন্য ধরনের কমিশনের ব্যবস্থা থাকে সেখানে

ক্রেতাদের মনোরঞ্জনের জন্য কোনও ত্রুটি রাখা হয় না। তাই দেখা যায়, কোনও কোনও অফিস বা প্রতিষ্ঠানে অফিস আওয়ারে কাজ হয় না। অফিস ছুটির পর ওভার টাইমের সময়ে কাজের ধুম পড়ে যায়। এতে অবাক হবার কোনও কারণ নেই, এটাই স্বাভাবিক। প্রতিষ্ঠানগুলো পরিসেবা বিক্রি করলেও শ্রম কেনে। স্বভাবতই কর্মচারীরা অধিক মজুরিতে শ্রম বিক্রি করে অতিরিক্ত আয় করতে উদ্‌গ্রীব হবে। কে না জানে, আসল ভালো, ফাউ আরও ভালো।

প্রতিবেশী প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক চাকরি থেকে অবসরপ্রাপ্ত হয়ে এখন নিরুদ্বিগ্ন জীবন যাপন করছেন। নাতিনাতনি নিয়ে তাঁর কোলাহলমুখর সংসার। অফিসে কাজ করার সময় তাঁর হাতে অঢেল সময় ছিল। এটা একটা পরিহাসের বিষয়ই বটে, রিটায়ারমেন্টের পরে তাঁর এখন অপচয় করার জন্য অঢেল সময় হাতে নেই। নাতনিকে স্কুলে দিয়ে বাইরে গাছতলায় বসে থাকেন। স্কুল ছুটি হলে একেবারে নাতনিকে নিয়ে বাড়ি ফেরেন। এত সময় তিনি তার পুত্রকন্যাদের জন্যও দেননি। তখন প্রমোশন এবং অন্যান্য পারিবারিক বৈষয়িক বিষয় নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। সময় সময়ের মতো বয়ে গিয়েছে নিঃশব্দে।

অফিসের নির্দিষ্ট সময়ে অফিসের কাজ করেননি — এখন ওভার টাইম করছেন। ওভার টাইমে আনন্দ বেশি, সঙ্গত কারণেই।

পুত্রকন্যা নয়, জীবনের উপান্তে এসে নাতিনাতনির প্রতি অধিক স্নেহ বর্ষণের কারণের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বললেন, আসলের চেয়ে সুদ সবসময়ই বেশি মিষ্টি।

তিনি হয়তো জানলেন না, নিজেরই অজ্ঞাতেই সাংসারিক স্নেহ-প্রেম-ভালোবাসাকে অর্থনীতির পরিভাষায় সহজ এবং স্পষ্টভাবে প্রকাশ করলেন।

ভিতরসে নেহি লাগতা

অফিসের ভেতরে মিটিং চলছে। মিটিংয়ে উপস্থিত আছেন দপ্তরের উচ্চপদস্থ অফিসারেরা। একজন তরুণ অফিসার মাঝে মাঝে উশখুশ করছেন, যা সবাইয়ের নজরে পড়ছে। একসময় হন্তদন্ত হয়ে তরুণ অফিসারটি ঘরের বাইরে বেরিয়ে বারান্দায় এসে পকেট থেকে মোবাইল ফোন খুলে বললেন, হ্যালো। মনে হয়, অনেকক্ষণ ধরে মোবাইল ফোন আসছিল। বারবার কেটে যাচ্ছিল। ঘরের ভেতর থেকে ফোন পাওয়া যাচ্ছিল না — তাই অগত্যা বাইরে এসে তাকে ফোন ধরতে হয়েছে। এই হল বি এস এন এল (ভারত সঞ্চার

নিগম লিমিটেড)-এর পরিসেবার হাল। সম্ভবত এজন্যই বি এস এন এল-কে লোকে বলে 'ভিতরসে নেহি লাগতা'। সরকারি দূরভাষ পরিসেবার হাল এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে, মোবাইল বাজলেই লোকজন ঘর থেকে ছুটে খোলা আকাশের নিচে চলে আসে। ভূমিকম্পের বেলায়ও এরকম করা উচিত বলে উপদেশ দেয়া আছে। অবশ্য ভূমিকম্পের সঙ্গে মোবাইলের মিলের চেয়ে অমিল বেশি। ভূমিকম্প থেমে গেলে ফের ঘরে ফিরে আসা যায়। বিধ্বস্ত জীবন আবার প্রবাহিত হতে থাকে। মোবাইল ফোন নিয়ে ঘরের ভেতর প্রত্যাবর্তন করা হঠকারিতার সামিল। মোবাইল ফোন ইদানীং খুব জনপ্রিয় হয়েছে, কেননা তার উপযোগিতার শেষ নেই। এদেশে মোবাইল ফোনের চাহিদা হু হু করে বাড়ছে। পৃথিবীর উন্নত কয়েকটি দেশের মোবাইল ফোনের সংখ্যা একসঙ্গে যোগ করলে দেখা যায় এখনই ভারতে চালু মোবাইলের সংখ্যা ওইসব একাধিক দেশকে পেছনে ফেলে দিয়েছে। অবশ্য ভারতে একদিকে মোবাইল ফোনের সংখ্যা বাড়ছে, আর অন্যদিকে ল্যান্ডলাইন ফোনের সংখ্যা বাড়ছে না বরং কমছে। দূরভাষ প্রতিষ্ঠানেরই ল্যান্ডলাইন, আবার দূরভাষ প্রতিষ্ঠানেরই মোবাইল ফোন। যদি ল্যান্ডলাইন কমে যায় এবং মোবাইল বাড়ে — তাহলে আর কী লাভ? দুটোরই চাহিদা যদি বাড়ে তবে তো উত্তম। এই প্রেক্ষিতে বি এস এন এল বা 'ভিতরসে নেহি লাগতা'র একটা যথার্থ ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায়। পরিসেবা এমন পর্যায়ে উন্নীত করা হয়েছে যে, আপনাকে ঘরের জন্য একটি ল্যান্ডফোন এবং বাইরের জন্য আর একটি মোবাইল ফোন রাখতে হবে। তাতে দূরভাষ প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক শ্রীবৃদ্ধি আর আটকায় কে! সরকারি দূরভাষ প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বে-সরকারি দূরভাষ কোম্পানিগুলোও বাজারে দাপটের সঙ্গে উপস্থিত। তারা কেউ কারোর চেয়ে কম যায় না। তাদের বিজ্ঞাপনের লোভনীয় হাতছানি গৃহকর্ত্রীর দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রা এবং কর্তার রাতের ঘুম কেড়ে নিচ্ছে। সম্প্রতি একটি বহুল প্রচারিত বিজ্ঞাপন থেকে জানা গেল, মাত্র ৯৯ টাকা দিলে আপনি আজীবন ইন-কামিং কলস্ ফ্রি পাবেন। এখন প্রশ্ন হল, আজীবন কাকে বলে? আজীবনের সংজ্ঞা কী? আইনি আদালতের ভাষায় যাবজ্জীবন বলে একটা শব্দ আছে। খুনের জন্য কারাদণ্ডের ব্যবস্থা আছে। তবে জানা যায় যাবজ্জীবন বলতে বস্তুত বারো বছরের কারাবাসের দণ্ডাদেশকে বোঝায়। আদালতের 'যাবজ্জীবন' এবং বে-সরকারি দূরভাষ কোম্পানিগুলোর 'আজীবন' শব্দ দুটো কী সমার্থক? আজীবন বলতে কার আজীবনের কথা বলা হচ্ছে, গ্রাহকের আজীবন না পরিসেবা বিক্রেতা কোম্পানির আজীবন? সম্প্রতি জনৈক গ্রাহক আদালতের শরণাপন্ন হয়েছিলেন, বিজ্ঞাপিত 'আজীবন' শব্দটির আইনগত সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা কী জানতে। মামলার বিষয়টি খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। পত্র-পত্রিকায় এ বিষয়ে পক্ষে বিপক্ষে বেশ কিছু আলোচনা বের হয়েছিল। ইতিমধ্যে 'আজীবন' শব্দটির আইনি সংজ্ঞা আদালতের রায়ে প্রকাশিত হয়েছে। যার মর্মার্থ হল, আজীবনের সঙ্গে যাবজ্জীবনের কোনও বাৎসরিক সম্পর্ক নেই।

'আজীবন' মানে গ্রাহকের জীবনের কথা বোঝাবে না। একজন গ্রাহক দীর্ঘায়ু হয়ে শতবর্ষ বাঁচলে তাকে দূরভাষ কোম্পানি শতবর্ষ ধরে ফ্রি পরিসেবা দিতে বাধ্য থাকবে — আজীবনের মানে এটা নয়। 'আজীবন' বলতে বোঝাবে, কোম্পানির আয়ুষ্কাল। তার মানে মোদ্দা কথাটা এই দাঁড়াল যে, সংশ্লিষ্ট দূরভাষ কোম্পানিটির যদি আজকে 'আজীবন ফ্রি ইনকামিং কলসের' বিজ্ঞাপন দিয়ে কালকে কোনও কারণে লালবাতি জ্বলে তবে এক্ষেত্রে 'আজীবন' মানে হল 'একদিন'। যদি কয়েকদিন বাদে কোম্পানিটি উঠে যায় তবে সেক্ষেত্রে 'আজীবন' বলতে বোঝাবে 'কয়েকদিন'।

প্রযুক্তির কল্যাণে সবরকম পরিসেবার দিন কে দিন উন্নতি হচ্ছে। এ দেশেও হচ্ছে যে না, তা নয়। হচ্ছে, খুব ধীরে। ফলে নির্দোষ গ্রাহকেরা প্রবঞ্চিত হচ্ছেন। কি সরকারি কি বেসরকারি পরিসেবা — ওরা হল শাঁখের করাত। গ্রাহকদেরকে ওরা আসতেও কাটে যেতেও কাটে। গ্রাহকেরা নিরুপায়। মনে হয় জন্ম থেকে ওরা বলিপ্রদত্ত। ন্যায্যমূল্য দিয়েও তাদের দুর্ভোগ পোহানো ছাড়া আর কোনও গতি নেই।

তবে এতসব দুর্ভোগের মধ্যেও গ্রাহকেরা নির্মল আনন্দ খোঁজেন। বি এস এন এল হয়ে দাঁড়ায় 'ভিতরসে নেহি লাগতা'। দিল্লির সরকারি পরিবহন সংস্থা ডি টি ইউ (দিল্লি ট্রান্সপোর্ট আন্ডারটেকিং) কে সস্নেহে দিল্লিবাসীরা বলে 'ডোন্ট ট্রাস্ট আস্'। ত্রিপুরার সড়ক পরিবহন সংস্থা টি আর টি সি (ত্রিপুরা রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন) কে আদর করে ভুক্তভোগী ত্রিপুরাবাসীরা কী নামে ডাকে জানতে ভীষণ ইচ্ছে করে।

দুধ বনাম মদ

কেউ মদ বেচে দুধ খায়, কেউ বা দুধ বেচে খায় মদ। কে না জানে, দুধ খাওয়া ভালো, মদ খাওয়া ভালো না। তবু দুধের মতোই মদেরও কেনাবেচা চলছে। মদ খারাপ, তাই যদি হয় তবে মদ বেচে দুধ খাওয়া সম্ভব নয়। মদ যদি কেউই না খায়, তবে মদের চাহিদা নেই, তখন মদ বেচা বন্ধ। স্বভাবতই মদ বেচে যারা দুধ খায় তাদেরও দুধ খাওয়া বন্ধ। অন্তত বাজারের দৃষ্টিকোণ থেকে মদ এবং দুধ পরিপূরক। একটার চাহিদা যত বাড়বে অন্যটির চাহিদাও ততই বাড়বে। কেউ যদি বেশি দুধ খেতে চায় তবে তাকে বেশি মদ বিক্রি করতে হবে। আবার

অন্যভাবে বললে বলা যায়, দুধ বেশি বিক্রি হলে তবেই মদ বেশি খাওয়া সম্ভব। আমাদের কল্যাণকামী সরকার দুধ এবং মদ দুটোই বিক্রি করে। মদ সিগারেট গাঁজা ভাং স্বাস্থ্যহানিকর সামগ্রীগুলো সরকার সরাসরি বিক্রি করে অথবা বিক্রি করতে সহায়তা করে। এর ফলে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি পায়। বর্ধিত রাজস্বের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ সরকার জনগণের জন্য চিকিৎসা পরিসেবা এবং শিক্ষা সম্প্রসারণের কাজে বিনিয়োগ করে। বস্তুত কোনও একটি কল্যাণকামী রাষ্ট্র তার জনগণকে মদ সিগারেট খেতে উৎসাহী করে তা ভাবা যায় না। এটি বিশ্বাস করতে কষ্টকর হলেও সত্যি। সরকারকে এটি করতে হয় নিছক অপারগ হয়ে। এজন্য অবশ্য সরকারের অনুশোচনার শেষ নেই। সিগারেটের প্যাকেটে সতর্কীকরণ থাকে — 'স্মোকিং ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ'। এটি লেখার জন্য লেখা থাকে বটে, কিন্তু সরকার মনেপ্রাণে চায় না যে লোকজন ধূমপান একেবারেই ছেড়ে দিক। ছাড়লে তো সরকারের সর্বনাশ। তাহলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিসেবার কী হবে? সরকার চায়, 'জেনেশুনে বিষ করেছি পান' মনে ভেবে যেন জনগণ মদ সিগারেট সেবন করে তুরীয়ানন্দে থাকে।

সরকার চাইলে মদ সিগারেট সেবন একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবে। সরকার চাইছে কি না সেটাই ব্যাপার। যারা কারখানায় মদ বা সিগারেট প্রস্তুত করে, তাদেরকে সরকারের কাছ থেকে ফি দিয়ে লাইসেন্স নিতে হয়। সরকার যদি আন্তরিকভাবে চায়, এগুলো প্রস্তুত না হোক, তবে ওদেরকে লাইসেন্স না দিলেই হয়। প্রস্তুত করতে দিয়ে, তারপর স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর বলে ক্রেতাদের সতর্ক করার কোনও মানে হয়? এ যেন চোরকে বলা, চুরি করো, আর গৃহস্থকে বলা, সজাগ থাকো।

সরকার যদি সত্যি সত্যি বলে, এ দেশে মদ সিগারেট গাঁজা ভাং প্রস্তুত করা নিষিদ্ধ। কাউকেই এসব স্বাস্থ্যহানিকর সামগ্রী প্রস্তুত করতে লাইসেন্স দেয়া হবে না। তা হলে কারোর সাধ্য আছে, এগুলো বানিয়ে বিক্রি করে? মাঝে মাঝে সংবাদে প্রকাশ পায়, সীমান্তরক্ষী বাহিনী অথবা রাজ্যের আরক্ষা দপ্তরের হাতে প্রচুর ফেন্সিডিল ধরা পড়েছে। ফেন্সিডিল একটি নিষিদ্ধ নেশার সামগ্রী। নিষিদ্ধ যদি হয়, তবে প্রস্তুত হল কী করে? পাচারকারীকে ধরার সাথে সাথে পুলিশের প্রস্তুতকারীকেও গ্রেপ্তার করা উচিত। পাচারকারীকে ধরা কঠিন, প্রস্তুতকারীকে ধরা সহজ। তার নাম ধাম ঠিকানা ফেন্সিডিলের শিশিতে লেখা আছে। সরকার চাইলে গোড়াতেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। সরকার চাইলে তবে তো?

ভারতের অনেক রাজ্যে মদ্যপান চালু থাকলেও কয়েকটা রাজ্য ছিল ব্যতিক্রম। অন্ধ্র এবং হরিয়ানায় একসময় মদ্যপান ছিল পুরো নিষিদ্ধ। মদ্যপান নিষিদ্ধ করার ফলে অন্ধ্রের রাজস্ব খুব কমে যায়। রাজস্ব হ্রাস থেকে উদ্ধার পাবার জন্য মদ্যপান আবার চালু করেছে অন্ধ্র সরকার। হরিয়ানাও সম্ভবত ওই একই কারণে মদ্যপানের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে

নিয়েছে। এটা হল অনিবার্য অর্থনৈতিক কারণ। হরিয়ানাতে মদ্যপান পুনঃপ্রবর্তনের পেছনে অর্থনৈতিক কারণ ছাড়াও একটা মানবিক কারণ রয়েছে। একসময় হরিয়ানাতে স্বামীরা মদ খেয়ে স্ত্রীদের পেটাত, সংসারে অশান্তি করত। এজন্য সেখানে মদ্যপান নিষিদ্ধ হওয়াতে মহিলারা খুবই খুশি হয়েছিল। মজার ব্যাপার হল, হরিয়ানা 'শুষ্ক' হলেও প্রতিবেশি রাজ্য দিল্লি 'সিক্ত'। ওখানে মদের ফোয়ারা বইছে। আগে যখন হরিয়ানায় মদ পাওয়া যেত, মরদেরা মদ খেয়ে মাতাল হয়ে রাত্তিরে ঘরে ফিরত। নিষেধাজ্ঞার ফলে হরিয়ানার মরদেরা মদ খেতে দিল্লি যায়। ঘরে ফেরে দুতিনদিন পর। আগে তো তবু সেদিনই ফিরত! মদ্যপান আবার চালু হওয়াতে সেটা হল মন্দের ভালো। মরদ অন্তত সেদিনই ঘরে ফিরবে। মদ্যপান নিষিদ্ধ এবং প্রবর্তনের রসময় গল্পে টেক্কা দিয়েছে, সাম্প্রতিক কালের রাশিয়া। বিগত শতাব্দীর শেষেব দশকে রাশিয়ায় 'পেরেস্ত্রয়কা' বা 'মুক্ত অর্থনীতি' চালু করেন প্রিমিয়ার গর্বাচভ। পেরেস্ত্রয়কার ফলে অনেক লৌহ কঠিন আইন শিথিলতা প্রাপ্ত হয় সেখানে। 'ভদ্‌কা' হল রাশিয়ানদের একটি প্রিয় মদ্যের নাম। শোনা যায়, ভদ্‌কার কাছে আমাদের দেশীয় 'বাংলা' বা 'চুয়াক' একেবারেই শিশু।

পেরেস্ত্রয়কার আগে রাশিয়ায় ভদ্‌কা পাওয়া যেত সীমিত পরিমাণে, রেশানে। গর্বাচভের পেরেস্ত্রয়কার সুবাদে এখন ভদ্‌কা মাথাপিছু অঢেল পাওয়া যাওয়ার কথা। মদের দোকানের সামনে বিরাট লম্বা লাইন নেশাড়ুদের। ঘন্টার পর ঘন্টা বয়ে যাচ্ছে, লাইন এগোচ্ছে যেন শম্বুক গতিতে। লাইনের একজন অধৈর্য হয়ে পেছনের লোকটিকে বলল, কমরেড, আপনার সামনে আমি। আমার লাইনটা রাখবেন তো! আমি এখুনিই আসছি।

কোথায় যাচ্ছেন কমরেড? পেছনের লোকটি জানতে চাইল।

যাচ্ছি ক্রেমলিনের রেড.স্কোয়ারে। গর্বাচভের নাকে একটা ঘুসি মেরে আসি। লাইনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পায়ে ব্যথা হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ বাদে লোকটা বিষণ্ণ বদনে ফিরে এল। সে কি গর্বাচভকে ঘুসি মেরে এসেছে? আজ্ঞে না। সেখানে আরও বড়ো বিরাট লম্বা লাইন।

অন্নপূর্ণা ডাল-ভাত কেন্দ্র

পুরো প্রায় এক বছর আমি ভিলাইয়ে ছিলাম। ভিলাই হল ছত্তিশগড় রাজ্যের একটি শিল্পনগরী। এখানে রয়েছে ভিলাই স্টিল প্ল্যান্ট — এশিয়ার বৃহত্তম লৌহশিল্প কারখানাটি। রাশিয়ার ইঞ্জিনিয়ারদের সহযোগিতায় এবং তদানীন্তন সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রযুক্তির বিনিময়ের ফলে ভিলাই স্টিল প্ল্যান্টটি স্থাপিত হয়েছিল। ফলে একসময় ভিলাইয়ে রাশিয়ার অনেক প্রকৌশলী ও কারিগরদের উপস্থিতি ছিল। ভিলাইয়ে এখন রাশিয়ানরা নেই বললেই চলে, প্রায় সবাই তাদের দেশে ফিরে গিয়েছে। ভিলাইয়ে রাশিয়ানরা নেই বটে, তবে এখনও ওখানের অনেক দোকানপাটের মালিক কর্মচারীরা চোস্ত রাশিয়ান ভাষা জানে। একথা জেনে আমি খুব অবাক হয়ে গিয়েছি। বিক্রেতাদের জন্য ভাষা বিদেশি হলেও ক্রেতাদের প্রয়োজনে সে ভাষা শিখে নেবার খুব একটা নজির দেখা যায় না। এক বছর থাকার সুবাদে, এখানকার দোকানিদের সাথে আমার অন্তরঙ্গতা এবং ঘনিষ্ঠতা হয়ে যায়। বিনিময়ে আমি দু একটা রাশিয়ান শব্দ শিখে নিই। একাধিক শব্দ যা আমি শিখেছিলাম, তা বেশ কিছুদিন চর্চার অভাবে ভুলে গিয়েছি। কিন্তু একটা শব্দ আমার স্মৃতিতে বেশ জ্বলজ্বল করছে। শব্দটি আমার খুব প্রিয়, এজন্য সম্ভবত ভুলব না অনেকদিন। শব্দটি হল — 'দাসদাভানিয়া'। শুনেছি, রাশিয়ায় প্রেমিক প্রেমিকা পরস্পরের কাছ ছেকে বিদায় নেবার সময় বলে, দাসদাভানিয়া। এর অর্থ হল, যতক্ষণ পর্যন্ত না আবার দেখা হচ্ছে, বন্ধু, ততক্ষণের জন্য বিদায়। ইংরেজিতে বিদায়ের জন্য একটি শব্দ আছে, গুড-বাই। 'দাসদাভানিয়া' এবং 'গুড বাই'এর মধ্যে আকাশ পাতাল তফাত। সাময়িক বিদায় এবং চিরকালীন বিদায় দুটি এক কথা নয়। 'দাসদাভানিয়া'তে যে হৃদয়ের উষ্ণতা এবং ভাবাবেগ রয়েছে, শুধুমাত্র 'গুডবাই'এ তা নিদারুণভাবে অনুপস্থিত। আমি পরে এও শুনেছি, রাশিয়ায় শুধুমাত্র প্রেমিক প্রেমিকাই নয়, অধস্তন কর্মচারীও জাঁদরেল মনিবকে বিদায়ের প্রাক্কালে সম্বোধন করে বলে, দাসদাভানিয়া। 'দাসদাভানিয়া' একটি জনপ্রিয় এবং বহুল ব্যবহৃত শব্দ।

ভিলাইয়ে এক বছর থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি, অনেক কিছু দেখেছি। জীবনে বস্তুত দেখা এবং জানার শেষ নেই। ভিলাইয়ের এবং ছত্তিশগড়ের অন্যান্য শহর বা অঞ্চলে প্রচুর বঙ্গসন্তানের বসবাস। রাজধানী রায়পুরের একাধিক চৌরাস্তার মোড়ে স্বামী বিবেকানন্দের প্রস্তর মূর্তি শোভা পাচ্ছে। ছত্তিশগড়ের পণ্ডিত রবিশংকর শুক্লা বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে রায়পুরে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের অফিস সুবৃহৎ অট্টালিকায় অবস্থিত। উপাচার্যকে এদেশে বলে কুলপতি। রায়পুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কুলপতির অফিসের সামনে বাগিচায় শোভিত হচ্ছে বিশাল প্রস্তর মূর্তি স্বামী বিবেকানন্দের। একজন অধ্যাপক বন্ধু আমাকে জানালেন, কলকাতা ছাড়া ভারতবর্ষের কোথাও নাকি বিবেকানন্দ এত দীর্ঘদিন যাপন করেননি, যা তিনি রায়পুরে একসময় অতিবাহিত করেছিলেন। রায়পুর তাই বিবেকানন্দ স্মৃতিতে পূত পবিত্র।

ছত্তিশগড়ের সর্বত্র, প্রায় সব বড়ো বড়ো শহর যেমন রায়পুর, বিলাসপুর, দূর্গ এবং ভিলাইয়ে রয়েছে আন্তঃরাজ্য পরিবহনের জন্য বাস টার্মিনাস বা বাস আড্ডা। মোটামুটি সব বাস আড্ডাতেই রয়েছে 'অন্নপূর্ণা ডাল-ভাত কেন্দ্র' এর বিরাট সাইনবোর্ড। এই অন্নপূর্ণা ডাল -ভাত কেন্দ্রে পাওয়া যায় খাওয়ার জন্য সস্তায়, মাত্র পাঁচ টাকায় মিল বা ভোজন। পেট ভরে মাত্র পাঁচ টাকায় মধ্যাহ্ন বা নৈশ ভোজন সম্পন্ন করা যায় এই কেন্দ্রগুলোতে। ছত্তিশগড়ের প্রায় সব বাস আড্ডাতে রয়েছে 'অন্নপূর্ণা ডাল-ভাত কেন্দ্র'। বাসযাত্রীরা, গরিব বা নিম্নবিত্তেরা মাত্র পাঁচ টাকার বিনিময়ে খায় এখানে। অবশ্য এখানে আহার গ্রহণ করার জন্য উচ্চবিত্তদের জন্যও কোনও বাধা নেই। যে কেউ এখানে ডাল ভাত পাঁচ টাকায় খেতে পারে। শুধু ডাল আর ভাত — পেট যতক্ষণ ভর্তি না হচ্ছে ততক্ষণ অব্দি। আমি খেয়েছি একাধিক বার। মন্দ না। প্রথমবার আমি 'অন্নপূর্ণা ডাল-ভাত কেন্দ্র'র ব্যাপার-স্যাপার দেখে অবাক হয়ে গিয়েছি। মাত্র পাঁচ টাকায় আজকাল পেট ভরে ভোজন হয় নাকি? আগরতলায় এক্ষুনি মাত্র দুটি লেবুর দাম দশ টাকা। অর্থাৎ একটা লেবুর মূল্য হল পাঁচ টাকা। এখন অবস্থা এমন, এক টাকা দু টাকার নোট অদৃশ্য। মনে হয় সর্বনিম্ন টাকা হল পাঁচ টাকা। এখন রিক্শায় উঠলেই ভাড়া বাবদ পাঁচ টাকা দিতে হয়। দোকানে পাঁচ টাকার কম জিনিস কিনলে বলে খুচরো নেই। এটা সেটা মিলিয়ে কম করে পাঁচ টাকার জিনিস না কিনলে দোকানি ক্ষুব্ধ হয়। এহেন অবস্থায় পাঁচ টাকায় মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে ঢেঁকুর তোলা — বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়।

আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি, ছত্তিশগড়ের 'অন্নপূর্ণা ডাল-ভাত কেন্দ্র'গুলো চলছে সরকারি ব্যবস্থাপনায়। সরকার কেন্দ্রগুলোকে সস্তায় চাল ডালের যোগান দেয়। আর ভোজনের মূল্য বেঁধে দিয়েছে পাঁচ টাকায়। কেন্দ্রগুলোর পরিচালনার ভার বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ওপর ন্যস্ত। ব্যবস্থাপনাটি অনেকটা রেশন শপ বা ন্যায্য মূল্যের দোকানচালনার মতো। রেশন দোকান থেকে নির্দিষ্ট মূল্যে চাল ডাল পাওয়া যায়। আর 'অন্নপূর্ণা ডাল-ভাত কেন্দ্র'তে ন্যায্য পাঁচ টাকা মূল্যে রাঁধা ভাত এবং ডাল পাওয়া যায়, যতক্ষণ না উদরপূর্তি হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত।

সরকারের তরফ থেকে চাল এবং ডাল সরবরাহ করা হয় খুব কম মূল্যে। 'অন্নপূর্ণা ডাল-ভাত কেন্দ্র'র একজন বেসরকারি কর্মকর্তার সঙ্গে আমি কথা বলেছি। চাল ডালের দাম (ন্যায্য মূল্যে সরকার কর্তৃক সরবরাহ করা) নুন তেল মশলা এবং লাকড়ির দাম যোগ করে

নাকি চার টাকার মধ্যে হয়ে যায়। মিল পিছু মুনাফা হল কম বেশি এক টাকার মতো। মন্দ কী, প্রতি পাঁচ টাকায় এক টাকা লাভ। মুনাফার হার হল কুড়ি শতাংশ। তার চেয়ে বড়ো কথা হল, ঘর থেকে পথে বেরিয়ে মাত্র পাঁচ টাকায় পেট ভর্তি করে খেতে পাওয়া, এটা কম বড়ো কথা নয়।

'অন্নপূর্ণা ডাল-ভাত কেন্দ্র'তে শুধু ডাল আর ভাত পাওয়া যায়, আর কিছু না। অতিরিক্ত একটি পদ দিলে আরও ভালো হয়। একথা আমি জেনেছি আমার পাশে খেতে বসা সেদিনের দেহাতি লোকটির কাছ থেকে। অবশ্য আমি জানি, অতিরিক্ত একটি পদ দিলে হয়ত পাঁচ টাকায় তা কুলোবে না। আমার মনে হয়েছে, ডাল ভাতের সঙ্গে আলু সেদ্ধ ভর্তা দিলে কেমন হয়? পেঁয়াজ এবং কাঁচা লঙ্কাসহ আলু ভর্তা, ডাল আর ভাতের সঙ্গে জমবে ভালো। দাম পাঁচ টাকাই রাখতে হবে। এতে হয়ত বে-সরকারি পরিচালকের লভ্যাংশের হার খানিকটা কমে যাবে — তাতে খুব একটা মহাভারত অশুদ্ধ হবে না হয়তো।

ত্রিপুরা সরকার ইচ্ছে করলেই ত্রিপুরার জনগণকে এরকম 'অন্নপূর্ণা ডাল-ভাত কেন্দ্র' প্রকল্প উপহার দিতে পারেন — এইরকম একটা প্রত্যাশা নিয়ে এই লেখা শেষ করছি।

ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ

অসুখবিসুখ এখন যেমন আছে আগেও তেমন ছিল। প্রাচীনকালের একজন প্রসিদ্ধ ঋষির নাম চার্বাক। সুখ এবং সুস্বাস্থ্যের জন্য চার্বাক উপদেশ দিয়েছিলেন, 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ'। অর্থাৎ ঋণ করেও ঘি খাওয়া উচিত। জীবনে অনেক কিছুই খাওয়া উচিত, চার্বাকের মতে ঘি অবশ্যই খাওয়া কর্তব্য। গাঁটে পয়সা না থাকলে অন্তত ধারদেনা করেও ঘিকে খাদ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। চার্বাকের মতো ব্যক্তি যখন একথা বলেছেন তখন নিশ্চয়ই এর মধ্যে সারবত্তা আছে — হেলাফেলা করে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

এখন অবশ্য লোকজন স্বাস্থ্য সম্পর্কে অত্যধিক সচেতন। চার্বাকের পরামর্শমতো ঋণ করে ঘি খাওয়ার আগে একাধিকবার তারা ভাববে। কেননা ঘি রসনার পক্ষে কাম্য হলেও

স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে শুভকারক নয়। ঋণ করে বা না করে বেশি ঘি খেলে স্বাস্থ্যহানি নিশ্চিত। ঘি খেলে চর্বি হয়। ঘি খেলে অনেক কারণে ধমনী দিয়ে রক্ত প্রবাহ স্তিমিত হয়ে আসে। তার চেয়ে বড় কথা, ঘি হজমক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটায় এবং ঘি হল অগ্নিমান্দ্য রোগে পীড়িত হওয়ার জন্য মোক্ষম কারণ। অগ্নিমান্দ্য অসুখটি সম্ভবত ঘি খাওয়ার কারণে বদহজমের ফলে অ্যাসিডিটির আধিক্যে উৎপন্ন হয়। চার্বাক বলে খালাস, কিন্তু জীবন যে ঘৃত গ্রহণে ঢেঁকুরে ঢেঁকুরে বিড়ম্বিত হয়ে যায়, অগ্নিদেবতা তা হাড়ে হাড়ে জেনেছিলেন। ঘৃতপ্রীতির জন্য ভীষণ মূল্য দিতে হয়েছিল অগ্নিদেবকে। মহাভারতে উল্লেখ আছে, শ্বেতকী রাজার যজ্ঞে অতিরিক্ত হবি (ঘি) ভক্ষণ করে অগ্নিদেব দুঃসাধ্য অগ্নিমান্দ্য রোগে আক্রান্ত হন। তার ফলে অগ্নিদেবের হজমক্রিয়া ব্যাহত হয়। তিনি বদহজমের শিকার হয়ে তখনকার একাধিক চিকিৎসক এবং চিকিৎসক নন অথচ সংসারের বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের দুয়ারে দুয়ারে ঢুঁ মারতে থাকেন। শেষমেশ অগ্নিদেব ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। ব্রহ্মা চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন কিনা জানা না গেলেও আমন্ত্রিত হয়ে যজ্ঞে নিজেও অনেকবার হবি গ্রহণ করেছেন। সঙ্গত কারণেই আশংকা করা যায় অত্যধিক ঘি গ্রহণে ব্রহ্মাও অতীতে বদহজমজনিত পীড়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। নিজের অতীত অভিজ্ঞতা থেকে ব্রহ্মা তখন অগ্নিকে রোগমুক্তি এবং শক্তিসঞ্চয়ের জন্য খান্ডববনের সমস্ত জীবজন্তু দৈত্যদানব এবং সর্পভক্ষণের জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। মহাভারত থেকে আরও জানা যায়, অর্জুন এবং কৃষ্ণের সহায়তায় খান্ডববন দহন করে অগ্নিদেব তাই খেয়ে সে যাত্রায় রোগমুক্ত হয়ে রক্ষা পান।

চার্বাকের 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ' উপদেশটির দুটি দিক আছে যা কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। ঘি খেলে যে বদহজম হয়, স্বাস্থ্যহানি ঘটে, চার্বাকের মতো একজন জ্ঞানীগুণী ঋষিমুনি তা জানতেন না তা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায়, তবু কেন চার্বাক লোককে ঋণ করেও ঘি খেতে বলেছিলেন ? তখনকার দিনে মুনিঋষিরা নগরীর উপান্তে নদীর তীরে আশ্রম চালাতেন — তাতে ছাত্রেরা অধ্যয়ন করত। আশ্রমগুলো ছিল মূলত ছাত্রাবাস। সেখানে পড়াশোনার সাথে সাথে কৃষিকার্য হত এবং গো পালন হত। আশ্রমবাসীদের প্রয়োজন মিটিয়েও গো-পালন থেকে উদ্বৃত্ত দুগ্ধ উৎপাদিত হত। সে সময় দুগ্ধসংরক্ষণের সুব্যবস্থা ছিল না বললেই চলে। দুধের যোগানের তুলনায় দুধের চাহিদা কম হত বলে উদ্বৃত্ত দুগ্ধ নষ্ট হত। চার্বাক মুনির পরামর্শ ছিল, ঋণের মাধ্যমে দুধের চাহিদা বৃদ্ধির। দাম পরে দিলেও চলবে, তবু উদ্বৃত্ত দুগ্ধকে বিনষ্টির হাত থেকে বাঁচানো। ব্যাপারস্যাপার দেখে মনে হয়, চার্বাকের ব্যক্তিত্ব ছিল দ্বিখণ্ডিত। একজন চার্বাক ছিলেন, তিনি মুনিঋষি। আর একজন চার্বাক ছিলেন, তিনি গো-পালন সংগঠনের সঞ্চালক। গো-পালন সংগঠনের সঞ্চালক হিসেবে চার্বাক চেয়েছিলেন তাঁর আশ্রমের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ঘটুক। উদ্বৃত্ত দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি ঘি, মাখন, ছানার

বিক্রিবাটা বাড়ুক। ভোক্তাদের তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন, গাঁটে কড়ি না থাকলেও যেন তারা ঋণ করে আশ্রমজাত দুগ্ধদ্রব্যাদি বেশি বেশি করে কেনে। আধুনিককালেরও চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা ব্যবসার মনোভাবকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। নার্সিংহোমে বা বেসরকারি হাসপাতালে রোগী মারা যাওয়ার পর চিকিৎসার বিল না মেটালে তার মৃতদেহ আত্মীয়স্বজনকে দেয়া হয় না, মর্গে পচতে থাকে। সরকারি হাসপাতালেও এখন পরিসেবা পেতে গেলে মূল্য দিতে হয়। ইদানীং চিকিৎসাবিমা·চালু হয়েছে। এটাও একটি প্রচ্ছন্ন ঋণ প্রকল্প। চিকিৎসা পেশাকে এতকাল একটি মানবিক পেশা বলে বিবেচনা করা হত। চিকিৎসার সঙ্গে ব্যবসায়িক মনোভাবের কোনও সম্পর্ক ছিল না বলেই মনে করা হত। ঘটনাচক্রে, চিকিৎসা এবং ব্যবসার মধ্যে যে এতকাল সুতো পরিমাণ বিভেদ ছিল, এখন তাও লুপ্ত হবার পথে। নার্সিংহোমের বিরাট পরিমাণের চিকিৎসার বিল দিতে না পারার আশঙ্কায় অনেক রোগী সুস্থ হওয়ার আগেই জানালা দিয়ে ভেগে যায়, এই অভিযোগ ডাক্তারবাবুদের কাছ থেকে শোনা বৃত্তান্তের মধ্যে একটি।

চার্বাক সেকালে ঋণ করে ঘি খেতে বলেছিলেন। আর কী কী বলেছিলেন, তা জানা যায় না। ইদানীং ঋণ করে জীবনের প্রায় সবকিছুকে উপভোগ করার জন্য উৎসাহিত করা হয়ে থাকে। ঋণ নিয়ে শিক্ষার জন্য পড়াশোনা করা যায়, পরে চাকরি পেয়ে বা উপার্জন করে শোধ করে দিলেই চলে। সংসারের যাবতীয় প্রয়োজন বর্তমানে মেটানো যায় ঋণের টাকা দিয়ে, তবে ভবিষ্যতে সুদসহ ঋণ ফেরতযোগ্য। একসময় সুদকে ঘৃণ্য বলে বিবেচনা করা হত। সুদখোর হল একটি সামাজিক গালি। এখন সরকার নিজেই সুদখোর — রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলো গাড়ি, বাড়ি, ফ্রিজ, টি ভি কেনার জন্য ঋণ দিচ্ছে। তারপর সুদে-আসলে আদায় করছে যথাসময়ে। সুদসহ ঋণ নির্দিষ্ট সময়ে পরিশোধ করতে না পারলে ঋণ গ্রহীতার হেনস্তার সীমা নেই। সরকারের কাছেই এই অবস্থা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর কথা এক্ষেত্রে বেশি না বলাই ভালো। ওরা ধরে আনতে বললে বেঁধে নিয়ে আসে।

ঋণ পরিশোধতব্য, এ বিষয়ে কোনও বিতর্ক নেই। কিন্তু সংসারের এমন ঋণের ব্যাপারও আছে যা পরিশোধ করার প্রশ্ন ওঠে না, যদিও তা দিন দিন বেড়েই চলে। ঋণ প্রাপ্তির ফলে যে ঋণী সে নিজেকে ধন্য মনে করে। যারা একসময় ঋণ দিয়েছিল তারাও ফেরত পাবার জন্য তাগাদা দেয় না। ঋণ অনাদায়ি রেখে তারা একদিন সংসার ত্যাগ করে। অর্থনীতি শাস্ত্রের বহির্ভূত ঋণ হল মাতৃঋণ পিতৃঋণ। অপরিশোধ্য এই পিতৃমাতৃঋণ একমাত্র পরবর্তী প্রজন্মকে ঋণদায়ে নূতন করে আবদ্ধ করার মধ্যেই, পূর্ববর্তী ঋণ শোধের একমাত্র উপায় বলে বিবেচিত হয়।

কী আনন্দ

কিছু পেতে গেলে, তার জন্য মূল্য দিতে হয়। সংসারের এটাই নিয়ম। কাঁদলে তবে কোলের শিশুকে মা তার বুকের দুধ দেয়। দুধ পাওয়ার জন্য কান্নাটা মূল্য। বিনামূল্যে সংসারে জোটে না কিছুই।

সংসারে আনন্দ পেতে গেলে তার জন্য মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে। পরোপকার করে অনেকে নির্মল আনন্দ পায়। অবশ্য পরোপকারের জন্যও খরচ আছে। খরচ অনেক রকমের হতে পারে। গাঁটের টাকাপয়সা ছাড়াও অন্য ধরনের ব্যয়ের মাধ্যমে পরোপকার সাধিত করা যায়। নীরবে সবার অগোচরে অনেকে অন্যের উপকার করে তৃপ্তি খুঁজে পায়। তারা আত্মপ্রচারবিমুখ।

অনেকে হয়তো মানতে চাইবে না, অনেকে হয়তো বিশ্বাস করবে না, তবু সাংসারিক অভিজ্ঞতা থেকে একটা সত্য প্রায় প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে — তা হল, পরের উপকার থেকে যেমন আনন্দ পাওয়া যায়, তেমনি পরের ক্ষতি থেকেও আনন্দ পাওয়া যায়। আনন্দ আনন্দই। তবে এই দুধরনের আনন্দের মধ্যে তফাত আছে। পরোপকারের মাধ্যমে অর্জিত আনন্দ হল ব্যয়সাপেক্ষ আর পরের ক্ষতির মধ্যে আনন্দপ্রাপ্তি হয় নিখরচায়। পাশের বাড়ির ডাঁটাগাছ যদি অন্যের ছাগলে মুড়িয়ে দেয় তবে প্রতিবেশির মনে নির্মল আনন্দের বন্যা বয়ে যায়।

এই আনন্দকে অন্য আনন্দের সঙ্গে তুলনা করা চলে না। পরের ডাঁটাগাছ, পরের ছাগল — সবই পরে পরে। কিন্তু আনন্দটা নিজস্ব। এই আনন্দে কেউ ভাগ বসাতে আসবে না। নির্বাচনে অন্য কনস্টিটিউয়েন্সিতে জাঁদরেল একজন প্রার্থী হেরে গেলে ভিন্ন নির্বাচনি এলাকার জনৈক ভোটারের আনন্দ আর ধরে না, যদিও প্রার্থীর হারা বা জেতার পশ্চাতে তার কোনও ভূমিকাই নেই।

আজকাল পয়সা খরচ করে আনন্দের চেয়ে পয়সা খরচ না করে আনন্দ পাওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। এটা খুবই স্বাভাবিক। মনুষ্যচরিত্রের সঙ্গে তা খুব খাপ খেয়ে যায়। কোনও কিছুর মূল্য কম হলে বা শূন্য হলে তার চাহিদা হয় বল্‌গাহীন।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, অন্যের ভোগান্তি বা কষ্ট হলে বিনিময়ে যে আনন্দ পাওয়া যায় তার জন্য কোনও খরচ নেই। নিখরচায় আনন্দ পেতে কার না ভালো লাগে। এ

ব্যাপারে সরকারি বা আধা সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা ভাগ্যবান। তাদের অফিসের কাজে অফুরন্ত আনন্দ। বেতন তাদের খাড়া আছে। উপরি আনন্দ পেতে তাদেরকে একটা ফুটো পয়সাও খরচ করতে হয় না। এ ব্যাপারে বি এস এন এল (ভারতীয় সঞ্চার নিগম লিমিটেড) -এর তুলনা নেই। তারা এখন নাম্বার ওয়ানে আছে। একসময় ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স সবার ওপরে ছিল। মাঝে মাঝে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলো অন্যদেরকে ছাপিয়ে ওপরে উঠে যায়। ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স প্রতিযোগিতা থেকে মনে হয়, নাম তুলে নিয়েছে। দৃশ্যত ব্যাঙ্ক এবং টেলিফোন পরিসেবা সরবরাহকারী বি এস এন এল-এর মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে। ত্রিপুরার বিদ্যুৎ নিগমও কম যায় না। গ্রাহকদের ভোগান্তি দিতে কেউ কারোর চেয়ে কম নয়। ভোগান্তিতে গ্রাহকদের মুখ মলিন হলে প্রতিষ্ঠানগুলোর অনেক কর্মীর (সবার নয়) মুখে অনির্বচনীয় এক আনন্দের নীলাভ দ্যুতি ভেসে ওঠে। মাসান্তে টেলিফোনের বিল দেবার সময় বিরাট লম্বা লাইন। ভিড়ে হাঁসফাঁস অবস্থা। অনেক ধৈর্যের পরীক্ষার শেষে যখন পেমেন্ট করার সময়, তখন জানা গেল সঠিক খুচরো টাকা না দিলে বিল জমা নেয়া হবে না। কাউন্টারের ঐ পাশে বসা কর্মীটির মুখে 'কী আনন্দ!' আর গ্রাহকের মুখ তখন বিধ্বস্ত ভাঙাচোরা। অথচ ইচ্ছে করলেই গ্রাহকের মুখে হাসি ফোটানো যেত। টেলিফোনের বিলের টাকা গ্রাহকের ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট থেকে মাসে মাসে নির্দেশমতো কেটে নেয়া যেত। তাতে গ্রাহকের অহেতুক ভোগান্তি কমত। ভারতের মোটামুটি সব রাজধানী শহরেই ব্যাঙ্কের মাধ্যমে টেলিফোন, ইলেক্ট্রিসিটি এবং অন্যান্য বিল আদায় করা হয়। এতে সাশ্রয় হয় অনেক কিছুর। আগরতলায় হয় না কেন? আগরতলা কি ভারতের বাইরে? হবে হয়তো একদিন। যতদিন না হচ্ছে, ততদিনই ভালো। বিনে খরচে কর্মীরা অফুরন্ত আনন্দের যোগান পাচ্ছে। ক্রেতা বা গ্রাহকেরা গোমড়ামুখে ঘোরাফেরা করবে, ডেস্ক থেকে ডেস্কে গিয়ে কর্মীদেরকে তেল দেবে — তাতে যে কী আনন্দ কী করে বোঝানো যায়! খাঁটি সরষের তেলও তোষামোদের এই তেলের কাছে হার মানে।

অন্যের কষ্টের বা ক্ষতির ফলে নিজের লাভ বা আনন্দ হয়, এই প্রসঙ্গে একটি নির্মম গল্প মনে এল। বাইরে দৃশ্যত দুই বন্ধু, আর ভেতরে ভেতরে কেউ কাউকে ছেড়ে দেবার পাত্র নয়, এমন দুজনের সামনে উপস্থিত হয়েছে একটি জিন। জিন বর দিতে চায় — প্রথম বন্ধু যা চাইবে তা পাবে আর দ্বিতীয় বন্ধুটি পাবে তার দ্বিগুণ। প্রথম বন্ধুটি যদি বর চায় এক লক্ষ টাকার তবে এক লক্ষ টাকা সে পাবে কিন্তু বরের শর্তানুসারে দ্বিতীয় বন্ধুটি পাবে দু লক্ষ টাকা। এ কি আর প্রাণে সয়!

অনেক ভেবেচিন্তে প্রথম বন্ধুটি জিনের কাছে চাইল, আমার একটা চোখ অন্ধ করে দাও। তৎক্ষণাৎ তার একটি চোখ দৃষ্টিহীন হয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে অন্য বন্ধুটি দুটি চোখ হারিয়ে পুরো অন্ধ হয়ে গেল। কী আনন্দ! তবে মনে রাখতে হবে, বি এস এন এল কর্মীকেও

ইলেকট্রিক বিল দিতে হয়। আর বিদ্যুৎ নিগমের কর্মীদেরও দিতে হয় টেলিফোন বিল। সংসারের নিয়ম অদ্ভুত হলেও অদ্ভুত নয়।

প্রযুক্তি জিন্দাবাদ

আজকালকার মতো এত কলমের ছড়াছড়ি ছিল না আগে। আগে লেখার জন্য নিবের কলম ছিল — আর কালি ভর্তি দোয়াত। দোয়াতে চুবিয়ে নিবের কলম দিয়ে লেখা হত সবকিছু। তারপর এল ঝরনা কলম বা ফাউন্টেন পেন। বারে বারে দোয়াতে ডোবানোর দরকার নেই। কলমের পেটের মধ্যে কালি ঢোকানো থাকত — ঝরনার মতো অবিরাম কালি প্রবাহিত হত। নিবের কলমের থেকে ঝরনা কলমে উত্তরণ ছিল এক বিরাট বৈপ্লবিক কাণ্ড। পরীক্ষার হলে দোয়াত নিয়ে যেতে হয় না — দোয়াত উল্টে পরীক্ষার খাতা লেপটে যায় না। ঝরনা কলম পকেটে করে ঘুরে বেড়ানোর জন্য একটি অভিজাত সুলভ বাবুগিরি ছিল। এটা কাউকে মুখ ফুটে বলতে হত না। ঠাটে-বাটে প্রকাশিত হত। ঝরনা কলম এল তো দোয়াতসুদ্ধ নিবের কলমের বিসর্জন হয়ে গেল। নিবের কলমের আগে পাখির পালকের কলম ছিল। প্রাচীনকালের মানুষেরা তা দিয়ে লিখতেন। মনে হয় না পালকের কলমের খুব একটা রমরমা ছিল, তখন পড়তে লিখতে জানতেনই বা কজন।

পাখির পালকের কলমের দিন গেল — দিন গেল নিবের কলমের। ঝরনা কলম এল — আবার ঝরনা কলমও গেল। এখন ডটপেনের দিন। কালি দোয়াতের ছুটি এখন। এখনকার ছেলেমেয়েরা হয়ত জানবে না — এই সেদিনও 'সুলেখা' কালি বলে একটি কালি মা সরস্বতীর কৃপাধন্য হয়ে বাঙালির ঘরে ঘরে শোভা পেত। সুলেখা কালি কোম্পানির একটি বিজ্ঞাপন ।

মন চায় লিখব কী
কী জানি কী লেখা।
লিখে কি ফুরাতে পার
পাও যদি সুলেখা।

এখন 'সুলেখা'কেও আর দেখা যায় না। সে জায়গায় এসেছে এড জেল। টিভিতে বিজ্ঞাপন ভেসে ওঠে সেটি কি কলমের না ক্ষীণকটি তন্বী রূপসীর ধন্দ লাগে! লেখালেখির

কথা ভুলে গিয়ে দৃষ্টি আঠার মতো সেঁটে থাকে টিভির পর্দায়।

আগে এক সময় পুঁথি ছিল। পাখির পালক দিয়ে তুলোট কাগজে গাবগাছের ফল থেকে নিষ্কাশিত কুচকুচে কালো কালি দিয়ে মুক্তোর অক্ষরে লেখা হত সেইসব পুঁথি। সময় প্রবাহে পাখির পালক বিদায় হয়েছে, বিদায় হয়েছে তুলোট কাগজ, এখন গাবগাছেরও দেখা পাওয়া ভার। পুঁথিকে বিদায় দিয়ে জাঁকিয়ে বসেছে পুস্তক। এসেছে ছাপাযন্ত্র। একটা দুর্মূল্য পুঁথি নয় — এখন যন্ত্রদানবের কল্যাণে শত সহস্র একই বই ছাপা হয়ে পাঠকের হাতে পৌঁছে যাচ্ছে। আধুনিকতার ছোঁয়ায় মুদ্রণে এসেছে পারিপাট্য। কী ছাপা কী বাঁধাই কী কাগজ গন্ধ শুঁকে বুক ভরে প্রশ্বাস নিয়ে নিঃশ্বাস ফেলতে ইচ্ছে করে না।

এখানে একটা জিনিস লক্ষ করার মতো — পুরোনোকে পথ ছেড়ে দিতে হয় — নূতন প্রযুক্তি এসে সেই স্থান দখল করে নেয়। আবার নূতনতর প্রযুক্তি এলে নূতন প্রযুক্তি সরে দাঁড়াবে। এর মধ্যে নূতনত্ব কিছু নেই। কিন্তু মুশকিল হল — এই অনেক ক্ষেত্রে নূতনকে বরণ করে নিতে আমাদের তীব্র অনীহা। আমরা পুরোনোতেই মজে থাকতে চাই — আমাদের পুরোনোই ভালো। পুরোনো কী করে ভালো হয়? পুরোনো কি কোনোদিন নূতনের চেয়ে ভালো হতে পারে? আগের চেয়ে উন্নত এবং উৎকৃষ্ট বলেই তো নূতন নূতনই। তাই নূতনকে স্বাগত না জানানো হল নিজেরই পায়ে কুড়োল মারা। এখন যদি কেউ পুরোনোকে ভালোবেসে বলে, আমি পাখির পালক বা নিবের কলম দোয়াতে চুবিয়ে লিখব — তা কি সম্ভব? তিন ঘন্টায় একশ নম্বরের ইতিহাস প্রশ্নের উত্তর লিখতে অন্তত ছঘন্টা লাগবে। বেলা পড়ে এলে অন্ধকার হয়ে যায় — তার ওপর থাকে পাক্কা দেড় ঘন্টা লোডশেডিং। তাছাড়া ক্লাস থ্রি / ফোরের ওভারটাইমের টাকা আসবে কোত্থেকে? পরীক্ষার হলের ইনভিজিলেটর নির্মল মাস্টারের অসুবিধেটা কে দেখবে? আগরতলার শেষ বাসটা আসে সন্ধে সাতটায়। সেই বাসটা মিস করলে তিনি বাড়ি ফিরবেন কী করে? রাত সাতটার পর এসকর্ট তুলে নেবে আরক্ষা বাহিনী। আগরতলা থেকে উদয়পুর যাতায়াত বন্ধ। কী কাণ্ড! উগ্রপন্থী, এসকর্ট আরক্ষা দপ্তর এবং বিদ্যুৎ দপ্তরের সৌজন্যে পুরোনোর প্রতি নিখাদ প্রেম থাকলেও নিবের কলমের জমানায় ফিরে যাওয়া যায় না।

পুস্তক প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত প্রকাশক / বিক্রেতা এবং লেখকদের মনে দুঃখ লোকেরা বই কেনে না, কিন্তু লাইন দিয়ে এগরোল খায়। এখন একটা প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন — লোকেরা কেন বই কিনবে? দেখে শুনে তো মনে হয় উন্নততর প্রযুক্তির দৌলতে বইয়ের বিদায়ের ঘন্টা বেজে গিয়েছে। ছাপা বই পড়ে যা জানা যায় বই না পড়েও যদি তা জানা যায় বা তার চেয়ে বেশি জানা যায়, তবে লোকে বই পড়তে যাবে কেন? ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং ইন্টারনেটের সুবাদে জ্ঞানের সাম্প্রদায়িকতম ভাণ্ডারের চাবিকাঠি মুঠোর মধ্যে চলে এসেছে এখন। বইয়ের

কত অসুবিধে — ঘরে রাখার জায়গা থাকা চাই। পোকায় খেয়ে নিতে পারে — পুরোনো পাতা ঝুর ঝুর করে ঝরে যায়। অথচ ইন্টারনেটের কত সুবিধে — যেটা দরকার যতটা দরকার — ততটাই ডাউনলোড করে জ্ঞানবান হওয়া সম্ভব। এখন অত্যাধুনিক লাইব্রেরিতে বই থাকে না — বোতাম টিপলেই নির্দিষ্ট বইয়ের নির্দিষ্ট পৃষ্ঠাটি কম্প্যুটারের পর্দায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। পুঁথির ত্রুটিগুলো খানিকটা সংশোধন করে পুস্তক এসেছিল।

এখন বইয়ের দুর্বলতাকে কাটিয়ে ই-বুক (ইন্টারনেট বুক) আসছে। পুঁথির মতো এখন সনাতনী বইয়ের বিদায় সমাসন্ন। এ জন্য দুঃখ বা মন খারাপ করার কিছু নেই। তাই বইমেলা উপলক্ষে বই বিক্রির চেয়ে এগরোল বেশি বিক্রি হলে তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় না।

প্রযুক্তির স্বপক্ষে এত কাহন বলার পরেও একটা কথা স্বীকার করতেই হবে — জীবন দিন দিন আবেগবর্জিত যান্ত্রিক হয়ে যাচ্ছে। আগে লোকজন চিঠি-টিঠি লিখত — লেখার অজুহাতে কাব্যি-টাব্যি করত। চিঠি চালাচালি নিয়ে বিশাল পত্রসাহিত্য রয়েছে বিভিন্ন ভাষায়। টেলিফোন প্রযুক্তির আবির্ভাবে পত্রসাহিত্যে বাজ পড়েছে। প্রেমিক-প্রেমিকা টেলিফোনে নিভৃতে কথা বলে নেয়। চিঠিতে যা বলা যায় না — তাও হায়ার মাথা খেয়ে দূরভাষেই বলা সম্ভব। মোবাইল ফোন তো দূরকে শুধু নিকটই করে নি — আরও অন্তরঙ্গ করেছে। বাংলাদেশের রেডিওতে একটা গান শুনেছিলাম অনেকদিন আগে।

চিঠি লিখি খামে
সোনা বন্ধুর নামে
বুক ভিজ্‌জা যায় চোখের জলে
পিঠ ভিজ্‌জা যায় ঘামে।।

দুঃখ, প্রযুক্তির কল্যাণে, এরকম ছবি আর মানসচক্ষেও দেখা যাবে না। সোনাবন্ধুকে আর চিঠি লিখবে না কেউ — তাই চোখের জল এবং ঘামের বর্ণনা অপ্রাসঙ্গিক ও অবান্তর।

কং এবং জিমবাম

খাসি ভাষা আমি জানি না। কিন্তু শিলংয়ে মাঝে মাঝে যাই বলে খাসি ভাষার দুটো শব্দ আমি শিখে নিয়েছি। একটা হল 'কং' অন্যটা হল 'জিমবাম'। 'কং' মানে হল 'দিদি' আর 'জিমবাম'এর অর্থ হল 'চায়ের সঙ্গে খাওয়ার মিষ্টি বা স্ন্যাক্স'। শিলংয়ে অফিস-টফিসগুলোতে দুপুর বেলায় খাসি মেয়েরা কাঁখে টুকরি নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। টুকরিতে থাকে জিমবাম আর তাদের হাতে থাকে চায়ের কেটলি। দোকান বা ক্যান্টিনে গিয়ে চা বিস্কুট খেতে হয় না। সেগুলো অফিসে চেয়ারে বসেই নাগালের মধ্যে পাওয়া যায়।

'কং' এবং 'জিমবাম' শব্দ দুটি আমার খুব পছন্দ হয়ে গেল। নতুন শেখা শব্দ দুটো ব্যবহার করার জন্য আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকলাম। সেদিন মধ্যাহ্নে শিলংয়ের অফিসে বসে থাকতে থাকতে সেই সুযোগ উপস্থিত হল। বেতের ঝুড়িভর্তি সামোসা কচুরি নিয়ে খাসি মেয়েকে দেখে আমি অধীর উৎসাহে প্রথমে বললাম, জিমবাম। মেয়েটি জিজ্ঞাসু চোখে ঘুরে তাকাল আমার দিকে। আমি ঠিক বলেছি কিনা বা কী বলতে কী বলেছি — বুঝতে পারিনি। অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, কং। খাসি মেয়েটি রাগ করতে গিয়েও হেসে ফেলল। আমি আসলে কংয়ের কাছে জিমবাম চাইতে গিয়ে উল্টো করে জিমবামের কাছে কং চেয়েছি। অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী বলে একটা কথা আছে — আমার হয়েছে সেই অবস্থা। হাসিখুশিতে খাসি মেয়েরা অকৃপণ — এরা রেগে গেলেও হাসে। হাস্যময়ী খাসি মেয়ের কাছে আমি সে যাত্রায় অপদস্থ হতে হতে বেঁচে যাই। আগে, এখনও অনেক জায়গায় চা খেতে চাইলে খুঁজে পেতে দোকানে যেতে হয়। কিন্তু ইদানীং দেখা যাচ্ছে, শুধু শিলংয়ে নয় অন্যত্রও, চা যে খাবে তার কাছে চা চলে আসে। চায়ের কাছে কষ্ট করে তাকে আর যেতে হয় না। আগরতলার এখন একটি পরিচিত দৃশ্য হল চায়ের ইয়া বড় ফ্লাস্ক নিয়ে ঘুরে বেড়ায় চায়ের হকার। হাটে-ঘাটে-মাঠে তাদের অবধারিত ঘোরাফেরা। এখন যত্রতত্র যখন তখন চাইলেই চা পাওয়া যায়। আসলে প্রয়োজনটাই হল বড়ো কথা — প্রয়োজন থাকলে তা মেটানোর জন্য যথাযথ ব্যবস্থা হবে বই কি! যেমন, আমি ব্যাঙ্কে আমার টাকা রাখি। রাতবিরেতে আমার টাকার দরকার হতে পারে। আগে দিনের বেলায়, তাও দশটা থেকে দুপুর দুটোর মধ্যে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলতে হত। রাত্রিবেলায় টাকা তোলার কোনও সম্ভাবনাই নেই। কিন্তু এখন বদলে গিয়েছে সবকিছু। এ টি এম থেকে মধ্যরাত্রি

বারোটার সময়ও টাকা তোলা যায়। আমার টাকা আমি তুলব তাতে আবার সময়-গময় কী! আমার প্রয়োজন, আমার টাকা আছে, আমার টাকা চাই, ব্যস। ব্যাঙ্কের সুবিধে অসুবিধে আমার দেখার কথা নয়। আসলে প্রয়োজনই হল আবিষ্কারের জননী। প্রয়োজনে এ টি এম এসেছে। প্রয়োজনে এসেছে ফ্লাস্কে চা এবং সেই চা পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়ায়। চা ঠাণ্ডা হলে চলবে না। চা হতে হবে গরম ধোঁয়া-ওঠা। আসলে আমরা যা চাই, তাই হয়। যন্ত্র বা প্রযুক্তি আমাদের প্রয়োজনে আমাদের কথা শুনে ওঠ-বোস করে।

এই প্রসঙ্গে একটি বহুল প্রচারিত গল্প মনে পড়ছে। গল্পটি হয়তো অনেকের জানা তবু উল্লেখ না করে পারছি না। আসলে যন্ত্র যে আমাদের ক্রীতদাস সেই বিষয়কে ভিত্তি করেই গল্পটি। বিদেশে যত্রতত্র ভেন্ডিং মেশিন রয়েছে। যথাযথ পয়সা দিয়ে বোতাম টিপলেই প্রয়োজনীয় সামগ্রীটি বেরিয়ে আসে। কোথাও কোনও দোকানি নেই — নেই দোকান খোলার নির্দিষ্ট সময়ের বালাই। যন্ত্রই সব করে দিচ্ছে। এহেন দেশে চা বা কফি বানানোর মেশিনের ব্যবস্থা রয়েছে। অনেক চা-পায়ী বাড়িতে সে মেশিন কিনে রেখেছে। যখন তখন চা খাওয়ার ঝঞ্ঝাট-বিহীন ব্যবস্থা। সংসারের অন্য কাউকে বিরক্ত বা বিব্রত করার দরকার নেই। মেশিনটির মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন পাত্র — একটাতে চা পাতা রাখো, একটাতে চিনি রাখো, একটায় জল রাখো। মেশিনটাতে রয়েছে একটা অ্যালার্ম দেয়া ঘড়ি। রাত্রি দেড়টার সময় এক কাপ চা চাইলে, মেশিনটাতে রাত দেড়টায় টাইমকে নির্দিষ্ট করে শুয়ে থাকো। রাত দেড়টার সময় মেশিনে টুং টাং শব্দ হবে, উষ্ণ জলের সঙ্গে চা পাতা আর চিনির মিশ্রণ ঘটবে। তারপরে ধূমায়িত চা প্রস্তুত — মেশিনে অ্যালার্ম বাজতে থাকবে। স্যার উঠুন, চা রেডি।

বিদেশে থাকলেও, ভারতে এ মেশিন এখনও নাকি আসেনি। না এলে কী হবে, এ মেশিনকে হার মানায়, লজ্জায় অধোবদন হবে এ মেশিন — সেই ব্যবস্থা অনাদিকাল থেকে আমাদের দেশে রয়েছে।

রাত দেড়টায় চা চাইলে, মেশিন বলে, স্যার উঠুন। 'চা রেডি'। বিছানা থেকে উঠে মেশিনের কাছে গিয়ে তবে চা খেতে হয়।

কিন্তু আমাদের দেশে মশারি তুলে চায়ের কাপ বাড়িয়ে দেয় ফরমাইসমতো গৃহিণী স্বয়ং। মেশিন আর যাই পারুক, মশারি তুলে চায়ের কাপ বাড়িয়ে দিতে এখনও শেখেনি।

ঢাক-ঢোল পিটিয়ে মেশিনের জয়জয়কার হলেও এই জায়গায় হার মানে আমাদের দর্শনের কাছে পাশ্চাত্যের অহঙ্কার। আর যাই হোক, আমরা সর্বত্র হেরে গিয়েও এখানে হারিনি, এই যা সান্ত্বনা। পাশ্চাত্যের থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়েছে, এতেই আনন্দ।

সরকার মা-বাপ

সরকারকে জনগণের অভিভাবক বলে বিবেচনা করা হয়। জনগণের জন্য কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা মন্দ — সেটা সরকারই বোঝে ভালো — জনগণ বোঝে না। দেশের জনগণও সরকারকে তাই মনে করে। তারা বলে, সরকার মা-বাপ। সন্তানের দুঃখ কষ্ট ভালো মন্দ মা-বাপ জানবে না তো আর জানবে কে? এদেশে সরকারই হল প্রকৃত গার্জেন — সরকার যা বলবে তাই হবে।

সন্তানের আচার-আচরণ কখনও পছন্দ না হলে, সরকার তার সন্ততিদের হাতে মারে বা ভাতে মারে। এরকম মারার অধিকার সরকারের আছেই — বাপ-মা বে-আদ ব সন্তানকে কি শাসন করে না? এতে 'গেল গেল' রব তোলার কারণ নেই।

সরকারের গার্জেনগিরির কিছু নমুনা এখন আলোচনা করা যাক। সন্তানের স্বাস্থ্য বিষয়ে বাপ-মা হিসেবে সরকারের চোখে ঘুম নেই। কী করে জনগণের স্বাস্থ্য নিটুট রাখা যায় — তার জন্য সরকার সতত নির্দেশ উপদেশ জারি করে থাকে। সিগারেট খেলে ক্যান্সার হতে পারে — এটা একটি প্রমাণিত বৈজ্ঞানিক সত্য।

সরকারও তা ভালোই জানে। সরকার তাই সিগারেটের প্যাকেটে লিখে দেয় ঃ বাধ্যতামূলক সতর্কীকরণ ঃ ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

এই সতর্কীকরণের একটাই উদ্দেশ্য, জনগণ যেন সিগারেটের সর্বনাশা নেশায় পতিত না হয় এবং নিজের ফুসফুসটিকে ঝাঁঝরা না বানায়।

উদ্দেশ্য মহৎ, কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু নিট ফলটা কী? সরকারের বংশবদ ধূমপায়ী সন্তানেরা ঐ সতর্কীকরণ পাঠ করে ধূমপান কমিয়েছে এমন সাক্ষীসাবুদ এখনও জোটানো যায়নি। সরকার একদিকে তামাক চাষে উৎসাহ দিচ্ছে, সিগারেট শিল্পকে বাহবা দিচ্ছে — আবার উল্টোদিকে জনগণকে বলছে, ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। সরকার চোরকে বলছে চুরি করো, আর গৃহস্থকে বলছে সজাগ থাকো।

আদর্শ অভিভাবকই বটে সরকার!

এটা গেল জাতীয় স্তরে মা-বাপ সরকারের কাণ্ড। রাজ্যস্তরেও জনগণের আর এক সেট মা-বাপ আছে। গার্জেনগিরিতে কেউ কারোর চেয়ে কম যায় না।

বিগত ২৩ মার্চ ২০০5 রাজ্য বিধানসভায় বিধায়ক অনিমেষ দেববর্মার এক প্রশ্নের উত্তরে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী বাদল চৌধুরী জানিয়েছেন, ফেন্সিডিল ওষুধ থেকে বিক্রয়কর বাবদ গত বছরে মোট ৪ কোটি ৪৮ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা আদায় হয়েছে। প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকা রাজস্ব বৃদ্ধিতে অর্থমন্ত্রী খুশি নিশ্চয়ই — এ টাকাটা রাজ্যের উন্নয়নে লাগবে।

কিন্তু কথা হল, ফেন্সিডিল একটি নিষিদ্ধ ওষুধ। কোনও ডাক্তার ঐ ওষুধটি প্রেসক্রিপশানে লেখেন না। রাজ্যের কোনও ওষুধের দোকানে এ ওষুধ রাখা যাবে না — পাওয়া যাবে না।

যদি তাই হয়, তবে রাজ্যে ফেন্সিডিল এল কোত্থেকে — আর এলই যদি তবে গেল কোথায়? কোথা থেকে আসে আর কোথায় যায় — সবাই সব জানে। এটা মা-বাপ সরকার জানে না বললে "ঘোড়ায় অ হাসব"। সংবাদে আরও প্রকাশ — "এই আমদানিকৃত ওষুধের সিংহভাগই পাচার হচ্ছে বাংলাদেশে। আর একটা অংশ রাজ্যের বেকার যুবক-যুবতিদের সর্বনাশ করছে। একটা জিনিস স্পষ্ট হওয়া উচিত — মা-বাপ সরকার জনগণের অভিভাবক হয়ে কী চান? আরও নিষিদ্ধ ওষুধ ফেন্সিডিল রাজ্যে আসুক — রাজ্যের কর থেকে রাজস্ব বাড়ুক — যুবক- যুবতিদের আরও সর্বনাশ হোক?

বাংলাদেশ-ত্রিপুরার বর্ডার জুড়ে কাঁটাতারের বেড়া দেয়া হচ্ছে।

ত্রিপুরার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার খুশি। তাতে অবৈধ যাতায়াত কমবে — কমবে পাচার বাণিজ্য। তাঁর মতে, যত তাড়াতাড়ি কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ হয়ে যায় ততই মঙ্গল।

উল্টোদিকে অর্থমন্ত্রী বাদল চৌধুরীর মন খারাপ — তাঁর কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়তে শুরু করেছে। কাঁটাতারের ফলে ফেন্সিডিলের পাচার বন্ধ — তাই বিক্রয়কর বাবদ সাড়ে চার কোটি টাকার জলাঞ্জলি। ঐ টাকা দিয়ে গরিব ত্রিপুরার উন্নয়নে কত কিছু করা যেত।

সম্ভবত অর্থমন্ত্রীর বিবেচনায় কাঁটাতার যত দেরিতে হয় ততই ভালো — আর একেবারে না হলে খুবই মঙ্গল। মাঝে-মাঝে পত্রিকায় ছাপা হয় — কাঁটাতারের বেড়ার নাট্-বল্টু-তার চুরি হয়ে যাচ্ছে। দুপাশে মই লাগিয়ে কাঁটাতার টপকে পাচার বাণিজ্য এখনও অবাধ।

এসব সংবাদ পাঠ করে মুখ্যমন্ত্রীর মন খারাপ হলেও অন্য অভিভাবক অর্থমন্ত্রীর মন ভালো। এই অভিভাবকদের যুগলবন্দীতে সন্তানবৎ জনগণের অবস্থা বড়ই করুণ।

অভিভাবক এবং জনগণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হিসেবে সরকার যদি সত্য-সত্যই মনে করে যে সিগারেট খারাপ এবং ফেন্সিডিল স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক, তার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে টিভিতে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়ার দরকারটা কোথায়? মূল ফ্যাক্টরিতে এদের উৎপাদন বন্ধ করার নির্দেশ দিলেই তো হয়।

সরকার একটি আইন জারি করুক — সিগারেট এবং অন্যান্য নিষিদ্ধ ওষুধ প্রস্তুত

করা যাবে না। ব্যস্, তাহলেই তো ল্যাটা চুকে যায়। রবীন্দ্রনাথের 'জুতা আবিষ্কার'-এ বলা আছে —

'আপন দুটি চরণ ঢাকো তবে,
ধরণীটারে ঢাকিতে নাহি হবে।'

কাঁটাতারের বেড়া বানিয়ে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। আর তাছাড়া এখন সারা পৃথিবী থেকে প্রাচীর বা বেড়া উঠে যাচ্ছে। দুই জার্মান প্রাচীর ভেঙে এক হয়ে গেল।

ইউরোপের রাষ্ট্রগুলো একছত্রতলে এসেছে — ওখানে এখন আর সীমান্ত বলে কিছু নেই। সারা পৃথিবী এক দিকে যাচ্ছে, আর ভারত ঘড়ির কাঁটাকে পেছনের দিকে ফিরিয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে বিভেদের প্রাচীর তুলছে। সংবাদে প্রকাশ, ত্রিপুরা-বাংলাদেশের সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া বানানোর জন্য প্রতি কিলোমিটারে ব্যয় হচ্ছে এক কোটি টাকা।

এটা তো সরকারি হিসেব। কাঁটাতারের বেড়া বানাতে হয় সীমান্ত-রেখা থেকে দেড়শ মিটার ভেতরে। ফলে ত্রিপুরার একটি বিরাট উর্বর ভূখণ্ড বেড়ার বাইরে চলে যাচ্ছে — যার আর্থিক মূল্যায়ন অসম্ভব। এগুলো সবই হচ্ছে — কেননা অভিভাবক সরকার তা চান। জনগণ চায় কি না — এটা কোনও সমীক্ষা বা অনুসন্ধান করে দেখা হয়নি। তাছাড়া কাঁটাতারের বেড়ার বদলে বিকল্প কিছু করে উর্বর ভূখণ্ডটিকে বাঁচিয়ে কিছু করা যেত কি না — তাও চিন্তা করা হয়নি।

সদিচ্ছা থাকলে উপায়ের অভাব হয় না। কিন্তু সরকার তার সন্তানদের ভালো করবে বলে যেখানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সেখানে কে কী করতে পারে। সরকার মা-বাপ বলে কথা! জনগণ নির্বোধ, কিচ্ছু বোঝে না।

মানুষের মুখ

বাচ্চা ছেলেটি বাপকে বিরক্ত করছে অনেকক্ষণ ধরে। বাপ ছেলেকে সময় দিচ্ছে না — নিজের কাজে ব্যস্ত। ছেলে বলল, বাবা, কালকের হোম টাস্ক শেষ। এখন কী করব? অন্যমনস্ক হয়ে বাপ বলল, এবার তা হলে ওয়ার্ক এডুকেশানটা করে ফেলো। বলল, ওয়ার্ক এডুকেশানও হয়ে গেছে। এখন কী করব?

বিরক্ত হয়ে বাপ একটা কাণ্ড করল তখন। সামনে ছিল পৃথিবীর মানচিত্র। মানচিত্রটা কুচি কুচি করে ছিঁড়ল। টুকরো টুকরো কাগজগুলো ছেলের হাতে তুলে দিয়ে বাপ বলল, নে, বসে বসে এগুলো জোড়া দিয়ে পুরো পৃথিবীটা আবার বানিয়ে ফেল।

ছেলেকে আচ্ছা জব্দ করা যাবে ভেবে বাপ নিজের কাজে মন দিল। এবার অনেক সময় পাওয়া যাবে। ছেলে আপাতত আর ঘ্যানঘ্যান করে বলবে না, বাবা, এখন কী করব?

কিছুক্ষণের মধ্যেই ছোট্ট ছেলেটি কাগজের টুকরোগুলোকে জোড়া লাগিয়ে পুরো পৃথিবীর মানচিত্রটি বানিয়ে বাপের হাতে তুলে দিয়ে বলল, এই নাও বাবা। বলো, এবার কী করব?

বাপের আশ্চর্যের আর সীমা রইল না। এই অল্প সময়ের মধ্যে এইটুকুন একটা ছেলে কী করে এত বড়ো কাণ্ডটা করল! অবাক হয়ে বাপ জিজ্ঞেস করল, ব্যাটা তুই এই কঠিন কাজটা এত সহজে এত কম সময়ে করলি কীভাবে?

ছেলে হেসে বলল এটা এমন কঠিন আর কী? মানচিত্রটার উল্টো পিঠে একটা মানুষের মুখ ছিল — তুমি দেখনি? আমি কী করলাম — মানুষের মুখটাকে সাজিয়ে ফেললাম কাগজের ছেঁড়া টুকরোগুলোকে পাশাপাশি সাজিয়ে। ব্যস্, হয়ে গেল আমার কাজ। মানুষটার মুখ যখন এক পিঠে সম্পূর্ণ হল, অন্যপিঠে সম্পূর্ণ হয়ে গেল পৃথিবীর মানচিত্র।

কোনও সন্দেহ নেই — এটি একটি গল্প। তবে গল্পটির মধ্যে একটি বার্তা অন্তর্নিহিত আছে — যা খুব গভীর। মানুষের মুখটি খুঁজে পেলে পৃথিবীর মুখটিও উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। অনেকে হয়তো বলবেন — পৃথিবীর মুখ, সেটা আবার কী জিনিস! কবি জীবনানন্দ দাশের বিখ্যাত কবিতার একটি লাইন এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে — 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি ...।' কবিরা দূরদর্শী এবং অন্তর্যামী। তাঁরা একটা মাটির ঢেলায় দেশেরও মুখ দেখতে

পান। আমরা সাধারণ মানুষ তা পাই না — আমাদের দৃষ্টি সংসারের চৌহদ্দির বাইরে যায় না।

গত এক দশক ধরে অবশ্য অর্থনীতিতে 'মানুষের মুখ' বা মানবিক মুখ (হিউম্যান ফেস)-এর কথা বারেবারে চর্চিত হচ্ছে। যেমন, আমাদের দেশের যে প্ল্যানিং হচ্ছে — বলা হচ্ছে তার একটা হিউম্যান ফেস্ থাকতে হবে। শুধুমাত্র উন্নয়নের জন্য উন্নয়ন — আমাদের চাই না। দেশের উন্নতি হল অথচ মানুষের উন্নতি হল না — সে উন্নয়ন, কোনও উন্নয়নই নয়। এটা বোঝা দরকার — একটা অঞ্চলের উন্নয়ন আর সেখানকার জনগণের উন্নয়ন — এক কথা নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ডম্বুরে গোমতীর উৎসমুখে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ফলে সেখানকার সন্নিহিত অঞ্চলের উন্নতি হয়েছে। সেখানে রাস্তাঘাট হয়েছে, বিল্ডিং অট্টালিকা হয়েছে — রাস্তার পাশে বসেছে বিজলির খুঁটি, যেখানে বিদ্যুতের আলো জ্বলে সারারাত। কিন্তু বাস্তব চিত্রটা হল, সেখানকার যারা স্থানীয় অধিবাসী তাদেরকে এই চোখ ধাঁধানো উন্নতি পাশ কাটিয়ে গিয়েছে। এবং ঘটনাটি ঘটেছে উল্টো। রাইমা-সরমার উপত্যকায় জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের ফলে সমস্ত উপত্যকাটি জলনিমগ্ন হয়ে যায়। ফলে সেখানকার অধিবাসীরা বাস্তুচ্যুত হয়ে আজ ছিন্নমূল। সেদিনকার প্ল্যানিংয়ে কোনও 'মানবিক মুখ' ছিল না বলেই আজকের এই অবস্থা।

উন্নয়নের ছকে 'মানবিক মুখ' খুঁজে বের করা খুব একটা সহজ কাজ নয়। নৃপেন চক্রবর্তী তখন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রবর্তিত বনাঞ্চল আইন অনুসারে রাজ্যের অভ্যন্তরে সংরক্ষিত বনের ভেতরে রাস্তাঘাট বাড়ি বানানোর জন্য বন বিভাগের সম্মতি নেয়া বাধ্যতামূলক। উদ্দেশ্য মহৎ — বনাঞ্চলকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা মানে পরিবেশ সংরক্ষণ। বস্তুত ত্রিপুরার দুই-তৃতীয়াংশ হল বন। নৃপেনবাবু একদিন মুখ্য বন সংরক্ষককে ডাকলেন। ডেকে উষ্মা প্রকাশ করে বললেন, 'আপনি নাকি বনের ভেতর পি ডব্লিউ ডি-র রাস্তা বানানোর কাজে বাধা দিচ্ছেন।'

'স্যার, সেন্ট্রাল অ্যাক্ট বলছে .....' আমতা আমতা করে বললেন তিনি। 'চুপ করুন।' গুস্সায় ফেটে পড়লেন নৃপেনবাবু — 'আপনি ভেবেছেনটা কী? আমি ত্রিপুরার এক-তৃতীয়াংশের মুখ্যমন্ত্রী আর আপনি দুই তৃতীয়াংশের মুখ্যমন্ত্রী — তাই? আপনার সেন্ট্রাল অ্যাক্ট বলছে, বন বাঁচান। ঠিক আছে — তাতে বন হয়তো বাঁচল, কিন্তু আমার যে মানুষ বাঁচল না। এটা কী ধরনের অ্যাক্ট? আইনের মধ্যে হিউম্যান ফেস্টা কোথায় — আমাকে বলুন।'

লেখাটির শুরুতে ছেলেটি মানুষের মুখটিকে খুঁজে পৃথিবীর মুখটিকে আবিষ্কার করেছিল। এটা গল্পে সম্ভব — বাস্তবে কঠিন। বরং উল্টোভাবে পৃথিবীর মানচিত্রটিকে সাজিয়ে মানুষের মুখটিকে খুঁজে পাওয়া অধিক সহজ। পৃথিবীর ভৌগোলিক মানচিত্রটিকে সুবিধেমতো বদলে

টদলে সহজ সরল করলেই হয়। সেটা মোটেই একটা কঠিন কাজ নয়। সাম্প্রতিককালের ঘটনাগুলোর প্রতি লক্ষ করলেই বোঝা যায়, পৃথিবীর আঁকাবাঁকা সীমান্তের রেখাগুলো ক্রমশ টানা সিধে হচ্ছে। দুই বার্লিন মিলে গিয়েছে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পৃথিবীর ভূগোল প্রতিদিন বদলে যাচ্ছে। একসময় ইতিহাস পৃথিবীর ভূগোল ঠিক করত। এখন সেদিনের ভূগোল নিজেই আজ ইতিহাস হয়ে গিয়েছে। প্রযুক্তির বিজয়রথ যেভাবে ধেয়ে আসছে তাতে মনে হয়, পৃথিবীর পৃথক কোনও ভৌগোলিক মানচিত্র থাকবে না — মানুষের মুখই হবে ভৌগোলিক পৃথিবীর মুখ।

ম্যাঁয় তো গরিব হুঁ না

দারিদ্র্য বলতে এতকাল আমরা বুঝতাম টাকা পয়সার অভাব। কেউ দরিদ্র মানে তার টাকাপয়সা বা সম্পদ নেই। সম্পদ মানে জমিজমা স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি। কারোর টাকা থাকলে, সে টাকার বিনিময়ে ঐ সব সম্পত্তি কিনে নিতে পারে। আবার সম্পত্তি বা সম্পদ থাকলে, তা বিক্রি করে সে অর্থবান হতে পারে। সরল কথায়, দারিদ্র্য মানে অর্থহীনতা। কিন্তু এখন দারিদ্র্যের সংজ্ঞা বদলেছে। দারিদ্র্য শব্দটি ইদানীং আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন, স্বাস্থ্যের দারিদ্র্য, শিক্ষার দারিদ্র্য ইত্যাদি। এমন হতে পারে একজনের অনেক টাকা আছে কিন্তু সে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী নয়। অসুখে বিসুখে বিছানায় শয্যাশায়ী। টাকা আছে কিন্তু শরীরে সুখ নেই — অসুখ তার নিত্যসঙ্গী। আবার সংসারে এমন লোকেরও অভাব নেই যার টাকা আছে, স্বাস্থ্যও আছে — কিন্তু শিক্ষা নেই। অঙ্গ লিখতে বঙ্গ ফাটে। নিজে লিখতে পারে না চিঠি — পড়তে পারে না খবরের কাগজও। শিক্ষার অভাবও এক ধরনের দারিদ্র্য। খানিকটা গুছিয়ে বললে বিষয়টি এরকম দাঁড়ায় যে — সর্বাঙ্গসুন্দর জীবনযাপনের পক্ষে যা ন্যূনতম প্রয়োজন তার যে কোনও একটির বা একাধিকের অভাব বা অনুপস্থিতিই হল দারিদ্র্য। পানীয় জলের অভাব হলে বলা যেতে পারে জলের দারিদ্র্য। বাতাস যদি নির্মল না হয়, শ্বাসপ্রশ্বাসের

অযোগ্য হয় — তবে বলতে হয় বাতাসের দারিদ্র্য। এভাবে চিন্তা করলে দারিদ্র্যের লিস্টিটি অন্তহীন। তবে সুখের কথা হল এই — কিছু কিছু দারিদ্র্যের পরিমাণ এবং ব্যাধি কমছে। শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের দারিদ্র্যের কথাই ধরা যাক। এই দুটি দারিদ্র্যই বিগত কয়েক দশকে হ্রাস পেয়েছে। এক সময় ভারতের সাক্ষরতার হার ছিল মাত্র কুড়ি শতাংশ — তা বেড়ে এখন সত্তর শতাংশ ছুঁই ছুঁই। কেরালা এবং মিজোরামে শিক্ষার তথাকথিত দারিদ্র্য নেইই বলা যায়। এক্ষেত্রে একটি মন্তব্য সংযোজন করা দরকার — শিক্ষার মাপকাঠিটি খানিকটা উঁচুতে তুললে (ধরা যাক মাধ্যমিক পাশ) তখন দেখা যাবে ভারতের মাত্র দশ শতাংশ লোকই শিক্ষার দারিদ্র্য থেকে অব্যাহতি পেয়েছে। মাপকাঠিটি আরও একটু উঁচু হলে, (যেমন — স্নাতক) দেখা যাবে ভারত শিক্ষার দারিদ্র্যে ডুবে আছে। বস্তুত শিক্ষার দারিদ্র্যকে শুধুমাত্র সাক্ষরতার মাপকাঠিতে মাপার কোনও অর্থই হয় না। আশা করা যায়, আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই আমরা শতকরা শতভাগ সাক্ষরতার স্তরে উত্তীর্ণ হতে পারব। জাপানও শতকরা শতভাগ সাক্ষর। ভারতও শতকরা শতভাগ সাক্ষর। সুতরাং জাপান ও ভারত শিক্ষার দারিদ্র্য থেকে মুক্ত — অতএব জাপান ও ভারত সমান উন্নত! এ যুক্তি — যুক্তিই নয়, একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। স্বাস্থ্যের দারিদ্র্যের ক্ষেত্রেও আমাদের সাফল্য এসেছে। আগে এক সময় একজন ভারতীয়ের গড় আয়ুষ্কাল ছিল পঁচিশ বছরের মতো। এখন ষাট সত্তর বছর হয়ে যায় — লোকজন দিব্যি গায়ে ফুঁ দিয়ে বেঁচে থাকে। লোক কম মরে আজকাল। মৃত্যুর কারণগুলোও কমতে কমতে মাত্র দু তিনটেতে এসে ঠেকেছে। ক্যান্সার এবং হার্টের অসুখ ছাড়া লোকে অন্য কোনও অসুখে খুব বেশি মারা যায় না। আগে রক্ত আমাশয় হলেই মৃত্যু অনিবার্য ছিল। লোকে তখন সভয়ে বলত — উদরি ভাদুরি যক্ষ্মা — তিনে নাই রক্ষা। এখন টিবি ধরা পড়লে ওষুধপত্র খেলে স্বাস্থ্য আরও ভালো হয়ে যায়। ক্যান্সার এবং হার্টের অসুখকেও কাবু করে এনেছে মানুষ। আশা করা হচ্ছে — ঐ দুটি কালান্তক ব্যাধিও এক সময় নিরাময়যোগ্য হবে। ইতিমধ্যে এইডস এর ভয়াবহতার কথা বলা হচ্ছে — গবেষণা চলছে অবিরাম। অতীতের সাফল্য যদি কোনও নিদর্শন হয় — তবে স্বাস্থ্যের দারিদ্র্যের বিদায়ও সমাসন্ন। অনেকেই হয়তো মানবেন না — তবে একথা সত্যি যে দারিদ্র্য হু হু করে কমছে। শিক্ষার দারিদ্র্য কমেছে, স্বাস্থ্যের দারিদ্র্য কমেছে — কমেছে আর্থিক দারিদ্র্যও। দারিদ্র্য সম্পর্কে রাজনীতিবিদদের মতামত খুবই অ-নির্ভরযোগ্য। যারা ক্ষমতায় আসীন — তারা দাবি করেন, দারিদ্র্য তারা কমিয়ে ফেলেছেন। আর বিরোধীরা বলেন, দারিদ্র্য কমেনি বরং বেড়েছে। আবার এই বিরোধীরাই ক্ষমতাসীন হয়ে দাবি করেন — তাদের রাজত্বে অনাহারে কেউ মরেনি — মরেছে 'হার্ট ফেল' করে। এ কথা কে না জানে, অভাব অনটনের কারণেই হোক অথবা দুরারোগ্য ব্যাধিতে হোক কারোর মৃত্যু হলে হৃদপিণ্ডের ধুকপুকানি স্তব্ধ হয়ে যায় — ডাক্তারি ভাষায় যাকে বলে হার্ট ফেল।

তাই শাসকগোষ্ঠী এবং বিরোধীপক্ষ রাজনীতিবিদদের বক্তব্য গণ্য না করাই সমীচীন — কেননা বক্তব্য এবং পাল্টা বক্তব্যে কাটাকাটি হয়ে যায়। জল এবং বাতাসের দারিদ্র্য একাধারে বাড়ছে মনে হয় বটে — আবার সবাইয়ের সচেতনতার ফলে কমছেও। মূল কথা, দারিদ্র্য মানুষের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তোলে। আর যাই হোক তাই হোক — মানুষ বোকা নয়। নিজের অস্তিত্বের প্রশ্নে দারিদ্র্যকে রুখবেই মানুষ যে কোনও মূল্যে। এ প্রসঙ্গে একটা নির্মল গল্প বলা যাক। কলকাতা থেকে দিল্লি যাচ্ছে একটি দ্রুতগামী ট্রেন। প্রতিবেশি একটি প্রদেশে ট্রেনটি ঢুকতেই রিজার্ভ কম্পার্টমেন্টে উঠেছে একরাশ বিনা টিকেটের যাত্রী। তাদের মধ্যে একজন সিটে আয়েস করে বসেছে অন্য দূরপাল্লার যাত্রীদের অসুবিধা করে। এক সময় দেখা গেল, যাত্রীটি থুক থুক করে থুতু ফেলছে ট্রেনের মেঝেয়। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেলে দূরপাল্লার একজন যাত্রী না বলে আর পারলেন না — হচ্ছেটা কী ভাই। টিকিট ছাড়া উঠেছ — জোর করে সিটে বসেছ। সবই মানা গেল। কিন্তু থুতুটা জানালা দিয়ে অন্তত বাইরে ফেলতে পার না? লোকটি উদাসীনভাবে বলল — ম্যাঁয় তো গরিব হুঁ না। 'আমি তো গরিব' অর্থাৎ গরিব এবং দরিদ্র হলে মেঝেতে থুতু ফেলা যায়। এটা চলে। এতে কোনও দোষ নেই। হলেও তা মাপ। অনেক কিসিমের দারিদ্র্যের কথা বলা হয়েছে এবং সেইসব দারিদ্র্য একদিন থাকবে না আর বলে মনে হয়। তবে 'ম্যাঁয় তো গরিব হুঁ না'— এ দারিদ্র্য কোনওদিন শেষ হবে — একথা জোর দিয়ে বলা যায় না।

উৎকর্ষের কোনও বিকল্প নেই

অরুণাচল প্রদেশের মাননীয় রাজ্যপালের প্রতিনিধি হিসেবে অরুণাচল বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অ্যাকাডেমিক মিটিংয়ে গিয়েছিলাম। গৌহাটি থেকে হেলিকপ্টার পবনহংস সার্ভিসে ইটানগর যাবার কথা ছিল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন বৃষ্টিবাদলার দিন বলে পবনহংসে যাওয়া হয়নি। ট্যাক্সিতে একাকী প্রায় পাঁচশ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হয়েছে আমাকে। ইটানগর গৌহাটি যাওয়া-আসা এক হাজার কিলোমিটার প্রায়।

ইটানগরের আগে হল নাহারলুগান — তার আগে নির্জুলি। নির্জুলিতে দয়মুখ নদী পেরিয়ে আরও প্রায় পনেরো কিলোমিটার পাহাড়ি পথ পার হয়ে রনো হিলসের শীর্ষে খানিকটা সমতল ভূখণ্ডে অরুণাচল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস। পাহাড়ি পথ বিপদসংকুল রাস্তাঘাট যোগাযোগ নির্ভরযোগ্য নয়। তবে শঙ্কা আশঙ্কার বেড়াজাল ডিঙিয়ে একবার পাহাড়ের শিখরে পৌঁছুতে পারলে আর ভয় নেই — মন প্রশান্তিতে ভরে যায়। ক্যাম্পাসটি পড়াশুনো বা তপস্যার জন্য আদর্শ জায়গা — একথা মানতেই হবে। কিন্তু জীবন শুধু পড়াশুনোই নয় — তার চেয়েও অধিক কিছু। তাই মনে হল, বিশ্ববিদ্যালয়টির উন্নয়ন কাঙ্ক্ষিত স্তরে পৌঁছোয়নি — যোগাযোগের দুরূহতাই এর কারণ।

বিশ্ববিদ্যালয়টির অনেক ডিপার্টমেন্টেই যথেষ্ট সংখ্যক অধ্যাপক নেই। অনেক পদ খালি। কেউ কেউ এসে জয়েন করেন বটে, তারপর সুযোগ পেলেই চলে যান। ছাত্রদের বেলায়ও একই ব্যাপার। অন্যত্র সুযোগ থাকলে এখানে পড়তে আসে না। আসলে জনপদ থেকে দূরে পাহাড়ের মাথায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে বিশ্ববিদ্যালয়টির অবস্থানই এসবের জন্য দায়ী।

যোগাযোগ স্বল্পতা বা প্রায় বিচ্ছিন্নতা যে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিকাশের পক্ষে শক্ত অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ তার একটি হাতের কাছের উদাহরণ। শহর থেকে দূরে, হাইওয়ের থেকে অনেক অভ্যন্তরে পাণ্ডববর্জিত এলাকায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজটি। তার ফলে উন্নয়নের বাধাস্বরূপ প্রায় সব কারণগুলো এখানে উপস্থিত। যথেষ্ট অধ্যাপক নেই — অনেক পোস্ট খালি। জয়েন্ট এন্ট্রান্স দিয়ে ভালো ছাত্রছাত্রীরা রাজ্যের বাইরে পড়ার সুযোগ পেলে এখানে পড়তে আগ্রহী নয়। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজটিতে যারা

পড়াচ্ছেন এবং যারা পড়ছে — উন্নতর সুযোগ পেলে সম্ভবত আর পেছন ফিরে তাকাবে না। এটাই স্বাভাবিক — এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

একটা প্রশ্ন, শুধুমাত্র যোগাযোগ স্বল্পতাই কি দায়ী এর জন্য? রাজস্থানের পিলানিতে একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আছে — যোগাযোগের বাহুল্যের জন্য কলেজটি নিশ্চয়ই গর্ব করতে পারে না। তবু পিলানিতে পড়তে সুযোগ পাওয়া যে কোনও ছাত্রের কাছে স্বপ্ন পূরণের মতো। রাজ্যের জয়েন্ট এন্ট্রান্সে ফার্স্ট হওয়া ছাত্র যে কিনা বোর্ডেও প্রথম হয়েছে, সে সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং বা মেডিকেল কলেজে কম খরচে ভর্তি হবার সুযোগকে হেলা ভরে ঠেলে রেখে এক কাঁড়ি টাকাপয়সা দিয়ে পিলানিতে গিয়ে ভর্তি হয়। কেন এমন সিদ্ধান্ত? স্বল্প খরচে যেখানে ডিগ্রি পাওয়া যায় সরকারি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি বা অন্য কলেজ থেকে, সেখানে অপ্রতুল যোগাযোগ ব্যবস্থা, বাড়ি থেকে বহুদূর, রাজস্থানের মরুভূমির অকরুণ তপ্ত পরিমণ্ডলে পিলানিতে পড়তে যাওয়ার সিদ্ধান্তকে কেন অগ্রাধিকার দেয়া হয়? এর সহজ উত্তর হল — পিলানিতে পঠনপাঠন অন্যান্য শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান থেকে গুণগতমানে অত্যধিক উৎকৃষ্ট। শিক্ষামানের উৎকর্ষের কথা মুখে বললেই বা দাবি করলেই চলে না — চাকুরি এবং জীবিকা নির্বাচনের বাজারে প্রতিফলিত হতে হয় — নইলে না। কে না জানে, পিলানি থেকে পাশ করলে বা পাশ করার আগেই চাকুরি নিশ্চিত — লোভনীয় মাইনে। পিলানিতে ভর্তি হবার জন্য অর্থ বিনিয়োগের যৌক্তিকতা এখানেই।

মোদ্দা কথাটা দাঁড়াল এই যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি পাহাড়ের মাথায় নাকি জঙ্গলের গভীরে, নাকি মরুভূমির মধ্যে — তার ওপর ছাত্র ভর্তি বা তাদের ভবিষ্যত নির্ভর করে না। পড়াশোনার শেষে অধীত বিদ্যার দৌলতে বাজারের প্রতিযোগিতায় নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে আখেরে পারে কিনা ছাত্রটি সেটাই শেষ কথা। যদি পারে, তবে ছাত্রের সুনাম — অধ্যাপনার সুখ্যাতি এবং সর্বোপরি সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে পড়তে পারার সুযোগ পাওয়া, ছাত্রদের কাছে সর্বকালীন একটা স্বপ্ন।

অবস্থানের দিক থেকে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় যেকোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ঈর্ষার কারণ। ন্যাশনাল হাইওয়ের পাশে মিনিটে মিনিটে গাড়ি। এর চেয়ে উত্তম যোগাযোগ ব্যবস্থা আর কী হতে পারে? বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে বিশাল অট্টালিকা। এত সুযোগ সুবিধে থাকা সত্ত্বেও এখানে ছাত্র ভর্তির জন্য চাহিদা নেই বা নেই তেমন উৎকণ্ঠা। এখন হল কম্প্যুটার এবং টেকনোলজির যুগ। ছাত্রছাত্রীরা যেখানে কম্প্যুটার /টেকনোলজি পড়ার জন্য হন্যে হয়ে মরছে সেখানে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এস সি (ইনফরমেশান টেকনোলজি) তে ছাত্রসংখ্যা সাকুল্যে দুই জন। মাস্টার্স ইন কম্প্যুটার অ্যাপ্লিকেশান (এম সি এ) তে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা আঙুলের কড়ে গোনা যায়। একদিকে এত সুযোগ তবু কেউ পড়তে আসে না — আবার অন্যদিকে এত

প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও সেখানে পড়ার জন্য তীব্র প্রতিযোগিতা। এমন কেন?

এমন কেউ কেউ ডাক্তার আছেন যাঁরা দিনরাত রোগী দেখেও কুলিয়ে উঠতে পারেন না। মধ্যরাত্রি দেড়টা-দুটো পর্যন্ত রোগী দেখেন তাঁরা — এমনই রমরমা প্র্যাকটিস তাঁদের। অথচ এই শহরেই এমন অনেক ডাক্তার আছেন — যাঁরা বসে বসে মক্ষিকা তাড়ান। কেন এমন হয়?

হুমায়ুন আহমেদ

হুমায়ুন আহমেদ বর্তমান বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় সাহিত্যিক। তাঁর জনপ্রিয়তা এখন এক সর্বকালীন রেকর্ড — বাংলা সাহিত্যের জগতে হুমায়ুন আহমেদ নিজেই কিংবদন্তী পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছেন। তিনি মূলত ঔপন্যাসিক এবং গল্পকার। তিনি সংগীত রচনা করেন, সুর দেন — তিনি চলচ্চিত্র পরিচালনাও করে থাকেন।

তাঁর এক একটি গ্রন্থের যে কত সংস্করণ বের হয় — তিনি নিজেও জানেন না। ঢাকার বইমেলায় তাঁর নূতন একটি উপন্যাসের সকালে প্রথম সংস্করণ বের হয় তো বিকেলে বের হয় দ্বিতীয় সংস্করণ। বইমেলা রাত্রি নটায় বন্ধ হয়ে গেলে স্টলগুলোর আলো কর্তৃপক্ষ নিভিয়ে-দেয়। হুমায়ুন আহমেদের মন্ত্রমুগ্ধ পাঠক-পাঠিকারা মোমবাতি জ্বালিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকে তাঁর অটোগ্রাফ নেবে বলে। তাঁর জনপ্রিয় একই উপন্যাসের তিনটি কপি দুই মেয়ে এবং মা আলাদা করে প্রত্যেকের জন্য কেনে একই পরিবারে। কেউই কারোর কপি অন্যকে দিতে চায় না — চায় না হাতছাড়া করতে।

কিছুদিন আগে বাংলাদেশের টি ভি-তে হুমায়ুন আহমেদের একটি গল্পের চলচ্চিত্ররূপ সিরিয়াল হিসেবে দেখানো হচ্ছিল। চিত্রটি পরিচালনা করছিলেন হুমায়ুন আহমেদ স্বয়ং। সিরিয়ালটি বাংলাদেশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা দেখতে দেখতে মুগ্ধ এবং বিবশ হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ গল্পে একটি মোচড় এল — দেখা গেল, ধারাবাহিক চিত্রটির একটি মুখ্য চরিত্রের ফাঁসি

হবে। ব্যস, তাতে সমগ্র পাঠককুল বেদনায় উত্তাল হয়ে উঠল। হাজার হাজার স্ত্রী-পুরুষ হুমায়ুন আহমেদের ঢাকার বাসস্থান ঘেরাও করে বসে রইল। শান্তি বিঘ্নিত হবে বলে পুলিশ সতর্ক হয়ে আগে থেকে লেখকের নিরাপত্তার ভার হাতে নিল। হুমায়ুন আহমেদ এক বিবৃতিতে জানালেন, জীবনে এরকম ঘটনা ঘটে। কিন্তু না, প্রিয় চরিত্রের মৃত্যু মেনে নিতে পাঠককুল রাজি নয়।

হুমায়ুন আহমেদ স্বয়ং এক প্রবাদপুরুষ। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেমিস্ট্রির অধ্যাপক ছিলেন। পূর্ণ সময়ের জন্য লেখালেখির সুবাদে অধ্যাপনার চাকরিটি ছেড়ে দিয়েছেন। বই লিখে তাঁর কত আয় — তা অনুমান করা শক্ত। সম্প্রতি হুমায়ুন আহমেদ তাঁর বই থেকে প্রাপ্ত রয়্যালিটির একটি ভগ্নাংশ দিয়ে চট্টগ্রামের কক্সবাজারের কাছে একটা দ্বীপ কিনেছেন। একজন লেখক লেখালেখির আয় থেকে একটা আস্ত দ্বীপ কিনতে পারেন — একথা শুনলে আমাদের দেশের অনেক নামিদামি কবি-লেখক অজ্ঞান হয়ে যাবেন। কিন্তু এটা অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি। হুমায়ুন আহমেদের লেখায় জাদু আছে — তিনি তাঁর লেখনীর ছোঁয়ায় পাঠককে একেবারে বশীভূত করে ফেলেন। তাঁর যে কোনও লেখা একবার পড়া শুরু করলে এক্কেবারে শেষ না করে ওঠা যায় না।

এই কিংবদন্তীর নায়ক হুমায়ুন আহমেদ সস্ত্রীক একবার বইমেলার সময় আগরতলায় এসেছিলেন। সাকুল্যে তিনদিন তিনরাত আমাদের সঙ্গে বেড়িয়ে গল্প গুজব করে আবার ঢাকায় ফিরে গেলেন। যদিও এই প্রথমবার তিনি আগরতলায় এসেছেন, তবু তাঁর মুক্তিযুদ্ধের ওপর লেখা সুবৃহৎ উপন্যাসে আগরতলার অনুপুঙ্খ বর্ণনা রয়েছে। আগরতলা এবং তার শহরতলির, মেলাঘরের মুক্তিযুদ্ধের সময়কার মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পের স্থানগুলো গভীর মমতাভরে দেখলেন। মিলিয়ে নিলেন তাঁর কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের প্রেক্ষাভূমিকে।

ব্যক্তিগত জীবনযাপনে হুমায়ুন আহমেদ একজন আউল-বাউল টাইপের লোক — বয়স তাঁর এখনও ষাটের কোঠা ডিঙোয়নি। তাঁর প্রায় অনেক লেখাতে তাঁর নিজের মতই একাধিক আউলা-বাউলা চরিত্র থাকে। সহজ সরল — তীক্ষ্ণ মারপ্যাঁচ সংসারের জটিলতার ঊর্ধ্বে তারা। এর আগের বছরে কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'শারদীয় দেশ' পত্রিকায় হুমায়ুন আহমেদের 'সেদিন চৈত্র মাস' প্রকাশিত হয়েছে। জয়নাল আবেদিন বলে এক প্রৌঢ় চরিত্র আছে এতে। জয়নাল আবেদিনের ইংরেজি ডিকশোনারি পুরোটা মুখস্থ। ডিকশনারি মুখস্থ করতে গিয়ে তাঁর অন্যসব স্মৃতি নষ্ট হয়ে গিয়েছে — সংসারে তিনি একজন বিফল স্বামী এবং পিতা। 'সেদিন চৈত্র মাস' একটি মাফিয়াকে নিয়ে লেখা উপন্যাস। বাংলাদেশে এরকম লেখা আগে কখনও লেখা হয়নি। উপন্যাসটির একটি মূল চরিত্র হল মবিনুর রহমান — তিনি ধনবান। তিনি কোটিপতিরও কোটিপতি — এত তাঁর ধন-সম্পদ। মজার ব্যাপার হল, এত বড়লোক হলে কী হবে, তিনি নিজে রান্না

করতে জানেন। চিংড়ি মাছ-বিষয়ক তাঁর রান্নার ফর্মুলা হল —

ইচা/কাটতে মিছা/ধুইতে নাই
খাইতে গেলে আবার পাই।

ফরমুলাটির নির্গলিতার্থ হল — (মবিনুর রহমানের ভাষায়) ইচা হল চিংড়ি মাছ। কাটতে মিছা মানে কাটা অনর্থক। ধুইতে নাই মানে ধোয়ার সময় মাছ খুঁজেই পাওয়া যাবে না। আবার খেতে গেলে পাওয়া যাবে। এরকম মুচমুচে লেখা পেলে শেষ না করে উঠলে পাঠকের ইহকাল-পরকাল ঝরঝরে হওয়ার হাত থেকে কে বাঁচাবে? ঢাকা ফিরে যাবার আগের দিন রাত্রিবেলা আগরতলার 'রাজর্ষি' যাত্রীনিবাসে এক নৈশাহারের আয়োজন করা হয়েছিল। আহারের আগে ছিল নীরস বক্তৃতা এবং সরস সংগীতের আসর। অনেক অনুরোধে খালি গলায় গান গাইতে সম্মত হলেন হুমায়ুন আহমেদের তরুণী ভার্যা শাওন ভাবি। তিনি গাইলেন একটি হুমায়ুন সংগীত (হুমায়ুন আহমেদের লেখা এবং সুর দেয়া)। গাইবার আগে শাওন ভাবি বললেন, হুমায়ুন আহমেদ সাহেব অনেক গান লিখেছেন। আমি এখন যে গানটা গাইছি সেটা আমার বিশেষ প্রিয় — কেননা এ গানটা আমাকে নিয়ে লেখা। শাওন ভাবি সুরেলা ভরাট গলায় যে গানটা গাইলেন তার শুরুর দুটি লাইন হল —

সখি কী করি বল,
আমি চোখে পরেছি কলঙ্ক কাজল,

গানের শেষে সবাই করতালিতে মুখর হলেও, আউল-বাউল হুমায়ুন আহমেদ উদাস হয়ে রইলেন।

পরদিন অপরাহ্ন তিনটায় টি আর টি সি বাসস্ট্যান্ডে আগরতলা-ঢাকার শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত 'মৈত্রী' বাসে সস্ত্রীক হুমায়ুন আহমেদকে বিদায় জানাতে গেলে আমাকে উষ্ণ আলিঙ্গনে পিষ্ট করে উদাসি বাউল হয়ে গেলেন তিনি।

লোটা কম্বল

কদিন আগে যে দোকানটিতে রসগোল্লা সন্দেশ বিক্রি হত — সেই দোকানটিতে তার বদলে বিক্রি হচ্ছে এখন বালি, সুরকি এবং সিমেন্ট। এমন হল কেন? কেউ যদি বলে ঐ অঞ্চলের লোকজনের খাদ্যাভ্যাস রাতারাতি বদলে গিয়েছে তাই এমনটি সম্ভবত হয়েছে — এটা কোনও ব্যাখ্যা নয় — এটা কু-ব্যাখ্যা।

সংসারে এরকম হামেশাই দেখা যায়। কিছু দোকান বন্ধ হয়ে যায় — কিছু দোকান আবার নতুন করে খোলে। পুস্তকের দোকান বন্ধ হয়ে সেখানে গজিয়ে ওঠে হ্যানিম্যান হোমিও হল। আবার পাশেই শ্রীশ্রী গৌরনিতাই বস্ত্রালয়ের যেখানে সাইনবোর্ড ঝুলছে, আগে তাতে লেখা ছিল রাখহরি দশকর্মা ভাণ্ডার — এখানে গব্যঘৃত পাওয়া যায় — পরীক্ষা প্রার্থনীয়। ভালো করে পরীক্ষা করার আগেই দোকানটি উঠে গেল। কেন উঠে গেল?

কেন উঠে যায় — তার একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হল — আশেপাশের ক্রেতারা মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে দোকানটি থেকে। কেন ক্রেতারা মুখ ফিরিয়ে নেন — তার জন্য অবশ্য একাধিক কারণ দায়ী। তার মধ্যে একটা হল, হয়তো পাশের দোকানে ঐ একই জিনিস আরও কম দামে এবং অধিক গুণমানের পাওয়া যায়। বিক্রেতার দিক থেকেও দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে দেবার একাধিক কারণ থাকতে পারে। যেমন, রসগোল্লা সন্দেশ বিক্রি করে যা লাভ — বালি-সুরকি বিক্রি করলে হয়তো বেশি লাভ।

একটা জিনিস স্পষ্ট — এই লেনদেনের মধ্যে ভাবাবেগের স্থান বড় কম — লাভ ক্ষতির হিসেবটিই বড়ো। অনেকে মনে করেন, গ্রামের চাষি মানুষেরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফসল উৎপাদন করে। তাদের ত্যাগ কষ্ট এবং শ্রমের মর্যাদা শহরের মানুষেরা দিতে রাজি নয়। বিষয়টির ওপরে নির্মোহভাবে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, গ্রামের শ্রমজীবী মানুষেরা কষ্ট করে শহরের লোকজনদের জন্য নয়, তাদের নিজেদের জন্যই। জীবনকে সচ্ছল ও সুখকে নাগালের মধ্যে আনবে বলেই ফসল ফলানোর পশ্চাতে তাদের কষ্টস্বীকার। এ কথাটি সুন্দরভাবে উদাহরণ দিয়ে বর্ণনা করেছেন নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন। কেউ যদি কিছু করে — সেটা তার ভালোর জন্যই করে — অন্যের ভালোমন্দের সঙ্গে সেটা কোনোভাবেই জড়িত নয়। সেই অর্থে মানুষ খুব স্বার্থপর। বস্তুত হৃদয়হীন স্বার্থপরতাই তথাকথিত সভ্যতার রথের

চাকাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

স্বার্থপরতা প্রতিফলিত হয় লাভক্ষতির হিসেব-নিকেশের মধ্যে। এই লাভক্ষতির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ক্রেতা। ক্রেতার মন জয় করতে পারলেই বিক্রেতার দোকানের রমরমা। ইদানীং কোনও কোনও দোকানে একটি পোস্টারে হিতবাণী লট্‌কে রাখা হয়। দোকান আমার মন্দির, ক্রেতা আমার দেবতা — আমি তার পূজারি — ক্রেতার সন্তুষ্টিই আমার সন্তুষ্টি। দোকানির এটা মনের কথা কিনা কে জানে — তবে এই বাক্যগুলোর মধ্য দিয়ে একটা বিষয় গুরুত্ব পেয়েছে — সেটা হল ক্রেতার সার্বভৌমত্ব। এটাই স্বাভাবিক। ক্রেতা হিসেবে আমি আমার পকেটের টাকা দিয়ে একটা বস্তু বা সেবা কিনতে চাই। আমার নিশ্চয়ই অধিকার আছে — যে মূল্য আমি দিচ্ছি তার তুল্য বস্তু বা সেবা আমি পাব। আর আমি যদি বুঝতে পারি — আমি প্রতারিত হচ্ছি — তা হলে আমি কিনব না। তার চেয়ে বড় কথা হল, একজন ক্রেতার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে সিদ্ধান্ত নেয়ার — সে কী কিনবে বা কী কিনবে না। ক্রেতাকে কেউ বাধ্য করতে পারবে না — পারবে না অমর্যাদা বা অসম্মান করতে। কিন্তু বাস্তবে উল্টোটাই হয়ে থাকে। হিতবাণীতে বলা হয়েছে — ক্রেতা দেবতা, ক্রেতা মনিব। কিন্তু বিক্রেতাদের কাণ্ড কীর্তি দেখলে মনে হবে ক্রেতারা দাসানুদাস — ক্রেতারা যেন চাকর। ব্যাঙ্কের পরিষেবার কথা ধরা যাক — আমি আমার টাকা ব্যাঙ্কে রাখব — অ্যাকাউন্ট করার সময় আমার ছবি রাখতে হবে তাদের কাছে। অথচ হওয়াটা উচিত ছিল উল্টো। আমি তোমার কাছে টাকা রাখছি। তুমি আমার টাকা মেরে দিতে পার। একদিন লালবাতি জ্বেলে ব্যাঙ্ক নামক দোকানটি তুমি বন্ধ করে দিতে পার। অথবা কে জানে, তুমি ভেগে যেতে পার। ছবি তো আমার কাছে জমা দেবার কথা তোমার।

নিজের টাকা নিজে ব্যাঙ্ক থেকে তুলব — তাতেও আবার কত ঝকমারি। সিগনেচার মিলছে না — সিগনেচার মেলাও। দুজায়গায় সই করো — এখানে আর ওখানে। আমার সামনে সই করো। এতসব হেনস্তা দেখে মনে হয় — সবকিছুর একটা সীমা থাকা উচিত। ব্যাঙ্কের পরিষেবার বহর দেখলে যেকোনো সুস্থ মানুষের রক্তচাপ ঊর্ধ্বমুখী হতে বাধ্য। দুপুর দুটোর মধ্যে লেনদেন বন্ধ। শনিবার হলে বারোটা। কেন দুটো — কেন বারোটা? ঐ নির্দিষ্ট সময়ের পরে আমার টাকা আমি তুললে কেন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে — বুদ্ধিরও অগম্য। মানুষের প্রয়োজন কি সময় মেপে চলে? দুপুর দুটোর পরে ধরা যাক, তিনটে চল্লিশ মিনিটের সময় কি আমার টাকার দরকার হতে পারে না? ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ হয়তো বলবেন, একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরে তাদের লেনদেন বন্ধ রাখতে হয় — বাকি সময়টা হিসেবনিকেশের জন্য। ক্রেতা হিসেবে তাতে আমার কী করার আছে? তুমি হিসেব করবে না নিকেশ করবে এটা তোমার সমস্যা — তাতে আমি কী করতে পারি? আমার টাকা প্রয়োজনের সময় আমার

চাই — আমি আর অধিক কিছু বুঝতে রাজি নই। তুমি যদি আমাকে ‘সেবা’ দিতে না পার — তাহলে তোমার দোকান বন্ধ করে দাও। আমি কি বিনে পয়সায় তোমার ‘সেবা’ নিচ্ছি নাকি — এর জন্য তো পয়সা দিচ্ছি। কে না জানে, ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না। সাম্প্রতিককালে প্রযুক্তির সুবাদে ক্রেতাদের সম্মান এবং মর্যাদা উদ্ধার হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হচ্ছে। অনেক ব্যাঙ্ক এ টি এম (অটোমেটিক টেলার মেশিন) চালু করেছে। সই মেলানোর অপমান আর নেই — দিন রাত সময় অসময় বলে কিছু নেই। আমার টাকা আমি যে কোনও সময় তুলে আমি আমার প্রয়োজন মেটাতে পারি। কারোর ফোঁপরদালালি বরদাস্ত করতে রাজি নই আমি।

এটা শুধুমাত্র ব্যাঙ্ক পরিষেবার বেলায় নয় — অন্যান্য কর্মকাণ্ডেও প্রযুক্তি ক্রেতাদের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে এগিয়ে এসেছে। স্বভাবতই প্রযুক্তি হল ক্রেতাবান্ধব।

পরিতাপের বিষয় হল, প্রযুক্তির এই জয়জয়কারের দিনেও অনেক বিক্রেতা ক্রেতাদের যথাযথ সম্মান জানাতে অনাগ্রহী। তারা তাদের পুরোনো ধ্যানধারণা নিয়ে এখনও ক্রেতাদের ভোলেভালা এবং নিরেট বুদ্ধু ভাবেন।

আগরতলার প্যারাডাইস চৌমুহনির কাছে কেন্দ্রীয় সরকারের আপাদমস্তক ভর্তুকিতে চালু খাদি গ্রামোদ্যোগ বিক্রয়কেন্দ্রের কাঁচের দেওয়ালে একটা বিজ্ঞাপন দেখা গেল — ‘এখানে কম্বল বিক্রি করা হয়।’ গরমে ঘামে বৈশাখের দুপুরে চিড়চিড় করছে গা। সেসময় কম্বল কিনতে ডাকছে ক্রেতাদের। এরা ক্রেতাদের ভাবেটা কী? অবশ্য বিক্রয়কেন্দ্রের ভেতরে একটা ক্রেতারও টিকি দেখা গেল না। ক্রেতাদের যতটা বোকা ভাবা হয়েছিল — আসলে তারা তা নয়। তাহলে কী হবে? এই গরমের মধ্যাহ্নে কম্বল বিক্রি না হলে খাদি গ্রামোদ্যোগ বন্ধ হয়ে যাবে যে! মনে হয়, বিজ্ঞাপনটা খানিক বদলে ‘এখানে লোটা কম্বল বিক্রি করা হয়,’ লিখলে ক্রেতারা ধেয়ে আসবে। কেননা সংসারে সন্ন্যাসী এবং বিবাগী লোকের সংখ্যা ঊর্ধ্বমুখী এখন।

সন্তানসন্ততির জন্য চাহিদা

প্রায় দুশ বছর আগে সমগ্র পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল একশ কোটি। আর এখন? শুধু ভারতেরই লোকসংখ্যা একশ কোটিরও বেশি। জনসংখ্যার এই বিস্ফোরণে সবাই, বিশেষ করে রাষ্ট্রকর্ণধারগণ খুবই বিচলিত। কিভাবে এই লাগামবিহীন জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করা যায় এই নিয়ে সবাই ভাবিত। বছরে একদিন বিশ্বজনসংখ্যা দিবস সমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। এদিন জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য মিছিল মিটিং করা হয়। পত্রিকায় একপৃষ্ঠা জুড়ে বিশাল পোস্টার ছাপা হয়। তাতে বলা হয়, ছোট পরিবার সুখী পরিবার ইত্যাদি। এত কিছু করা সত্ত্বেও, জনসংখ্যা কমার কোনও সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না, উল্টে জনসংখ্যা হু হু করে বাড়ছে।

সরকার অনুসৃত জনসংখ্যা নীতি এখন পর্যন্ত অসফল হয়েছে মূলত একটি কারণে, তা হল জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করার ক্ষেত্রে সরকারি প্রচেষ্টায় সদিচ্ছার অভাব। ক্ষমতাসীন সরকারি পক্ষ অথবা বিরোধী আসনে উপবিষ্ট রাজনৈতিক নেতারা জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ হোক তা মনেপ্রাণে চায় কি না এ ব্যাপারে সংশয়ের অবকাশ আছে। বেশি লোক মানে বেশি ভোট — বেশি ভোট মানে নির্বাচনে জয়লাভের সম্ভাবনা বেশি। আমি যদি ভোটেই না জিতি জনসংখ্যা বাড়লেই কী, কমলেই কী — তাতে কী যায় আসে?

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে এটি একটি রাজনৈতিক বিষয়। আসলে তা নয়। বিষয়টি মূলত অর্থনৈতিক। পরিবারে সন্তানসন্ততির সংখ্যা কী হবে এটি একটি অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত। সাধারণত পরিবারে একটি সামগ্রীর চাহিদা কতটা হবে তা নির্ভর করে বস্তুটির দামের উপর। বেশি দাম হলে আমরা জিনিসটির জন্য কম চাহিদা করি। দাম কম হলে আমরা চাহিদা করি বেশি। এটা মোটামুটি সমগ্র দ্রব্যসামগ্রীর বেলায় প্রযোজ্য। এর মধ্যে কোনও রকম অর্থনীতি-তত্ত্বের কচকচি নেই। এটা সংসারের সরল সত্য। দাম বাড়লে চাহিদা কমে এবং দাম কমলে চাহিদা বাড়ে।

নবজাত একটি শিশুকে যদি আরও পাঁচটা দ্রব্যের মতো অন্য একটি দ্রব্য ভাবা হয় তা হলে হয়তো অনেক পিতামাতার ভাবাবেগ আহত হবে। তবু তর্কের খাতিরে ধরে নিচ্ছি

একটি শিশু আসলে একটি সামগ্রী। শিশুকে পেতে গেলে কিছু মূল্য দিতে হয়। তা হল তার দাম। শিশুর জন্য চাহিদা আছে, শিশুর জন্য দামও আছে। স্বভাবতই শিশুর দাম যদি কোনও কারণে বাড়ে, তবে পরিবারে শিশুর জন্য চাহিদা কমে যাবে। ফলে নবাগত শিশুদের সংখ্যা কমলে জনসংখ্যা হ্রাস পাবে। শিশুর দাম কমলে, নবাগত শিশুদের চাহিদা বাড়বে এবং তাতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। একটি জিনিস লক্ষ করার মতো — শহরে শিক্ষিত সচ্ছল পরিবারে পরিবারের সদস্যসংখ্যা কম। চাকুরি করা মা-বাবার সংসারে একটি বা দুটি সন্তান, তার বেশি নয়। আবার বিপরীতে, গ্রামে-গঞ্জে অশিক্ষিত অসচ্ছল সংসারে সন্তানসন্ততির সংখ্যা বেশি। কেন এমন বিপরীত চিত্র?

শহুরে বাবা মায়ের একটি বাচ্চাকে পেতে হলে অথবা চাহিদা করলে তার জন্য মূল্য বা দাম দিতে প্রস্তুত থাকতে হয়। একটি বাচ্চাকে জন্ম দেওয়া এবং লালনপালন করার জন্য অনেক খরচ। শিশুর জন্য কৌটোর দুধ এবং মলমূত্র ত্যাগের জন্য হাগিসের দাম মেটাতে অনেক ব্যয় বহন করতে হয়। বাচ্চার জন্ম দিতে গিয়ে মাকে (যদি মা চাকুরিরত হয়) সবেতন ছুটির বাইরেও ছুটি নিতে হয়। শিশুটিকে লালনপালনের জন্য খরচ, তার লেখাপড়ার জন্য ব্যয়, এগুলো হল প্রত্যক্ষ ব্যয়। আবার কতকগুলো আছে অপ্রত্যক্ষ ব্যয় যা দেখা যায় না সরাসরি। নির্দিষ্ট সংখ্যার চেয়ে বেশি বাচ্চা হলে বেতনে ইনক্রিমেন্ট বন্ধ হয়ে যাবে, মাতৃত্বকালীন সবেতন ছুটি মিলবে না ইত্যাদি। এইসব কারণে শহরে শিক্ষিত সচ্ছল পরিবারে একটি নবাগত শিশুকে আমন্ত্রণ করে আনতে গেলে পিতা-মাতাকে অধিক দাম দিতে প্রস্তুত থাকতে হয়। অধিক দামের ফলে পরিবারটিতে একাধিক সন্তানসন্ততির চাহিদা কম হবে। এটাই স্বাভাবিক। এজন্যই শহুরে বেশিরভাগ উচ্চ-মধ্যবিত্ত সংসারে পরিবারের সদস্যসংখ্যা কম।

অথচ গ্রামে বা শহরেরই অনুন্নত ঝুপড়িবাসী পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশি — কেন এমন উল্টো? এইসব পরিবারে শিশুরা জন্মায়, ধুলোয় মাটিতে গড়াগড়ি করে নিজেই বড়ো হতে থাকে। এদের লালনপালন শিক্ষা, স্বাস্থ্যের জন্য পরিবারের তরফ থেকে খরচ কম, প্রায় নেই বললেই চলে। তাছাড়া, যেহেতু এ সকল শিশুদের মায়েরা কোনও চাকরিবাকরি করে না, তাই শিশুদের পিছু অপ্রত্যক্ষ খরচ বস্তুত শূন্য। সত্যি কথাটা হল, এইসব অসচ্ছল অনুন্নত পরিবারে একটি নবজাত শিশুকে আনয়নের জন্য মূল্য দিতে হয় খুব কম। মূল্য বা দাম কম, তাই এক্ষেত্রে শিশুদের চাহিদা বেশি। গরিবের ঘরে সন্তানসন্ততির সংখ্যা এসব সঙ্গত কারণেই বেশি।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি যদি প্রকৃতই কমাতে হয়, তবে একটা কাজ করলেই যথেষ্ট। সেটি হল, বাচ্চাদের পেতে হলে অধিক দাম দিতে হবে — এটা চালু করলেই হবে। নবাগত শিশুর জন্য যদি বাজারের দাম বেশি হয়, তবে তাদের জন্য চাহিদা স্বাভাবিকভাবেই কম হবে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি স্বভাবতই হ্রাস পাবে। সেটা কী করে সম্ভব? শহরের মায়েরা মূলত লেখাপড়া জানা মানুষ। তারা চাকরিবাকরি থেকে বা অন্যভাবে আর্থিক উপার্জনে সক্ষম। অনেকক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রী দুজনে মিলে সংসারের জন্য উপার্জন করে বলে, সংসারটি সচ্ছল। এরকম পরিবারে স্ত্রী বা মায়েদেরও সময়ের দাম আছে। এসব ক্ষেত্রে শিশুদের লালনপালনে মায়েদের যে সময় ব্যয় করতে হয়, টাকার অঙ্কে তার দাম বেশ বেশি। বেশি দাম, তাই এরকম সচ্ছল পরিবারে সন্তানসন্ততির চাহিদা কম। গ্রামবাসী বা অসচ্ছল পরিবারে বাচ্চাদের লালনপালনের জন্য যদি মায়েদের সময়ের দাম বাড়ানো যায়, তবে সেক্ষেত্রে শিশুদের চাহিদা কম হবে। তাতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত হবে। এর জন্য এসব পরিবারের মেয়েদের সময়কে দামি করে তুলতে হবে। সেটা সম্ভবপর, যদি মেয়েরা শিক্ষাদীক্ষার মাধ্যমে তাদের ব্যবহৃত সময়কে দামি করে তুলতে পারে। তাছাড়া এটি একটি প্রমাণিত সত্য যে, উইমেন্স এডুকেশান ইজ দি বেস্ট কন্ট্রাসেপ্টিভ — মেয়েদের শিক্ষাই হল জন্মনিয়ন্ত্রণের শ্রেষ্ঠ উপায়। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত কোনও মার পাঁচ-ছটা সন্তান — এরকম ঘটনা বিরল। শিশুদের ফুলের সঙ্গে তুলনা করা হয়। একটি শিশুর নিষ্পাপ খিলখিল হাসির বস্তুত কোনও তুলনা হয় না। সব সংসারেই একটি শিশুর আগমন অতিরিক্ত নির্মল আনন্দের বার্তা বহন করে নিয়ে আসে। মনস্তত্ত্ববিদেরা বলেন, মেয়েদের কাছে মাতৃত্ব সব বয়সেই প্রার্থিত — যা স্বাস্থ্যগত কারণে সব সময় সম্ভবপর নয়। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রজন্মকে তারা কোলে কাঁখে করে নয়নের মণির মতো বড় করেন। তাই ঠাকুমা দিদিমার কাছে আসলের চেয়ে সুদ বেশি মিষ্টি।

সংসারের একটি মানবিক সম্পর্কের মধ্যে দাম চাহিদা এবং সুদের প্রসঙ্গ চলে এল। অর্থনীতি এমন একটি পাজি ব্যাপার, সবকিছুতেই তার নিষ্ঠুর উপস্থিতি থেকে যায়। ধর্মপ্রাণ মানুষের কাছে হর-পাবর্তীর পরিবার একটি আদর্শ সংসার। দুইপুত্র (কার্তিক, গণেশ), দুকন্যা (লক্ষ্মী, সরস্বতী) নিয়ে সেকালের সুখী পরিবার একটি। কিন্তু আজকের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে পরিবারটি পদে পদে বিড়ম্বনার শিকার হবে। এখান থেকে ওখান যেতে গেলে, রিক্সায় উঠতে পারবে না, একটি অটোতেও না। পারবে না উঠতে একটা ট্যাক্সিতেও — ট্রাফিক আইনে আটকাবে। আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটিতে বসবাসের জন্য একটা বাড়িভাড়াও পাবে না। ছজনের বিশাল পরিবারকে বাড়ি দেওয়ার আগে বাড়িকর্তা শতবার ভাববে। বস্তুত, পরিবারের আয়তন ছোট রাখার জন্য অপ্রক্ষত্যভাবে শাসাচ্ছে বাড়িঅলা, ট্রাফিক পুলিশ, ওয়াটার সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট এবং অন্যান্য সহস্র দাবিদার।

অন্যদিকে, মেয়েরা লেখাপড়া শিখছে, চাকুরি বা ব্যবসাক্ষেত্রে যোগ দিয়ে উপার্জন করছে। মেয়েদের সময় আর অঢেল বা সস্তা নয়।

অবস্থা এখন এমন দাঁড়িয়েছে, কেউ চাক বা না চাক, জনসংখ্যা বৃদ্ধি দাম এবং চাহিদার কারণে হ্রাস পেতে বাধ্য। গুণগত কারণে শিশুদের দাম বাড়ছে, তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও কমছে নবাগত শিশুদের জন্য চাহিদা।

অসবর্ণে আপত্তি নেই

প্রভাতী দৈনিক সংবাদপত্রে পাত্র-পাত্রী বিজ্ঞাপন প্রায়শই থাকে, বিশেষ করে রবিবারের পত্রিকায়। বিজ্ঞাপনগুলো খুবই চিত্তাকর্ষক। মনোযোগ দিয়ে পড়লে সমকালীন সমাজ সংসারের প্রচুর তথ্য জানা যায়। বিবাহ একটি বহু পুরোনো সামাজিক অনুষ্ঠান। সেকালে পাত্রপাত্রীর জন্য বিজ্ঞাপন দেয়ার রেওয়াজ ছিল না। এখন অর্থ ব্যয় করে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে পাত্রের জন্য পাত্রী বা পাত্রীর জন্য পাত্রের খোঁজ করা হয়। আজকাল বিজ্ঞাপন ছাপাবার প্রয়োজন হয়ে পড়ল কেন? আগে গ্রামের মেয়ের গ্রামের ছেলের সঙ্গে বিয়ে হত কৃষির ওপর নির্ভরশীল পাত্র পাত্রীর দুটি পরিবারের মধ্যে। গ্রামের চৌহদ্দির মধ্যেই জীবন। গণ্ডিবদ্ধ জীবনের বাইরে যাবার প্রয়োজন বা তাগিদ ছিল না। কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে গ্রামগুলো তখন মোটামুটি স্বয়ং সম্পূর্ণ ছিল। এখন আর আগের জীবন নেই — কৃষিতে শ্রমিক উদ্বৃত্ত। তারা কর্মসংস্থান এবং অধিক আয়ের প্রলোভনে শহর পানে ধাবিত। আগে গ্রামের লোক গ্রামের প্রতিবেশীকে চিনত। একজনের হাঁড়ির খবর অন্যজনের কাছে অজানা ছিল না। বিয়ে শাদি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিকট বা দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়দের মধ্যেই সম্পন্ন হত। এমন দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই যেখানে পাত্রের সঙ্গে পাত্রীর পূর্ব আত্মীয়তার লেশ-বেশ সূত্রে মাসিশাশুড়ির সম্পর্ক খুঁজে পেলেও অবাক হবার কিছু নেই। ইদানীংকালের নগরমুখীনতার ফলে গ্রামের মানুষ শহরের মানুষকে চেনে না এমনকী শহরের মানুষকেও চেনে না শহরের মানুষ। এই অজানা অচেনা সম্পর্কের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের উদ্দেশ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া ছাড়া আর গত্যন্তর নেই।

এই হল পাত্রপাত্রীর বিজ্ঞাপনের আধিক্যের ইতিকথা। সময় প্রবাহে বিজ্ঞাপনগুলোতে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগছে যা নজর এড়াবার নয়। যেমন, একটি লাইন প্রায়ই বিজ্ঞাপনে আজকাল লক্ষ করা যায়, অসবর্ণে আপত্তি নেই। এর মানে কী? অসবর্ণে আপত্তি থাকারই তো কথা। অন্তত এতকাল তো তাই ছিল। ছিল বলেই এখন নেই ব্যাপারটা এসেছে। ভালো করে তাকিয়ে দেখলে একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে ওঠে যা হল, সবর্ণই কাঙ্ক্ষিত, তবে প্রয়োজনে অসবর্ণে আপত্তি নেই। অগ্রাধিকার সবর্ণকেই দেয়া হবে। তবে প্রত্যাশিত সবর্ণ না পেলে তখন অসবর্ণ বিবেচ্য। আর একটু গভীরে গিয়ে অন্তর্তদন্ত করলে জানা যাবে, সবর্ণে কাঙ্ক্ষিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের সম্ভাবনা কম, তাই অসবর্ণকে বিবেচিত হওয়ার জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। মোদ্দা কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই, সবর্ণ অসবর্ণ ব্যাপার নয় ব্যাপার হল অন্য কিছু! অন্য কিছুটা কী? পাত্রপাত্রীর বিজ্ঞাপনের শেষ লাইনটি পড়লেই সবকিছু সুস্পষ্ট হয়ে যায়। চাকুরিরতা পাত্রীর দাবি অগ্রগণ্য। এখন দুটি লাইন পাশাপাশি রাখলে অন্তর্নিহিত অর্থটি উন্মোচিত হয়ে ওঠে। চাকুরিরতা পাত্রীর দাবি অগ্রগণ্য অসবর্ণে আপত্তি নেই। অর্থাৎ চাকুরি না করলে অসবর্ণ পাত্রীতে আপত্তি আছে, নতুবা নয়, পাত্রী চাকুরিরতা, কি চাকুরিরতা নয় সেটাই আসল কথা। সমাজ বদলেছে। আমাদের গ্রাম্যতা ঘুচেছে। আমরা আধুনিক হয়েছি। কিন্তু উদার হয়েছি কিনা সেই সংশয় থেকেই যাচ্ছে। লোক আদালতে আমি একবার সালিশি বিচারক ছিলাম। সেই সুবাদে প্রজাপতি নিবন্ধ বিয়ে সম্পর্কে আমার জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন হয়েছিল। একটি অল্পবয়সি তরুণীর স্বামী গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা যায়। মেয়েটির বিয়ে বছর দুইও হয়নি। খুবই দুঃখজনক ঘটনা। লোক আদালতের মধ্যস্থতায় ইন্সুরেন্স কোম্পানি স্বামীর মৃত্যুর জন্য মেয়েটিকে ক্ষতিপূরণ দিতে সম্মত হয়। যত দূর মনে পড়ে, ক্ষতিপূরণের টাকার অঙ্কটি ছিল ছয় লক্ষ। নিহত স্বামী ভালো উপার্জন করত। তাছাড়া, স্বামীবিহীন মেয়েটির সামনে দীর্ঘ অনিশ্চিত জীবন পড়ে আছে। এইসব যুক্তির যথার্থতার মাধ্যমে ক্ষতিপূরণের টাকার পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হল। দুপক্ষই লোক আদালতের সালিশি সিদ্ধান্ত মেনে নিল। সিদ্ধান্ত মোতাবেক ইন্সুরেন্স কোম্পানি মেয়েটির নামে ক্ষতিপূরণের পুরো টাকাটা ব্যাঙ্ক জমা দিয়ে দিল কিছুদিনের মধ্যে। তার কিছুকাল পরের কথা। আমার এক বন্ধুর পুত্রের স্ত্রী মারা যায়। পুত্রবধূর বয়স কম, কেননা বিয়ের কয়েক বছরের মধ্যেই মৃত্যু এসে তাকে ছিনিয়ে নেয়। আমার বন্ধু তার পুত্রের জন্য দ্বিতীয়বার বিয়ের কথা ভাবছিল। আলাপচারিতায় সে কথা জানতেই, লোক আদালতের মৃত স্বামী মেয়েটির কথা আমার মনে পড়ে গেল। আমি বন্ধুকে পরামর্শ দিলাম ঃ তোমার ছেলে স্ত্রীহারা আর ঐ মেয়েটি হল স্বামীহারা। এই দুজনের মধ্যে বিয়ে হলে ভালো হয়। তুমি খোঁজ নিয়ে দেখো। কয়েকদিন বাদে আমার বন্ধুবর বিমর্ষ হয়ে আমাকে বলল, না ভাই। এ সম্বন্ধটা হবে না। বিয়ের আলাপ নিয়ে আমি নিজে গিয়ে দেখি, আরও অনেক পাত্র ঐ

মেয়েকে বিয়ে করতে আগ্রহী। আমার ছেলের চেয়ে যোগ্যতর গুণবান একাধিক পাত্র আগে থেকে ওখানে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমার ছেলে তো দোজবর। তার চান্স নেই বললেই চলে। তাই আশা ছেড়ে দিয়ে আমি চলে এসেছি। এখন কথা হল আমাদের দেশে বাপের ঘুম হয় না মেয়ের বিয়ে দিতে। এ দেশে অনূঢ়া কুমারী মেয়ের বিয়ে দিতেই কত কষ্ট, সে ক্ষেত্রে বিধবা মেয়েকে বিয়ের জন্য পাত্রেরা হন্যে হয়ে ওখানে পড়েছে কেন? এ যেন স্বয়ংবর সভা। মেয়েটি পছন্দমতো একটি সুপাত্র বেছে নিলেই পারে যেন। এই অঘটনের পশ্চাতে ব্যাখ্যাটি কী? কী আবার, মেয়েটির নামে ব্যাঙ্কে নিট ছয় লক্ষ টাকা সঞ্চিত রয়েছে যে। এ ক্ষেত্রে 'পাত্রী চাই' বিজ্ঞাপনের ভাষাটা কিঞ্চিৎ বদলে দিলে দাঁড়াবে, বিধবা পাত্রীতেও আপত্তি নেই যদি মোটা অঙ্কের ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স তার থাকে।

একটি কুযুক্তি

সেক্স রেশিও বা লিঙ্গ অনুপাত ধারণাটি অর্থনীতি বিষয়ের বাইরেও বহুল প্রচলিত। সেক্স রেশিও মানে হল প্রতি এক হাজার পুরুষের বিপরীতে কতজন মহিলা আছে তার হিসেব। যেমন ২০০১ ইং সালের জনগণনা অনুসারে ভারতের সেক্স রেশিও হল ৯৩৩। অর্থাৎ ভারতে প্রতি এক হাজার জন পুরুষের বিপরীতে ৯৩৩ জন মহিলা আছে। একটি শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয়, শিশুটি কন্যা হতে পারে, পুত্রও হতে পারে। নবজাত শিশুটি কন্যা হবে না পুত্র হবে তার সম্ভাবনা সমান সমান। ফিফটি ফিফটি। যদি তাই হয়, তবে আদর্শ সেক্স রেশিও হওয়া উচিত এক হাজারে এক হাজার। কেরালা রাজ্যে ঐ সংখ্যাটি হল ১০৫৮। সেখানে এক হাজার পুরুষ প্রতি ১০৫৮ জন মহিলা রয়েছে। এটি বেশি হওয়ার একটা ব্যাখ্যা আছে। উন্নত দেশগুলোতে পুরুষের চেয়ে নারীদের সংখ্যা সব সময়ই বেশি। শারীরবিদ্যা থেকে জানা যায় পুরুষের চেয়ে নারীদের আয়ুষ্কাল বেশি। স্বাস্থ্য সমীক্ষা বলে পুরুষের চেয়ে একজন মহিলা

গড়ে ছবছর বেশি বাঁচে। মহিলারা অনেক বেশি পরিশ্রমী এবং কষ্টসহিষ্ণু হয়। সম্ভবত এজন্য এদেরকে আপেক্ষিকভাবে দীর্ঘজীবী হতে দেখা যায়। সব দেশেই একটা জিনিস দেখা যায় সেটা হল বিপত্নীকের চেয়ে বিধবার সংখ্যাধিক্য। যদি লিঙ্গ অনুপাত এক হাজারের চেয়ে কম হয় তখন একটা প্রশ্ন জাগে, কেন কম? ভারতের ৯৩৩ সংখ্যাটি বলে প্রতি হাজারে ৬৭ জন মহিলা কম জন্মেছে বা ৬৭ জন মহিলা জন্মেছিল, তারা এখন বেঁচে নেই। অথবা এমনও হতে পারে ৬৭ জন কন্যাসন্তানকে জন্মাতে দেয়া হয়নি, জন্মাবার আগেই তাদেরকে ভ্রূণহত্যা করে মেরে ফেলা হয়েছে। সোনোগ্রাফির মাধ্যমে যদি জানা যায় মাতৃগর্ভের বর্ধিষ্ণু ভ্রূণটি কাঙ্ক্ষিত লিঙ্গের নয়, তখন তাকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার জন্য স্বাগত জানানো হয় না। কেরালার সেক্স রেশিও (১০৫৮) অনেকের মতে অন্যান্য রাজ্যগুলোর পক্ষে শিক্ষণীয় উদাহরণ হিসেবে গৃহীত হবার যোগ্য। একজন নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত অর্থবিজ্ঞানী বলেছেন, ইন্ডিয়া কেরালা মডেল থেকে শিক্ষা নিতে পারে। কেরালা রাজ্যটি শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের মাপকাঠিতে অন্যান্য সব প্রদেশের চেয়ে এগিয়ে আছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে সেক্স রেশিওর অধিক সংখ্যাটি প্রমাণ করে না যে মহিলারা সেখানে পুরুষদের চেয়ে অগ্রসর। কে না জানে, কেরালা থেকে বহু পুরুষ মধ্যপ্রাচ্যে পেট্রো ডলার উপার্জন করার জন্য দেশান্তরী হয়। জনগণনার সময় দেশান্তরী পুরুষদের সংখ্যাটি গণনায় আসে না। আর তাতে স্বাভাবিক কারণে কেরালাতে লিঙ্গ অনুপাত অধিক হিসেবে প্রতিফলিত হয়। দিল্লির সেক্স রেশিও হল ৮২১ মাত্র। এই দেখে মনে হতে পারে, দিল্লিতে মহিলাদের আয়ুষ্কাল কম। এদের মৃত্যুর হার বেশি, নতুবা লিঙ্গ অনুপাত এত কম কেন? বস্তুত এটা সত্যি নয়। দিল্লিতে অবস্থা এত খারাপ নয় যে, মহিলারা স্বল্পায়ু বলেই এই হাল। আসল কারণটি অবশ্য অন্য। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পুরুষ শ্রমিকেরা কাজের সন্ধানে দিল্লিতে গিয়ে হাজির হয়। সেখানে কাজ খুঁজে নেয়। শ্রমিকেরা স্ত্রী পরিবার দেশে রেখে একা উপার্জনের জন্য দিল্লিতে গিয়ে অস্থায়ীভাবে বসতি গড়ে। জনগণনার সময়, তারা সেখানকার লোক বলে গণ্য হয়ে যায়। ফলে দেখা যায়, দিল্লিতে পুরুষের সংখ্যা মহিলাদের চেয়ে বেশি। সেখানে মহিলাদের জন্ম-মৃত্যুর সঙ্গে লিঙ্গ অনুপাত সংখ্যাটির কোনও সম্পর্ক নেই। একটি তথ্য থেকে জানা যায়, আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি এলাকার লিঙ্গ অনুপাত এক হাজারের কাছাকাছি। জীবিকা অন্বেষণে এখানকার পুরুষেরা কেরালার মতো উপার্জনের সন্ধানে রাজ্যের বাইরে খুব একটা যায় না বলে মনে হয়। আবার এটাও সত্যি যে দিল্লির মতো বাইরে থেকে এখানে রুজি রোজগারের ধান্দায় লোক দেশে স্ত্রী পরিবার রেখে আসে না। তার মানে হল, আগরতলার স্ত্রী পুরুষের জনসংখ্যার বিন্যাস ভিতর থেকে যাওয়া বা বাইরে থেকে আসা জনসংখ্যার দ্বারা প্রভাবিত হয় না। যা আছে মোটামুটি তাই আছে। তথ্যে এটাও জানা যায় যে, রাজধানী আগরতলা একটি পূর্ণ সাক্ষরতাময় শহর। এখানে পুরুষ ও মহিলারা প্রায়

সবাই সাক্ষর। আগরতলার সেক্স রেশিও মহিলাদের পক্ষে বেশি ঝুঁকে আছে আবার সাক্ষরতার দিক থেকেও ওরা পিছিয়ে নেই। এই দুটি কারণ যেখানে উপস্থিত, সেখানে মহিলাদের অনগ্রসর হয়ে থাকার কোনও কারণ নেই। সমাজের একাধিক বৃত্তি বা পেশাতে, পুরুষদের মতোই, মহিলাদের উপস্থিতি নজরে পড়ার কথা। কিন্তু রকমারি অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মে আগরতলার মহিলাদের অনুপস্থিতি লক্ষ করার মতো। এমনটা কেন? এর একটা কারণ হতে পারে, আগরতলায় যে কর্মসংস্থান বা অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মের অবতারণা হয়, সেগুলো এতই কম যে পুরুষেরা একাই তা করে ফেলতে পারে। মহিলাদের অংশগ্রহণের আর দরকার পড়ে না। অথবা এমনও হতে পারে, সংসার সামলে মহিলাদের হাতে কমই সময় থাকে যখন তারা ঘরের বাইরের কাজের জন্য সময় দিতে পারে। ইদানীং আগরতলা শহরের হাতে গোনা কয়েকটা দোকানে মালিকের আসনে (অর্থাৎ পরিচালকের আসনে) মহিলাদের বসতে দেখা যাচ্ছে। অবশ্য সব রকম দোকানে নয়, বিশেষ করে ওষুধের দোকান, তারপরেই স্টেশনারি দোকান চালাতে তাদেরকে দেখা যায়। এ ব্যাপারে মণিপুর উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। সেখানে দোকানপাট সবই চালায় মহিলারা। ইম্ফলে একটি বাজারই আছে যার নাম জেনানা বাজার। সেখানে মহিলারা মাছও বেচে। কোনও পেশাই তাদের কাছে অচ্ছুৎ নয়। এর একটি ঐতিহাসিক কারণ আছে। মণিপুরের পুরুষেরা রাজার হয়ে যুদ্ধ করত। পুরুষেরা যুদ্ধে লিপ্ত থাকত বলে, সেখানে চাষবাস থেকে শুরু করে ব্যবসা বাণিজ্য সবই মহিলাদের স্কন্ধে ন্যস্ত হয়েছে। ইম্ফল (ইস্ট) শহরের সেক্স রেশিও ১০০৭। যুদ্ধ তো আর সারা বছর ধরে হয় না, যুদ্ধ যখন থাকে না তখন মণিপুরের পুরুষেরা খায় দায় আর ঘুমোয়, ইতিহাস তার সাক্ষ্য। মহিলারা তাই সেখানে কর্মঠ এবং সংসারের হাল ওরা শক্ত সমর্থভাবেই ধরে রেখেছে। সেটা ঐ ট্র্যাডিশানের ফলশ্রুতি। আগরতলার পুরুষেরা যুদ্ধে না গেলে, খেয়ে দেয়ে স্রেফ না ঘুমোলে, এখানকার মহিলাদের কর্মক্ষমতা এবং প্রতিভার বিকাশের পথ অবরুদ্ধ থেকে যাবে বলেই মনে হয়।

দাম দিয়ে যায় কেনা

লোকে বলে, টাকা দিয়ে নাকি বাঘের দুধও কিনতে পাওয়া যায়। এটাও শোনা যায়, বাঘের দুধ নাকি যেখানে সেখানে নয়, শুধুমাত্র কলকাতায় মেলে। কলকাতা এক আজব জায়গা। সেখানে সবই নাকি টাকা দিলে পাওয়া যায়। কলকাতার ঠিক কোথায় বাঘের দুধ গ্লাস ভরতি পাওয়া যায়, নাকি লিটার হিসেবে বিক্রি হয় তার ঠিকানা কেউ জানে না। বাঘের দুধ পাওয়া গেলেও লোকে কেন কিনবে সেটা বোধগম্য নয়। বাঘের দুধ তো আর গরু বা মোষের দুধ নয় যে গোয়ালা আঙুল দিয়ে দোহন করে ফেনা ভর্তি বালতি উপচে পড়া দুধ বাজারে বিক্রির জন্য নিয়ে আসবে। কলকাতার খাটালগুলোতে দেখা যায় মোষের সদ্যোজাত বাছুরকে মেরে ফেলা হয়। তার বদলে খড় আর চামড়া দিয়ে একটা নকল বাছুর বানিয়ে আসল বাছুর বলে চালানো হয়। আসল বাছুর মায়ের বাঁট থেকে চুষে দুধ খেয়ে ফেলে। খড়ের বাছুর দুধ খায় না, তাতে অনেক দুধ বাড়তি পাওয়া যায়। খাটালের স্বল্প পরিসরে একটা বাছুরকে লালন পালন করে বড় করার দীর্ঘ সময়ে যে ব্যয়, তার চেয়ে অনেক কম দামে দুধেল মোষ কিনতে পারা যায় বিহারের গ্রাম থেকে। গোয়ালারা অশিক্ষিত হতে পারে, কিন্তু তারা নিঃসন্দেহে বুদ্ধিমান। একটা বাছুর যতটা দুধ খায় তার দাম কত? তাছাড়া খানিকটা বড় হয়ে ঘাস বিচালি খোল খায়, তারও দাম কম না। বাচ্চার জন্ম থেকে দুধ দেবার অবস্থায় আসতে আসতে একটি মোষের জন্য যা বিনিয়োগ সেটা বেশি, নাকি দেহাত থেকে একটা দুধেল মোষ কিনে নিয়ে আসা সেটা বেশি একজন গোয়ালা সেই হিসাবটা আগে করে। তারপর সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়। সিদ্ধান্তটা অ-মানবিক মনে হতে পারে তবে অর্থনৈতিকভাবে অ-লাভজনক নয়।

আমাদের মোটামুটি সব সিদ্ধান্তের পেছনে একটা লাভ লোকসানের হিসেব নিকেশের ব্যাপার থাকে যা অস্বীকার করা যায় না। অনেকে বিশ্বাস করেন প্রেম প্রীতি ভালোবাসাকে টাকার অঙ্কে মাপা যায় না। এগুলো টাকা-পয়সা হিসেব নিকেশের উর্ধ্বে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, সমবয়সি দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব এমন একটি সম্পর্ক যার জন্য একজন আর একজনের জন্য অনেক কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত যেখানে অর্থকড়ির হিসেব মূল্যহীন। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, খানিকটা লক্ষ করলে দেখা যায় 'বন্ধুত্ব'কে একটা দামের সীমারেখায় আনা যায়। দুবন্ধু একসঙ্গে টাউন বাসে উঠলে এক জন অন্যজনের টিকিটটা কেটে ফেলে।

অন্যজনকে কিছুতেই বাসের টিকিট কাটতে দেয় না। বন্ধুর জন্য টাউন বাসের ভাড়া দেড় টাকা নিজের পকেট থেকে অবলীলায় দিতে পারা কোনও ব্যাপারই না। এখন কথা হল, দুজন প্লেনে কোথাও যাবার জন্য রওনা হলে একজন আর একজনের প্লেন ভাড়া দিতে এগিয়ে আসবে কিনা সেটার বিষয়ে সংশয় থেকে যায়। এতে বোঝা যায়, বন্ধুত্বের একটা 'দাম' আছে। বন্ধুর জন্য নির্দিষ্ট একটা দাম দিতে অন্য বন্ধু প্রস্তুত। অবশ্য দামটা স্থির নয়। বন্ধুযুগলের আর্থিক সচ্ছলতার ওপর দামটা নির্ভরশীল। কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় একজন সহপাঠী তার বন্ধু সহপাঠীনিকে কলম উপহার দেয়, গাড়ি প্রেজেন্ট করে না। দুজনের মধ্যে একজন যদি কিপটে হয়, প্রকৃত দাম প্রতিফলিত না হবার সম্ভাবনাই বেশি। স্কটল্যান্ডের লোকেরা সচরাচর কৃপণ হয়। চলন্ত বাসে ভাড়া আদায় করতে এসে কন্ডাক্টর চেনা যাত্রী যুবকটিকে বলল, 'ঐ সামনের সিটে তোমার বান্ধবী বসে আছে। তুমি এত দূরে পেছনের সিটে বসেছ কেন?' 'আমি লক্ষ রাখছি, ও এখনও টিকিট কাটেনি। আগে কাটুক, তারপর আমি পাশে গিয়ে বসব।' অনেকে বাসে দাঁড়ানো সহযাত্রীকে সৌজন্যবশত নিজের সিট ছেড়ে দেয়। অবশ্য সৌজন্যেরও একটা সীমা আছে। দুতিনটা স্টপ পরেই নেমে যাবে, সেক্ষেত্রে নিজের সিট ছেড়ে দেয়া যায়। কিন্তু দূরপাল্লার বাস শিলচরের গাড়িতে উঠে আগরতলা থেকে শিলচর যাবে যে যাত্রী, সে কিছুতেই সৌজন্য বশবর্তী হয়ে নিজের সিটটি দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রীকে ছেড়ে দেবে না।

লোকে সিট ছেড়ে দেয়, অল্পস্বল্প দূরত্বের পথ হলে। বন্ধুর বাসের টিকিটের দাম নিজের মানিব্যাগ খুলে দিয়ে দেয় তাও অল্পস্বল্প হলেই। নির্দিষ্ট সীমারেখা পেরিয়ে গেলেই বা অল্পস্বল্পের চেয়ে বেশি হলেই মুখ ঘুরিয়ে নেয় বন্ধু। বন্ধুত্ব এবং সৌজন্যের একটা চাহিদা আছে, আছে যোগানও। এবং এগুলোর জন্য একটা দামও আছে। যদি দাম বেশি হয় তবে স্বাভাবিক কারণে চাহিদা কমে যায়। তবে অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রীর চেয়ে প্রেম প্রীতি বন্ধুত্বের ব্যাপারটার মধ্যে একটা তফাৎ আছে।

বাজারে যে দ্রব্য বিক্রি হয় তার জন্য বহু ক্রেতা থাকে। অনেক ক্রেতা হলেও দ্রব্যটির একটিই দাম। কিন্তু বন্ধুত্ব বা সৌজন্য হল দুটি মানুষের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্কের নিদর্শন। এজন্য এগুলোর দাম আলাদা এবং তা সম্পর্কিত দুটি মানুষের সাধ্য এবং অর্থনৈতিক অবস্থানের ওপর নির্ভর করে।

নিছক বন্ধুর জন্য কেউ হয়তো দীর্ঘ যাত্রাপথ জুড়ে বাসের সিট ছাড়বে না। কিন্তু নিজের স্ত্রী যদি ওঠে সেই বাসে এবং খালি সিটের অভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, তবে কী হবে? কী আর হবে, অবশ্যই সিটটা স্ত্রীকে ছেড়ে দেয়া হবে, তাছাড়া আর কী! স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে সম্পর্কের গভীরতা তার জন্য দীর্ঘ যাত্রাপথও তাকে সিট ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়া যায়।

অর্থাৎ স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কটি দুজন বন্ধুর মধ্যেকার সম্পর্কের চেয়ে 'দামি'। এই সম্পর্কের জন্য বেশি দাম দিতে প্রস্তুত স্বামী। অবশ্য দামেরও একটা ঊর্ধ্বসীমা আছে। কতটা দামি?

এই প্রসঙ্গে কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তারিণী মাঝি' গল্পটির উল্লেখ করা যেতে পারে। জলস্রোতে তারিণী মাঝির স্ত্রী ডুবে যায়। তার স্ত্রী সাঁতার জানে না। তারিণীকে জড়িয়ে ধরে বাঁচতে চায় তার স্ত্রী। তাতে তারিণীও ডুবে ডুবে মরতে বসে। এমতাবস্থায় তারিণী মাঝির সামনে দুটি পথ খোলা। এক, আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকা স্ত্রীকে নিয়ে নিজেও ডুবে মরা অথবা দুই, স্ত্রীকে ছাড়িয়ে ভেসে উঠে বেঁচে নিঃশ্বাস ফেলা। গল্পে দেখা যায়, তারিণী মাঝি দ্বিতীয় পথটি বেছে নিয়েছে। স্ত্রীকে ভালোবাসত না তারিণী, সেটা ঠিক না। কিন্তু তারও চেয়ে বড় কথা, সবার মতোই, তারিণী নিজেকে ভালোবাসত বেশি। স্ত্রীর চেয়ে তার নিজের জীবনটা বেশি দামি।

বেশির জন্য কম-কে ছেড়েছে তারিণী। ঘটনাটি অমানবিক। মানুষ মূলত স্বার্থপর। স্বার্থপরতাকেও দাম দিয়ে মাপা সম্ভব। সংসারের যে রথের চাকা চলছে সেখানে স্বার্থপরতা তৈল নিকেশের কাজ করে।

উন্নয়নের শর্ত

একটি দেশ বা একটি অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কিসের উপর নির্ভর করে? অনেকে মনে করেন অঞ্চলটি বড়ো হলে এবং সেখানকার জনসংখ্যা কম হলে উন্নয়ন ত্বরান্বিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। লোকসংখ্যা যদি বেশি হয় তাহলে উন্নয়নের সুফল মাথাপিছু হারে কমে যায়। অধিক লোককে খাওয়াতে পরাতেই সম্পদ নিঃশেষ হবার জোগাড়। সঞ্চয় বিনিয়োগের সম্ভাবনা হ্রাস পেতে বাধ্য। পণ্ডিতদের এক্ষেত্রে সুপারিশ হল, জনসংখ্যাকে সীমিত করে নিয়ন্ত্রণাধীন রাখতে পারলেই উন্নয়ন বল্গাহীনভাবে বৃদ্ধি পাবে।

এই প্রসঙ্গে উত্তরপূর্বাঞ্চলের অন্যতম রাজ্য অরুণাচল প্রদেশের পরিস্থিতি আলোচনা করা যেতে পারে। ২০০১ ইং সালের জনগণনা অনুসারে অরুণাচলের প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনঘনত্ব ১৩ জন। অন্যান্য রাজ্য আসাম ৩৪০ জন, ত্রিপুরা ৩০৪ জন, নাগাল্যান্ড ১২০ জন,

মণিপুর ১০৭ জন, মেঘালয় ১০৩ জন এবং মিজোরাম ৪০ জন এর চেয়ে অনেক কম। উল্লেখ্য সর্বভারতীয় জনঘনত্ব হল ৩১২ জন।

স্বল্প লোকসংখ্যাই যদি উন্নয়নের শর্ত হয়, তবে তো অরুণাচল উন্নয়নের মাপকাঠিতে সর্বাগ্রগণ্য রাজ্য হত। অথচ কে না জানে, অরুণাচল ভারতের সব রাজ্যগুলোর মধ্যে পেছনের সারিতে অবস্থান করছে। বরং দেখা যায়, যেসব রাজ্যে জনবসতি বেশি — সেগুলো অন্য অনেক রাজ্যের চেয়ে এগিয়ে আছে। তাই লোকসংখ্যা বেশি হলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হ্রাস পাবে এ কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। অনেক অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, উন্নয়নের প্রধান শর্ত হল শান্তি। একটি রাজ্যে যদি শান্তি বিরাজ করে তবে সেখানে উন্নয়নের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়া সম্ভব। রাজ্যের পরিস্থিতি যদি শান্তিপূর্ণ না হয়, তবে উন্নয়ন প্রক্রিয়া ব্যাহত হতে বাধ্য। শ্রমিক অসন্তোষ বা আইন শৃঙ্খলার অবনতি হলে শিল্পে বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত হয়। মূলধন বাইরে থেকে এসে পালিয়ে যায়। বাইরে থেকে আসা মূলধনকে আকৃষ্ট করার জন্য এবং যেন না চলে যায় তাই ধরে রাখার জন্য অঞ্চল জুড়ে শান্তির বাতাবরণ খুবই জরুরি। অশান্তি উন্নয়নের পথে বাধার স্তম্ভস্বরূপ।

আবার অরুণাচলের প্রসঙ্গে আসা যাক। ভারতের অন্যান্য অনেক রাজ্যের চেয়ে অরুণাচল অধিক শান্তিপূর্ণ, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। এখানে কোনও ধরনের আন্দোলন নেই, শ্রমিক অসন্তোষ নেই, নেই উগ্রপন্থীদের আধিপত্য। এখন প্রশ্ন হল, এত শান্তিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও অরুণাচলের উন্নয়ন কেন শম্বুকগতি? শুধু অরুণাচল নয়, মিজোরামও একটি অন্যতম রাজ্য যেখানে শান্তি বিরাজমান কিন্তু উন্নয়ন সেখানেও ত্বরান্বিত নয়।

এবার ভারতের একটি অগ্রগামী রাজ্য পাঞ্জাবের কথা আলোচনা করা যেতে পারে। অন্যান্য বহু রাজ্যের চেয়ে পাঞ্জাবের জনঘনত্ব অনেক বেশি। পাঞ্জাবে এক সময় শান্তি অনুপস্থিত ছিল। সমস্ত রাজ্যজুড়ে হিংসা এবং অশান্তির আগুন জ্বলছিল। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, লোকসংখ্যা বেশি হওয়া সত্ত্বেও, শান্তির বাতাবরণ না থাকার ফলেও পাঞ্জাবের উন্নয়ন স্তব্ধ বা ব্যাহত হয়নি।

রাজনৈতিক অস্থিরতাও রাজ্যে শান্তি বিঘ্নের একটি অন্যতম কারণ বলে অনেকে মনে করেন। অনেকের ধারণা, যে রাজ্যে মন্ত্রিসভা ঘন ঘন বদলায়, যেখানে আজ যে মন্ত্রী আছে, কাল সে মন্ত্রী থাকবে কি না নিশ্চয়তা নেই, সেখানে উন্নয়নের ধারা ব্যাহত হতে বাধ্য। এটা খুবই স্বাভাবিক বলে মনে হতে পারে যেখানে শাসক দলের মধ্যে স্থিরতা নেই সেখানে উন্নয়ন হবে কী করে। তার অর্থ হল, যে রাজ্যে শাসকদলের মধ্যে কোনও রাজনৈতিক অস্থিরতা নেই সেখানে উন্নয়ন নিশ্চিত।

পশ্চিমবঙ্গ একটি রাজ্য যেখানে গত তিন দশক ধরে রাজনৈতিক অস্থিরতা নেই।

সেখানে শ্রমিক অসন্তোষজনিত উত্তাল কোনো অশান্তি নেই, অফিস কাছারি শিক্ষা প্রাঙ্গণে কোনো অশান্তি নেই — সর্বত্র শান্তি বিরাজিত। একসময় পশ্চিমবঙ্গে ট্রাম, বাস পোড়ানো হত, মিছিল মিটিং এবং যানজটে দৈনন্দিন জীবন বিঘ্নিত হওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। এখন পরিস্থিতি ব্যাপক পরিবর্তিত হয়েছে। এত শান্তিপূর্ণ রাজ্য ভারতে এক্ষুনি আর নেই। রাজনৈতিক অস্থিরতায় অন্যান্য বহু রাজ্য এখন জেরবার। আজ যে মুখ্যমন্ত্রী, কাল হয়ে যাচ্ছেন বিরোধী দলনেতা এবং পরশু তিনিই দলবদল করে হচ্ছেন রাজস্বমন্ত্রী। পশ্চিমবঙ্গ হল ব্যতিক্রম। এখানে এরকম উথাল-পাতাল অদল বদল হয় না। রাজ্য সরকার এখানে স্থায়ী এবং পাকাপোক্ত, নীতির প্রশ্নে রাজ্য সরকারের অবস্থানও স্পষ্ট। স্বভাবতই প্রত্যাশা করা যেতে পারে একটি স্থিতিশীল সরকারের তত্ত্বাবধানে রাজ্যব্যাপী শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা দ্রুতগতি হবে।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমীক্ষা হয়েছে ভারতের রাজ্যগুলোর তুলনামূলক উন্নয়নের ধারা সম্পর্কে। সমীক্ষায় প্রকাশিত হয়েছে উন্নয়নের মাপকাঠিতে সবচেয়ে এগিয়ে আছে যে সব রাজ্য সেগুলো হল পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, গুজরাট ইত্যাদি। লক্ষ করার বিষয় ঐ সব রাজ্যগুলোতে রাজনৈতিক পরিস্থিতি খুবই অস্থিরতাপূর্ণ। তথাকথিত শান্তিরও সেখানে বড়ো অভাব। পশ্চিমবঙ্গ ব্যতিক্রম। অদ্ভুত কাণ্ড, পশ্চিমবঙ্গের দীর্ঘ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং শান্তিময় পরিস্থিতি উন্নয়নের সহায়ক বলে প্রমাণিত হয়নি।

কয়েক মাস আগে সর্বভারতীয় একটি পত্রিকা সমীক্ষা করেছিল — ভারতের ষোলোটি প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীদের মধ্যে সাফল্যের মাপকাঠিতে কার অবস্থান কোথায়? সমীক্ষার ফলাফল খুবই কৌতূহল উদ্দীপক। সমীক্ষাটি জানাচ্ছে, ভারতের এক নম্বর সফল মুখ্যমন্ত্রী হলেন ছত্তিশগড় রাজ্যের ড. রমণ সিংহ। প্রথম পাঁচজনের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর নাম নেই। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর নাম আছে অষ্টম স্থানে। ষোলোজনের মধ্যে ষোলোতম স্থান পেয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন যদি একজন মুখ্যমন্ত্রীর সাফল্যের মাপকাঠি হয়, সমীক্ষার ফলাফল থেকে অবশেষে কী দাঁড়াল ব্যাপারটা? অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভর করে না জনসংখ্যার আয়তনের ওপরে, নির্ভর করে না শান্তিময়তার ওপরে, নির্ভর করে না রাজ্য সরকারের স্থিতিশীলতার ওপরেও। তাহলে উন্নয়ন নির্ভর করে কিসের উপর?

নাও, বাড়ি এবং বিয়ে

গ্রামের প্রাচীন মানুষের ভাষায় — নাও, বাড়ি বানানো এবং বিয়ের কথা একবার শুরু করলে এই জীবনে আর শেষ হয় না। আগের সে দিনগুলো আর নেই। নৌকা করে জলপথে কেউ এখন যাতায়াত করে না। তখনকার দিনে নৌকা বানালেই চলত না, নৌকোর তলদেশের ফুটোফাটা মেরামতি করতে জীবন জেরবার। বাড়িঘর বানানোর একই অবস্থা। ঝড়ে বৃষ্টিতে ছাউনি উড়ে যেত যখন তখন। সেগুলো জোড়াতালি দিতে দিতে জীবন শেষ হয়ে যেত। নাও এবং বাড়ি বানিয়ে ফেলা কঠিন না। তবে এগুলো ঠিকঠাক মতো সচল এবং বসবাসযোগ্য করে ধরে রাখাই কঠিন। সারাজীবন ধরে এ কাজটা চলতে থাকে। বিয়ের ব্যাপারটাও তাই। কথাবার্তা পাকা করার পর পুত্র বা কন্যার বিয়ে দিলেই কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না। সত্যি কথা বলতে কী, বিয়ের পরে বিয়েকে জোড়াতালি দিয়ে বাঁচিয়ে রাখাই আরও কঠিন কাজ। কোনও অংশেই নৌকা এবং বাড়ি বানানোর চেয়ে কম না। জলের তোড়ে অথবা ঝড়ের মুখে নৌকো বা বাড়ি যেমন বিধ্বস্ত হয়ে যেতে পারে তেমনি চোরাস্রোতে বিয়ের জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধন বা সম্পর্কও ছিন্ন হয়ে যেতে পারে।

দিনকাল বদলেছে। বদলেছে সমাজ সংসারের দৃষ্টিভঙ্গি। এখন নাও বা বাড়ি খোদ বানাবার দরকার নেই। নিজস্ব বাড়ি বানাবার জন্য দিব্যি কেউ দেয়নি। ভাড়া বাড়িতে পায়ের উপর পা তুলে জীবন কাটিয়ে দেয়া যায়।

নৌকোর দিন এখন গিয়েছে। পরিবহনের জন্য এলাহি ব্যবস্থা এখন করায়ত্ত। আবাসন নির্মাণ এখন একটি বড়ো শিল্প। বহুতল অট্টালিকায় একটি ফ্ল্যাট কিনলেই হয়। নিজের বাড়ি নিজেকে বানাতে হয় না এখন। সব কিছুই এখন আর আগের মতো নয়। বিয়ের ব্যাপারটাও তাই। এক লক্ষ কথা খরচ না করলে বিয়ে হয় না, এটি অচল। কথায় কথায় বিয়ে হচ্ছে, আবার কথায় কথায় বিয়ে ভেঙে যাচ্ছে। নিজে বাড়ি না বানিয়েও যেমন ফ্ল্যাটবাড়ি কিনে থাকা যায়, তেমনি প্রথাসিদ্ধ বিয়ে না করেও, লিভিং টুগেদার ব্যবস্থায় নরনারী বিবাহসম্মত জীবন যাপন করতে পারে। সমাজ সংসার এ জন্য ভ্রূ কোঁচকায় না। এই পরিবর্তনগুলো ভালো না মন্দ — এখানে তা আলোচ্য বিষয় নয়। তবে এই পরিবর্তনের পশ্চাতে দায়ি কী বা কে তাই

খুঁজে দেখা যেতে পারে। প্রযুক্তি এসে নৌকোকে সরিয়ে দিয়েছে। আগে বাড়িঘর বানানো ব্যয়সাধ্য এবং কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। আর্থিক অবস্থা সবার এমন ভালো ছিল না যে সংসারের অন্য সব দাবি পূরণ করে নিজস্ব পাকা বাড়ি বানাতে লোকে সমর্থ ছিল। কেউ কেউ যখন প্রৌঢ়ত্বে এসে সারাজীবনের সঞ্চয় দিয়ে বাড়ি বানাত, ভোগ আর করতে পারত না। ভোগ করার আগেই পরপারের ডাক এসে যেত।

এখনকার পরিবর্তিত ব্যবস্থায়, বাড়ি বৃদ্ধ বয়সে বানাতে হবে এমন কোনও কথা নেই। জীবনের শুরুতেই বাড়ি বানানো সম্ভব — সেক্ষেত্রে নিজস্ব সঞ্চয় না থাকলেও চলবে। ব্যাংক বাড়ি বানানোর জন্য গৃহঋণ দিতে উন্মুখ হয়ে আছে। ঋণ নিয়ে ফেরত দেবার সুপ্ত সাধ্য আছে এইটুকু প্রমাণ করতে পারলেই হল। আমাদের দেশে একটা মোটামুটি ধারা আছে প্রথমে লেখাপড়া সফলতার সঙ্গে শেষ করা, তারপর একটা চাকরি জোগাড় করে অথবা ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে উপার্জনক্ষম হওয়া, তারপর বিয়ের পিঁড়িতে গিয়ে বসা এবং প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ বয়সে এসে জীবনের কষ্টার্জিত উপার্জনের একটি অংশ দিয়ে একখণ্ড জমি কিনে তাতে বাড়ি বানানো। বিদেশে এরকম বাঁধাধরা নিয়ম নেই। স্কুলের পড়া শেষ করতে না করতেই বিয়ে করে ফেলে অনেকে।

বিয়ে করে তবে কেউ হয়তো পড়তে যায়। কেউ চাকরি ফেলে পড়তে আসে। কেউ বা পড়া ফেলে রেখে চাকরি করতে যায়। বিয়ে চাকরি এবং পড়া — এগুলোর মধ্যে নির্দিষ্ট আগে পরে বলে কোনও ব্যাপার নেই। তখন যেটা সামনে উপস্থিত হয় সে দেশের তরুণ তরুণীরা বিনা দ্বিধায় তা গ্রহণ করে। কিছুতেই কোনও ছুৎমার্গ নেই। চাকরি যেমন বদলায়, বিয়েও তেমনি বদলযোগ্য।

সবকিছুর পশ্চাতে যা নীরবে কাজ করছে বা ক্রিয়াশীল তা হল অর্থনীতি। অর্থনীতির সায় ছাড়া কেউ এক পা-ও ফেলে না। অর্থনীতির লাভক্ষতির অঙ্ক অমানবিক হলেও নির্মমভাবে বাস্তব।

লেখাপড়ায় এখন একটা হুজুগ এসেছে ভালো ছেলেমেয়েরা সবাই এখন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়। অভিভাবকেরাও পুত্র কন্যাদের ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বানাতে বদ্ধপরিকর। মনে হয়, ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হতে পারলে জীবনের একটা হিল্লে হয়ে গেল। উচ্চ আয়, নিশ্চিত ভবিষ্যত। কিন্তু কথা হল, এই প্রজন্মের মেধাসম্পন্ন ছেলেমেয়েরা যদি স্রেফ ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যায়, তবে স্কুলের শিক্ষক বা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অধ্যাপিকা কারা হবে? পরের প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা পড়বে কাদের কাছে? তারাও তো ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হতে চাইবে, তাদের পড়াবে কে? ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারেরা তো পড়ায় না। পড়ানোর জন্য মাস্টারমশাই চাই। দিনকাল এমন যে, আর যাই হোক, কেউ ভবিষ্যতে মাস্টারমশাই হতে

চাইবে না। নিজস্ব বাড়ি না বানিয়ে যেমন ভাড়াবাড়ি বা ফ্ল্যাটবাড়িতে থেকে স্বচ্ছন্দ জীবনযাপন করা যায়, তেমনি এমন প্রযুক্তি আমাদের করায়ত্ত হবে যা মাস্টারমশাইদের বিকল্প হয়ে যাবে। মাস্টারমশাই সশরীরে না অধ্যাপনা করলেও অত্যাধুনিক প্রযুক্তির দৌলতে সে শূন্যস্থান পূরণ হবেই হবে। এটাই স্বাভাবিক। জীবন আটকে থাকে না। তবে একটা শর্ত পূরণ হতেই হবে তা হল, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুন প্রযুক্তি হতে হবে কম ব্যয়সাপেক্ষ এবং নাগালের মধ্যে প্রাপ্তব্য।

যার যার মঙ্গল গাও রে নিতাই

শীতের শুরুতে যখন প্রথম ধনেপাতা বাজারে আসে, তখন একশ গ্রামের দাম একশ টাকা। অর্থাৎ একগ্রামের দাম এক টাকা। ধনেপাতার অত্যধিক দাম দেখেশুনে মনে হয়, ধনে পাতা আসলে খাওয়ার জন্য নয়, দেখার জন্য। এহেন মহার্ঘ ধনেপাতার দাম মাস দেড় দুয়েকের মধ্যে কমতে কমতে এত নিচে নেমে যায় যে একসময় মাত্র একটাকা দিয়ে একশ গ্রামের দ্বিগুণ ধনেপাতা বাজারে বিকোয়। বাজারে এমনও দিন যায় ধনেপাতা বাজারে বিক্রি হল না, তা আর ঘরে ফিরিয়ে নেয় না চাষি। শুকনো লালচে ধনেপাতার তখন স্থান হয় বাজারের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া পুরসভার নর্দমায়। চাষিরা বোঝা বয়ে বাড়ি না নিয়ে নর্দমায় ফেলে দিয়ে যায়। ফেলে দেয়া ধনেপাতা বা অন্য সব্জি গরুতেও খেতে চায় না। নিয়তির নির্মম পরিহাসই বলতে হবে।

আমাদের সরকার রাজ্যের কৃষকদের অধিক শস্য ফলাতে নিরন্তর উৎসাহ দিয়ে থাকেন। 'গ্রো মোর ফুড' সরকারের একটি জনপ্রিয় স্লোগান। কিন্তু মুশকিল হল, সরকারের কথা শুনে যদি কোনও চাষি অধিক শস্য বা খাদ্য ফলায় তবে তার কপালে দুঃখের শেষ নেই। চাষিদের ভালো করতে চেয়ে 'অধিক খাদ্য ফলাও' সরকারের উপদেশ বর্ষণে চাষিদের সর্বনাশের পথটি প্রশস্ত হয়ে ওঠে। যারা শিল্পে যুক্ত বা শিল্প থেকে জীবিকা নির্বাহ করে তারাও এদেশেরই জনগণ। সরকার শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিদের 'অধিক শিল্পসামগ্রী ফলাও' এই উপদেশটি দিতে

কেন বিরত থাকেন, এটি একটি রহস্য। শিল্পে ইচ্ছে করলেই উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়। আবার উৎপাদন যদি কখনও বেশি হয়, তাহলে তা গুদামে মজুত রেখে পরে বিক্রি করা যায়।

শিল্পদ্রব্যগুলোর অবস্থা কৃষিসামগ্রীর মতো শোচনীয় হয় না কখনও। কৃষিদ্রব্যাদি পচনশীল, তাই মজুত করে রেখে ভবিষ্যতে বিক্রি করার চেষ্টা করা অর্থহীন। তাছাড়া, কৃষিদ্রব্যের উৎপাদন বাড়ানো খুবই কঠিন। জমি, জল এবং অন্যান্য উপকরণের সীমাবদ্ধতার জন্য ইচ্ছে করলেই জমির ফসলের পরিমাণ অপর্যাপ্তভাবে বাড়ানো সম্ভবপর নয়। শিল্পক্ষেত্রে অবশ্য এই সমস্যাটা অতটা প্রকট নয়। বোতাম টিপলেই হুড়হুড় করে দ্রব্যাদি বেরিয়ে আসে। উদাহরণস্বরূপ, জুতো উৎপাদনের উল্লেখ করা যেতে পারে। মেশিনের মধ্যে কাঁচামাল পুরে দিলেই জোড়ায় জোড়ায় জুতো তৈরি হয়ে যায়।

একজোড়া জুতোর দাম কত হবে, তা জুতো তৈরি হওয়ার আগেই ঠিক হয়ে যায়। সবার আগে দাম ঠিক হবে, তারপর ঠিক হবে মোট কত জোড়া জুতো বানানো হবে। তত জোড়াই বানানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হবে যাতে মুনাফা সর্বাধিক হয়। অথচ কৃষিদ্রব্যের বেলায় তার বিপরীত। প্রথমে চাষি জানে না তার উৎপাদিত শস্য বা কৃষি দ্রব্যটির দাম আখেরে কত হবে। উৎপাদনের শেষে বাজারে নিয়ে এলে তবে দাম ঠিক হয়। কখনও যদি বেশি উৎপাদন হয়ে যায় কোনও কারণে, তখন দ্রব্যটির দাম কমে যাবে। দাম বাড়া বা কমার ব্যাপারে চাষির কোনও হাত নেই। খরা বা বন্যার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি নির্ধারণ করে উৎপাদিত সামগ্রীর পরিমাণ। পুরো বিষয়টিতে চাষি অসহায় এবং নিরুপায়।

গত ৩০ এপ্রিল সাম্প্রতিককালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক গলব্রেথ সাতানব্বই বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। তিনি ষাটের দশকে ভারতে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত ছিলেন। তারও আগে তিনি কলকাতার ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্সটিটিউটে কিছুকালের জন্য অধ্যাপনা এবং গবেষণাকর্মে নিযুক্ত ছিলেন। আমেরিকার জনপ্রিয় প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির সময়ে তিনি ভারতের রাষ্ট্রদূত হয়ে এসেছিলেন।

আমি নিজেকে খুবই গৌরবান্বিত মনে করি এ জন্য যে, হারবার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক, রাষ্ট্রদূত, চিন্তাবিদ জন কেনেথ গলব্রেথের নিকটে আসার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল। আমি তখন আমেরিকায় গবেষণাকর্মে রত আছি, সে সময় অধ্যাপক গলব্রেথ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিলেন।

সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে অভ্যাগত অধ্যাপকের দেখাশোনার জন্য ছাত্রদের মধ্যে যথাক্রমে দু ঘন্টার জন্য দয়িত্ব দেয়া হয়। একসময় ঘন্টা দুয়েকের জন্য আমার তত্ত্বাবধানে তিনি ছিলেন। তত্ত্বাবধান কথাটা বাড়িয়ে বললাম, আসলে ওই দু ঘন্টা সময়

মাস্টার মশাই গলব্রেথকে, তিনি যেখানে যেখানে যাবেন বা যাঁদের সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার করবেন বলে পূর্বনির্দিষ্ট হয়ে আছে, সেখানেই পৌঁছে দেওয়াই আমার কাজ। যে দুঘন্টা তাঁর সাহচর্যে আমার কেটেছে, তা আমার স্মৃতিতে অমূল্য সম্পদ হয়ে আছে। সাতফুটের চেয়েও উঁচু মানুষটি যখন খানিকটা ঝুঁকে আমার কাঁধে হাত রেখে আমার পড়াশোনা কেমন চলছে ইত্যাদি খোঁজ খবর নিয়েছেন তখন আমি অভিভূত হয়ে যাই।

দিনের শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘরোয়া একটি আলোচনাসভায় অন্যান্যদের সঙ্গে আমিও একটি প্রশ্ন করেছিলাম। আমি ইন্ডিয়া থেকে এসেছি, অধ্যাপক গলব্রেথ ইতিমধ্যে জেনে গিয়েছেন। আমি পত্রিকা পড়ে জেনেছিলাম অধ্যাপক গলব্রেথ কিছুদিন আগে নয়াদিল্লি ঘুরে এসেছেন। আমার প্রশ্নটা ছিল এরকম ঃ প্রফেসার গলব্রেথ, আপনি ষাটের দশকে ভারতে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত ছিলেন।

প্রায় পাঁচিশ বছর বাদে এই সেদিন আবার ভারতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। এই সময়ের ব্যবধানে আপনি কি ভারতে কোনও পরিবর্তন দেখেছেন অর্থাৎ এর মধ্যে কী লক্ষণীয় পরিবর্তন আপনার নজরে পড়েছে? অধ্যাপক গলব্রেথ মৃদু হাসলেন। প্রশ্নটির উত্তর সরাসরি না দিয়ে খানিকটা ঘুরিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, আমি যখন ইন্ডিয়ায় অ্যাম্বাসেডর ছিলাম, সেসময় ভারতে খুব খাদ্যাভাব ছিল। আমেরিকা থেকে পি এল ৪৮০ চুক্তি অনুসারে খাদ্যের জাহাজ পৌঁছোনো না পৌঁছোনোর সঙ্গে রেশন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হওয়ার একটা সরাসরি সম্পর্ক ছিল।

ভারতের অবস্থা তখন এতটাই করুণ ছিল, তারা আক্ষরিক অর্থেই দূরবিন নিয়ে তাকিয়ে দেখত কখন খাদ্যশস্য বোঝাই জাহাজ এসে সমুদ্রতটে পৌঁছুবে। এখন এই আশির দশকের শেষে চিত্রটা অন্যরকম। কিছুদিন আগে দিল্লি থাকাকালীন আমি সেখানকার একটা বহুল প্রচারিত ইংরেজি প্রভাতী দৈনিকের সম্পাদকীয়তে দেখলাম সম্পাদকমশাই আমেরিকার প্রেসিডেন্টের কৃষি সংশ্লিষ্ট একটি বিদেশনীতিকে তুলোধুনো করেছেন।

তিনি বলেছেন, বিশ্বের বাজারে শস্য রপ্তানিকারী ভারতীয় চাষিরা অন্যায্য দুর্দশার সম্মুখীন হয়েছেন, আমেরিকা তার চাষিদের অহেতুক ভর্তুকি প্রদান করার দৌলতে। আসলে ব্যাপারটা হল, আমেরিকা তার উন্নত কৃষকদের বিশ্ববাজারে আরও অধিক সুবিধে পাবার জন্য কৃষিদ্রব্যে ভর্তুকি দেবার ব্যবস্থা করছে। এর ফলে মার খাচ্ছে, ভারতের তুলনামূলক অনগ্রসর চাষিরা। বিশ্বের বাজারে ইন্ডিয়ান ফার্মারেরা হেরে যাচ্ছে। পত্রিকাটির সম্পাদক আমেরিকার বিমাতৃসুলভ আচরণের নিন্দা করেছে। শেষে অধ্যাপক গলব্রেথ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ইয়ংম্যান ফ্রম ইন্ডিয়া, (আমি তখন ইয়ং ছিলাম।) নিশ্চয়ই তোমার প্রশ্নের উত্তরটা আমি দিতে পেরেছি মোটামুটি।

মোদ্দা কথাটা হল, ষাটের দশকে ভারত ছিল খাদ্যশস্য আমদানিকারী একটি অনুন্নত দেশ আর এখন ভারত বাইরে বিশ্বের বাজারে রপ্তানিকারী অর্থনীতি। পরিবর্তন হয়েছে কি হয়নি, এবার তুমি বুঝে নাও। এটা তোমার ওপর ছেড়ে দিচ্ছি। কেন আমেরিকার চাষিদের সঙ্গে ভারতের চাষিরা পেরে ওঠে না, কেন ভারতের শিল্পের কাছে ভারতের কৃষি মার খায়, কেন শহরের লোকদের কাছে গ্রামের লোকেরা ঠকে — এর উত্তর আমি দীর্ঘকাল ধরে খুঁজছি। অনেকে আমাকে বলেন, শহরের লোকজন খুব চালাকচতুর, সে তুলনায় গ্রামের লোকেরা বোকা। বোকারা ঠকবে তাতে অবাক হবার কী আছে? গ্রামের লোকেরা বোকাসোকা একথা মানতে আমি রাজি নই। আমি মনে করি, লেখাপড়া জানা লোকও মূর্খ হতে পারে। লেখাপড়া জানার সঙ্গে মূর্খামির কোনও সম্পর্ক নেই। গ্রামের লোক যদি বোকাসোকাই হবে তবে মাঠ পেরোনোর সময় কোনাকুনি পেরোয় কেন? আলপথ ধরে দীর্ঘ দূরত্ব পার হলেই পারে।

'যার যার মঙ্গল গাও রে নিতাই' বলে একটা গ্রাম্য কথা আছে। গ্রামের লোকেরা, কৃষিতে নিযুক্ত চাষিরা নিজেদের সীমাবদ্ধতার মধ্যে যতটা বেশি মঙ্গল লাভ করা সম্ভব, তাই করার আপ্রাণ চেষ্টা করে।

বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও জীবন

বিজ্ঞান প্রযুক্তির সঙ্গে জীবনযাপনের একটি সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। উল্টোভাবে বললে বলতে হয়, জীবনযাপনের স্তরই বলে দেয় কী ধরনের বিজ্ঞান প্রযুক্তি এ সময়ে প্রয়োজন।

সময়প্রবাহ অনন্ত। তাই সময়কে ঘড়ির কাঁটাতে ঘন্টা, মিনিট এবং সেকেন্ডে বিভাজন অর্থহীন। কিন্তু, তবু আমরা তা করি, কেননা জীবনযাপন তাতে অর্থময় হয়। একসময় ঘড়িটড়ি ছিল না। তখন সূর্যের অবস্থান অথবা ছায়ার হ্রস্বতা বা দীর্ঘায়িত হওয়া দেখে সময়ের পরিমাপ করা হত। তারপর জীবনযাপনের তাগিদে বিজ্ঞান প্রযুক্তির দৌলতে ঘড়ি আবিষ্কৃত হল। সেকেন্ড বা মিনিটের কাঁটা দিয়ে সময়কে পরিমাপ করার চেষ্টা হল। জীবন থেমে থাকে না,

সময় থেমে থাকে না, থেমে থাকে না বিজ্ঞান প্রযুক্তিও। মিনিট সেকেন্ডের কাঁটার পরিবর্তে এল কোয়ার্টজ ডিজিটাল ঘড়ি। এ ঘড়িতে শুধু কটা বাজল তা সংখ্যায় দেখা যায়, মিনিট, সেকেন্ড বা ঘন্টার কোনও কাঁটা নেই। ব্যবস্থাটা মন্দ নয় — সময় জানতে, কত ঘন্টা কত মিনিট কত সেকেন্ড ভালো করে খুঁটিয়ে দেখার দরকার নেই। ডিজিটাল নাম্বার ডিসপ্লেই তা বলে দেবে। এতে পরিশ্রম কম, লাভ বেশি — অবশ্যই তা বিজ্ঞান প্রযুক্তির সৌজন্যে। কিন্তু কথা হল, কাঁটাওলা ঘড়ির জায়গায় ডিজিটাল ঘড়ি এল বলে শুধুই কিলাভ? কোনো ক্ষতি নেই? সময় একটি আপেক্ষিক বিষয়। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আমরা শুধু তাৎক্ষণিক সময়ই দেখি না, আর কত সময় বাকি আছে বা কত সময় চলে গেল তাও দেখি। কাঁটাওলা ঘড়ি এগুলো বলে দেয়, ডিজিটাল ঘড়িতে তার ব্যবস্থা নেই। সময় যে বস্তুত আপেক্ষিক, ডিজিটাল ঘড়ি তা মনে করিয়ে দেয় না। সাহিত্যিক যাযাবরের ভাষায়, বিজ্ঞান জীবনে বেগ নিয়ে আসে বটে, তবে তার বদলে আবেগ বিসর্জন দিতে হয়।

এখন অনেকের সঙ্গেই মোবাইল ফোন থাকছে। যেভাবে মোবাইল ফোন পরিষেবা সম্প্রসারিত হচ্ছে তাতে মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে ল্যান্ড ফোন তার প্রয়োজনীয়তা হারাবে। ভবিষ্যতে ল্যান্ড ফোন থাকবে কি থাকবে না সেটা কথা নয়, যা হবে তা হল, লোকজনের কব্জিতে আর ঘড়ি শোভিত হবে না। প্রতিটি মোবাইল ফোনে ডিজিটাল ঘড়ি থাকে তাই আলাদা করে কব্জিতে ঘড়ি রাখার মানে হয় না। রিস্ট ওয়াচকে বিদায় জানাবার সময় হয়ে এসেছে। পুরোনো দিনের ঘড়িকে হারালে, শুধু ঘড়িকেই আমরা হারাব না, তার সঙ্গে হারিয়ে যাবে আরও অনেক কিছু।

আমাদের ছোটবেলায় আমরা বিশালগড় থেকে উদয়পুরে যেতাম। কাঁকড়াবনের গোমতী নদী পার হতাম খেয়া দিয়ে। জোড়া নৌকা দিয়ে খেয়া পার হত যাত্রীবাহী গাড়ি বা মালামাল ভর্তি ট্রাক। পরে অবশ্য বিশ্রামগঞ্জ, বাগমা, ধোঁয়াইছড়ি হয়ে গোমতী পার হয়ে উদয়পুরে যেতাম আমরা। কাঁকড়াবনের মত ধোঁয়াইছড়িতেও গোমতীতে ব্রিজ ছিল না। এখন দুজায়গায় সেতু হয়েছে, যাত্রী বোঝাই গাড়িগুলো হুশ্‌হাশ্ করে গোমতী পার হয়ে যায়। কিন্তু আগে গোদারার কাছে এসে সবাইকে গাড়ি থেকে নামতে হত, কেননা আগের গাড়িগুলো এখনও পার হয়নি, লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। গোমতী পারাপার হওয়া এখানে কয়েক ঘন্টার ব্যাপার। লোকজন গাড়ি থেকে নেমে চা মিষ্টি খেত, গপ্পো গুজারি মারত, সুখ-দুঃখের গল্প বলত বা শুনত। এর ফলে নদীর দুপারে গড়ে উঠেছিল গমগমে বাজার। সারারাত জেগে থাকত সে বাজার। গাড়ি থামত, যাত্রীরা নামত, কেনাকাটা করত তারপর চলে যেত।

বিজ্ঞান প্রযুক্তি এসে লোহা লক্কর সিমেন্ট দিয়ে বিশাল ব্রিজ বানিয়ে দিল গোমতীর উপর ধোঁয়াইছড়িতে এবং পরে কাঁকড়াবনে। এখন গাড়িগুলো ব্রিজের উপর দিয়ে গোমতী

পার হয়ে যায় নিমেষে, একবারও পেছন ফিরে তাকায় না। আগেকার গড়ে ওঠা নদীর দুপাশের বাজারগুলো এখন আর নেই। এখন সেখানে নীরব নিস্তব্ধতা, কোলাহল সব থেমে গিয়েছে। গোমতীর পারে এসে দাঁড়ালে কেউ বুঝতেই পারবে না এখানে এক সময় কর্মব্যস্ততা ছিল, ছিল সুখ-দুঃখ বিনিময়জনিত শীতার্ত উষ্ণতা।

এখন সব কিছু অতীত। আসামের প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক জহ্নু বড়ুয়ার একটি মর্মস্পর্শী ছায়াছবির বিষয়বস্তু হল এরকম নদী সম্পর্কিত এবং নদী বিষয়ক। কোথাও নদীর ওপরে ব্রিজ বানালে সেখানকার মাঝিরা তাদের রুটি রোজগার হারায়। শুধু যে অর্থকরী সম্পর্কের বিলুপ্তি ঘটে তা নয়, নৌকায় নদী পারাপার হওয়ার সময় যে মানবিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে যাত্রীদের নিজেদের মধ্যে এবং মাঝির সঙ্গে সুখ-দুঃখের অংশীদারিত্বের ফলে, তাও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এ সবই বিজ্ঞান প্রযুক্তির অবদান।

বিজ্ঞান প্রযুক্তি আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনকে যেভাবে প্রভাবিত করছে তা ভালো কি মন্দ এক কথায় বলা মুশকিল। কেউ যদি মাঝিদের জীবিকা হারানোর দুঃখে বিগলিত হয়ে ব্রিজ নির্মাণের বিপক্ষে হয়, সেটিও বিতর্কের কারণ হিসেবে চিহ্নিত হবে। সংগত কারণেই একটি প্রশ্ন জাগে, বিজ্ঞান প্রযুক্তি যে পরিবর্তন আনে জীবনযাপনে আচরণে, তা গ্রহণযোগ্য কি গ্রহণযোগ্য নয়? এটা কীভাবে নির্ধারিত হবে বা নির্ধারিত হয়?

পাঁচশ বছর আগে স্পেনের একজন বিজ্ঞানী বাষ্পচালিত নৌযান আবিষ্কার প্রায় করে ফেলেছিলেন। বিজ্ঞানী স্পেনের রাজাকে গিয়ে তাঁর গবেষণার কথা বললেন। বিজ্ঞানী আরও বললেন, বাষ্পচালিত নৌযানটি আবিষ্কৃত হলে, এত অসংখ্য ক্রীতদাস দিয়ে জাহাজ চালাবার আর দরকার হবে না। মনুষ্য শ্রমের বদলে যন্ত্রের ইঞ্জিন জহাজ চালাবে তখন। রাজা একটা হিসেব নিকেশ করলেন, যন্ত্র দিয়ে জাহাজ চালানোর খরচ আর প্রায় নামমাত্র খরচে ক্রীতদাস দিয়ে জাহাজ চালানোর মধ্যে। রাজা দেখলেন, মনুষ্য শ্রমিক, প্রায় বিনামূল্যের ক্রীতদাস দিয়ে জাহাজ চালানোই উত্তম, কেননা তুলনামূলকভাবে খরচ কম। রাজার সিদ্ধান্তে বিজ্ঞানী নিরাশ হলেন। বাষ্পযান আবিষ্কারের গবেষণায় বিজ্ঞানী হতোদ্যম হয়ে গেলেন তখনকার মতো। অবশ্য তার অনেককাল পরে বাষ্পচালিত নৌযান আবিষ্কৃত হয়েছে সমকালীন প্রয়োজনে। সম্ভবত ক্রীতদাসদের দাম বেড়ে গিয়েছিল তখন। একসময় ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধও হয়ে যায়।

মূল কথাটা হল, বিজ্ঞান প্রযুক্তি জীবনযাপনকে প্রভাবিত করবে কি করবে না তার সম্মতি বা অসম্মতির দায় নির্ভর করে সমকালীন অর্থনীতির উপর। আবেগ বা ভাবাবেগ সেক্ষেত্রে কখনই অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে না। প্রস্তাবিত বিবর্তনে যদি দেখা যায় লাভ বেশি, ক্ষতি কম — তবে তা হবেই। নইলে নয়।

মরা ইঁদুর ও উদ্যোগপতি

একটি নিঃস্ব রিক্ত যুবক মগধের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে সকাল থেকে। মগধ হল রাজধানী এবং সে সময়ের বর্ধিষ্ণু বাণিজ্যকেন্দ্র। দেশের বড়ো বড়ো শ্রেষ্ঠীরা মগধে বাণিজ্যসূত্রে বসবাস করেন। যুবকটি দেহাত থেকে মগধে এসেছে জীবিকান্বেষণে। তার মূলধন হিসাবে কিছুই নেই — নিজস্ব বলতে আছে শুধু শ্রম এবং বুদ্ধি। শ্রম এবং বুদ্ধি সম্বল করে যুবকটি মগধে এসেছে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য। কিন্তু মগধ একটি কঠিন জায়গা, এখানে যে কোনও একটা উদ্যোগ নিলেই কম হোক বেশি হোক মূলধন বা পুঁজির দরকার। কপর্দকশূন্য যুবকটি তাই সকাল থেকে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ভাবছে আর ভাবছে — কী করা যায়।

এমন সময় মগধের একজন শ্রেষ্ঠী রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। তাঁর সামনে পেছনে অর্থী প্রার্থীদের ভিড়। শ্রেষ্ঠী হাসলে এরাও হাসে। শ্রেষ্ঠী অসন্তুষ্ট হলে এরাও অসন্তুষ্ট হওয়ার ভান করে। কাছাকাছি এলে যুবকটি দেখল, অর্থী এবং প্রার্থীদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠীকে চলতে চলতে বলল, আপনি একটা পথ বাৎলে দেবেন বলেছিলেন, যাতে স্ত্রী-পুত্রদের নিয়ে দুবেলা দুমুঠো খেয়ে-পরে বাঁচতে পারি। দয়া করে বলে দিন, আমি কী করি, কী দিয়ে শুরু করি।

শ্রেষ্ঠী সহাস্যে বললেন, কিছু একটা শুরু করতে চাও তো, শুরু করে দাও। আটকাচ্ছে কোথায়? লোকটি বলল, কী দিয়ে প্রথম শুরু করব, সেটাই কিন্তু বুঝতে পারছি না।

ভ্রূ কুঞ্চিত করে শ্রেষ্ঠী বললেন, শুরু করার আবার কী বা কিন্তু আছে নাকি? যে কোনও একটা কিছু দিয়েই শুরু করা যায়। তুমি শুরু তো করো, তারপর আমাকে বোলো। লোকটি হতাশ হয়ে বলল, আমি হেঁয়ালি অতশত বুঝি না। দয়া করে স্পষ্ট করে বলুন, প্রথমে আমি কী দিয়ে শুরু করব। শ্রেষ্ঠী কিঞ্চিৎ বিরক্ত হলেন। তাকিয়ে দেখলেন, রাস্তার পাশে একটা বড়োসড়ো ইঁদুর মরে পড়ে আছে। শ্রেষ্ঠী পাশ ফিরে লোকটার দিকে তাকিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বললেন, ওই দেখো, একটা মরা ইঁদুর, এটা দিয়েই শুরু করা যেতে পারে। চেষ্টা তো করো একটা।

লোকটা মলিন হেসে বলল, আমি গরিব বলে আমার সঙ্গে রসিকতা করছেন। আপনি ধনী, বড়লোক। আপনি অঢেল অর্থোপার্জন করেছেন, অথচ আমাকে কীভাবে সহজে টাকা পয়সা করতে হয় তা খুলে বলছেন না। একটা মরা ইঁদুর দেখিয়ে আমাকে আপনি এড়াতে

চান। আপনি মসকরা করছেন আমার সঙ্গে।

শ্রেষ্ঠী বললেন, আরে না, না। মসকরা কেন করব? আমি যা বলতে চেয়েছি, তা হল ক্ষুদ্র তুচ্ছ বলে কোনও ব্যাপার নেই। ভাগ্য পরিবর্তন করার জন্য একটা মরা ইঁদুরও তুচ্ছ নয়। তুমি যদি চেষ্টা না করতে চাও, ভিন্ন কথা। তুমি অলস। কিন্তু কেউ চাইলে, এই মরা ইঁদুরটি দিয়েই ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা করতে পারে।

কথা বলতে বলতে শ্রেষ্ঠী সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে দূরে গিয়ে দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেলেন। নিঃস্ব যুবকটি ওদের কথাবার্তা সব শুনেছিল। সে ভাবল, মগধের এত বড়ো একজন শ্রেষ্ঠী, তিনি যখন বলেছেন এই মরা ইঁদুরটিকে দিয়ে শুরু করা যায় তখন নিশ্চয়ই কিছু করা যায়। শ্রেষ্ঠী তো আর এলেবেলে লোক নন। তিনি যখন বলেছেন তখন নিশ্চয়ই তার মধ্যে সত্যতা আছে। এগিয়ে এসে যুবকটি তখন মরা ইঁদুরের লেজটি আঙুল দিয়ে ধরে তুলে ধরল। মৃত ইঁদুরটি ঝুলে রইল মাথা নিচু করে। যুবকটি ভাবতে লাগল, এখন কী করি! শুরু তো করলাম কিন্তু তারপর? যুবকটি মৃত ইঁদুরটিকে নিরালম্ব ঝুলিয়ে রেখে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ।

পথ চলতি লোকজন কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে দেখছে তারপর আবার চলে যাচ্ছে। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল অন্য একজন ধনবান ব্যক্তি। তার কোলে ছিল একটি আদরের বেড়াল। হঠাৎ বিড়ালটি ঝাঁপ দিয়ে যুবকটির হাত থেকে ইঁদুরটিকে ছিনিয়ে নিল। ধনবান লোকটি ঘটনার আকস্মিকতায় খুবই বিড়ম্বিত হল। থলে থেকে একটা স্বর্ণমুদ্রা বের করে ক্ষতিপূরণ হিসেবে যুবকটির হাতে গুঁজে দিয়ে বিড়ালটিকে কোলে করে নিয়ে চলে গেল। ইতিমধ্যে বিড়ালটি ইঁদুরটিকে গলাধঃকরণ করে ঢেঁকুর তুলছে। যুবকটির বিস্ময়ের সীমা নেই। মরা ইঁদুরের পরিবর্তে তার হাতে একটি স্বর্ণমুদ্রা। শুরুটা তাহলে ভালোই হয়েছে। তারপর যুবকটি সেই স্বর্ণমুদ্রাটিকে বিনিয়োগ এবং বারবার বিনিয়োগ করে কিছুকালের মধ্যেই মগধের শ্রেষ্ঠীদের মধ্যে অন্যতম ধনবান শ্রেষ্ঠী বনে গেল। যুবকটি প্রৌঢ় হল। মগধের শ্রেষ্ঠীকুলের মধ্যে সে একদিন নাম্বার ওয়ান হল। খুঁজে খুঁজে সেই পুরোনো শ্রেষ্ঠীকে বের করে তার পায়ের কাছে স্বর্ণমুদ্রার থলে রেখে প্রণাম করল সে। শ্রেষ্ঠী তাকে দেখে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সসম্ভ্রমে বললেন, এগুলো কী?

সে বলল, আপনি বলেছিলেন, যা কিছু দিয়েই শুরু করা যায়। এমনকি মরা ইঁদুর দিয়েও। আপনার হয়তো মনে নেই। আমি আপনার উপদেশ-নির্দেশমতো চলেছি। এটা দক্ষিণা, আপনি দয়া করে গ্রহণ করুন।

এটি একটি জাতকের গল্প। আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে আমি, 'আন্ত্রেপ্রিউনের ডেভেলাপমেন্ট প্রোগ্রামে' প্রায়ই যাই। অংশগ্রহণকারী তরুণ তরুণী ভবিষ্যতের উদ্যোগপতিদের

কাছে জাতকের গল্পটি বলি। গল্পটি শুধুমাত্র গল্প নয়, তারও অধিক। আমি গল্পটির মাধ্যমে সবাইকে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করি। ব্যক্তিগত পর্যায়ে অনেকেই উদ্যোগপতি হয়ে ভাগ্য বদলাতে আগ্রহী। ইদানীং রাজ্য সরকারগুলোও রাজস্ব বাড়ানোর লক্ষ্যে কিছু একটা করার জন্য প্রতিযোগিতায় নেমেছে।

সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য পদস্থ আমলারা গলদঘর্ম হচ্ছেন। সরকারও একটা সংসারেই মতোই। ওখানেও নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। ত্রিপুরা রাজ্য সরকার সম্প্রতি অর্থোপার্জনের জন্য একটি অভিনব পদ্ধতির প্রচলন করেছিল।

নদীর মালিক সরকার সুতরাং নদীতে বয়ে আনা বালির মালিকানাও সরকারের। সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, আগেকার নামমাত্র মাশুলের পরিবর্তে এখন থেকে প্রতি ট্রাক বালির জন্য মং পাঁচ টাকা অতিরিক্ত মাশুল দিতে হবে। এতে সরকারের রাজস্ব বেড়ে যাবে বহুগুণ। মরা ইঁদুরের মতো বালিও ফাঁকতালে অর্থোপার্জনের একটি নিশ্চিত উপায় হতে পারে। বালির ঠিকাদার এবং বাড়ি নির্মাণের জন্য বালি ব্যবহারকারীদের সরকারি সিদ্ধান্তে স্বার্থ বিঘ্নিত হবার উপক্রম হয়েছিল। রাজ্য সরকারের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঠিকাদারদের একাধিকবার মিটিং করার ফলশ্রুতিতে শেষপর্যন্ত বালির ওপর থেকে অত্যধিক মাশুল তুলে নেয়া হয়েছে। তাতে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে অনেকে। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার সময় একটা গুরুতর প্রসঙ্গ নাকি ফিরে ফিরে এসেছে। সরকার যেহেতু বালির মালিক, বালির জন্য দাম বা মাশুল চাইতে পারে। তবে বন্যার সময় নদী থেকে প্লাবিত বালি যে অনেক শস্যক্ষেত্র ঢেকে শস্যের হানি ঘটায়, তার জন্য বালির মালিক হিসেবে সরকার চাষিকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে তো? সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তে মনে হয়, সরকার বালির জন্য অতিরিক্ত দামও নেবে না। ক্ষতিপূরণ দিতেও বাধ্য থাকবে না।

পদচিহ্ন

অনেকদিন পর লিখতে বসেছি আজ। এক নির্মম পথ দুর্ঘটনায় কিছুদিন আগে আমার জীবন সংশয় হয়েছিল। সেদিন রাত্রি নটা সোয়া নটায় স্কুটারে বাড়ি ফিরছিলাম। শহরের লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ির কাছে একটা ক্রসিংয়ে ছোট রাস্তা থেকে বড় রাস্তায় ধেয়ে আসছিল একটা মোটর সাইকেল। বেপরোয়াভাবে দুরন্ত গতিতে ছুটে আসছিল বাইকটি। পাশ থেকে প্রচণ্ডভাবে আমার ধাবমান স্কুটারটিকে আঘাত করলে আমি ছিটকে পড়ি। জ্ঞান হারিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় পথের ধারে পড়ে যাই আমি। পথিপার্শ্ব থেকে লোকজন ছুটে এসে কালবিলম্ব না করে প্রথমে আমাকে গাড়ি করে আই জি এম হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে সেখান থেকে ঐ রাত্তিরে ওরা আমাকে পৌঁছে দেন জি বি হসপিটালে। আমাদের বাড়িতেও দুর্ঘটনার খবর সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে দেয়া হয়। খবর পেয়ে আমার স্ত্রী, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনেরা হাসপাতালে ছুটে যান। গভীর রাত্রিতে ডাক্তারবাবুদের নিরলস এবং অক্লান্ত চিকিৎসার ফলে আমি এ যাত্রায় বেঁচে যাই।

আমাদের গতানুগতিক জীবনযাত্রায় অনাত্মীয়দের মহানুভবতার দৃষ্টান্ত খুব একটা দেখি না। দেখলেও না দেখার ভান করে থাকি। আমরা মূলত ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর। দুর্ঘটনায় পতিত হবার পরে আমার যা অভিজ্ঞতা তা এতদিনকার ধারণাতে চিড় ধরিয়েছে। সেদিন যদি পথচারীরা আমাকে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে নিয়ে না যেতেন তবে আমার প্রাণসংশয় অনিবার্য ছিল। ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও স্বার্থপরতার ঊর্ধ্বে উঠে তাঁরা তা করেছেন বলেই আমি বস্তুত পুনর্জন্ম পেয়েছি। তাঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। হাসপাতালের চিকিৎসকদের প্রতি আমি জানাই আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা। আলাদা করে কারোর নাম উল্লেখ করছি না বলে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। অচেনা সজ্জন পথচারী, নিবেদিত ডাক্তার, নার্স, শুভানুধ্যায়ী আত্মীয়স্বজন সবার শুভেচ্ছায় এবং আশীর্বাদে আমি সুস্থ হয়ে ফিরে এসেছি।

সদ্য সমাপ্ত বইমেলায় আমার কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়েছে। আমাকে এক বন্ধু বুকের মধ্যে জাপ্টে ধরে বলল, তোমাকে দেখে কী ভালো যে লাগছে আমার। আমি শুনেছিলাম, তুমি নাকি মারা গেছ।

অনাবিল হাসি হেসে আমি বললাম, তোমাদের সবাইয়ের শুভেচ্ছায় এ যাত্রায় বেঁচে গিয়েছি। তারপর নিচু গলায় বললাম, আসল কথাটা হল এক্ষুনি সেখানে কোনও ভ্যাকান্সি বা খালি নেই। তাই ফিরে চলে এসেছি।

অন্য এক বন্ধু আমার কথা শুনে হাসতে হাসতে বলল, তুমি টিকিট কি খোদ কাউন্টার থেকে কাটোনি? ট্রাভেলিং এজেন্টের কাছ থেকে কেটেছিলে? একবার আমি বাসে করে গৌহাটি যাব বলে ট্রাভেলিং এজেন্টের কাছ থেকে টিকিট কেটেছিলাম। বাসে উঠে দেখি নির্দিষ্ট সিটে অন্য একজন যাত্রী আগে থেকে বসে আছে। আমার টিকিট নাকি ডুপ্লিকেট, জাল। আসল কাউন্টার থেকে কাটিনি তো, তাই। সেবার আমার গৌহাটি যাওয়া হয়নি।

জীবনের পথের বাঁকে কখনও কখনও আমাদের জন্য মৃত্যু গা ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে থাকে। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে সৌভাগ্যক্রমে আমরা উদ্ধারও পেয়ে যাই। কেন পাই — তার কোনও ব্যাখ্যা নেই। এ বিষয়ে একটি অলৌকিক গল্প আমার জানা আছে। গল্পটি আমার খুব প্রিয়। একাধিকবার গল্পটি আমি উল্লেখ করেছি এখানে-সেখানে। তা সত্ত্বেও আবারও প্রসঙ্গত এখানে বলার লোভ সংবরণ করতে পারছি না।

তখন আমি আমেরিকায়। সেখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পি এইচ ডি ডিগ্রির জন্য গবেষণায় নিযুক্ত। 'থ্যাংক্স্ গিভিং ডে' উপলক্ষে একটি আমেরিকান পরিবারে ছিল আমার মধ্যাহ্নভোজের নিমন্ত্রণ। আমেরিকানেরা প্রতিবছর নির্দিষ্ট চব্বিশ নভেম্বর দিনটিতে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানায় — মনুষ্যজাতির প্রতি ঈশ্বরের অপার করুণা, দয়া এবং মহানুভবতার জন্য। চব্বিশ নভেম্বরকে তাই বলে 'থ্যাংক্স্ গিভিং ডে'। নভেম্বর মাস মানে সেখানে প্রচণ্ড শীতের সময়। আমেরিকার যেখানে আমি ছিলাম সেখানে তখন অবিরাম বরফ পড়ছে। বাইরে বিরামহীন বরফপাত হলেও ঘরের ভেতরে উষ্ণতার কোনও কমতি ছিল না। সারা বাড়ি জুড়ে কেন্দ্রীয় উষ্ণতাপ নিয়ন্ত্রণের মেশিনটি নিশ্চয়ই চালু রাখা হয়েছিল। পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে ডাইনিং টেবিলের চারপাশে বৃত্তাকারে রাখা একটি চেয়ারে বসে আছি। আমার পাশেই রেফ্রিজারেটর। তার গায়ে চুম্বক দিয়ে এটা সেটা টুকিটাকি সেঁটে রাখা হয়েছে একটা ছোট্ট মুদ্রিত গল্পও ক্লিপিং দিয়ে লটকে রাখা হয়েছে সেখানে। গল্পটার নাম 'ফুট প্রিন্টস্' — 'পদচিহ্ন'। খাবার পরিবেশনের ফাঁকে আমি ষোলো সতেরো লাইনের গল্পটি গোগ্রাসে পড়ে ফেললাম। গল্পটি পড়ে আমার মনে হল, আজ পর্যন্ত জীবনে যত গল্প পড়েছি বা বাকি জীবনে আরও যত গল্প পড়ব — এটি হল নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ।

গল্পটি এই রকম ঃ একটা লোক ঈশ্বরের সঙ্গে একটা লিখিত চুক্তি করল। চুক্তির শর্তানুসারে, ঈশ্বর সারা জীবন ধরে লোকটির পাশে থাকবেন। কখনও তাকে একা ফেলে রেখে কোথাও যেতে পারবেন না। ঈশ্বর সেই চুক্তিপত্রে সই করলেন।

লোকটা একসময় প্রৌঢ় এবং যথাসময়ে বৃদ্ধ হল। একদিন লোকটির মনে হল, দেখি তো পরখ করে ঈশ্বর চুক্তিমতো তাঁর কথা রেখেছেন কিনা? অর্থাৎ সবসময় ঈশ্বর সঙ্গে ছিলেন তো? জীবনের চলার পথে সমুদ্রের বালুকাবেলায় পেছন ফিরে তাকাল সে। তাকিয়ে দেখল, ফেলে আসা জলসিক্ত বালিরাশিতে পাশাপাশি দুজোড়া পায়ের ছাপ দেখা গেলেও মাঝে মাঝে শুধুমাত্র এক জোড়া পদচিহ্ন দেখা যাচ্ছে। তার মানে হল, ঈশ্বর কখনও কখনও তাকে একা ফেলে রেখে চলে গিয়েছিলেন। ঈশ্বর কথা রাখেননি। লোকটি কষ্ট পেল। তার দুঃখ হল, ঈশ্বরের চুক্তিভঙ্গের জন্য। ঈশ্বর লোকটির মনের কথা বুঝতে পেরে সামনে হাজির হয়ে বললেন, বাছা, আমি আমার কথা রাখিনি, এটা ঠিক না। দুজোড়ার বদলে এক জোড়া পায়ের ছাপ মানে এই নয় যে আমি তখন তোমাকে ত্যাগ করে চলে গিয়েছি। সংসারে চলার সময় মাঝে মাঝে তোমার জীবনকে দুঃসময় এসে গ্রাস করেছিল, তখন আমি তোমাকে কোলে তুলে বুকের ভেতর আগলে রেখে পথ চলেছিলাম।

ওগুলো আমার পায়ের ছাপ। আমি চুক্তির খেলাপ করিনি। আমি আমার কথা সবসময় রেখেছি। এ গল্পটি আমার কাছে শুধুমাত্র একটি নিছক গল্প নয়। গল্পের চেয়েও অধিক। সংসারে আমি যখন দুঃসময়ে নিমজ্জিত হই — আমি নিশ্চিত জানি, কেউ আমাকে কোলে তুলে বুকের মধ্যে আগলে রেখেছে।

বিচিত্র এই সংসার

সংসার একটি বিচিত্র জায়গা — এখানে না পাওয়া যায় এমন কিছু নেই। মূল্য দিতে রাজি থাকলে সংসারে সবই পাওয়া যায়। আমাদের এতকালের ধারণা ছিল, টাকা দিয়ে সব কিছু পাওয়া যায় না। অপত্য স্নেহ বা দুঃখের ভাগীদার হওয়া ইত্যাদি আর যাই হোক, অর্থের বিনিময়ে কেনাকাটা করা সম্ভব নয়। কথাটা ঠিক আবার ঠিক নাও।

আসলে ব্যাপারটা হল এরকম — যখন কোনও একটা দ্রব্য বা সামগ্রীর যোগান খুব অঢেল, না চাইতেই পাওয়া যায়, তার কোনও বাজার দাম হয় না। উল্টোদিকে যে জিনিসটা সরবরাহ স্বল্পতার জন্য চাহিদার তুলনায় কম, সেক্ষেত্রে দামের আবির্ভাব ঘটে। মূল্য দিয়ে

জিনিসটাকে পেতে হয়। জলের কথা ধরা যাক। জলের যোগান অঢেল ছিল যখন, তখন জল বিনামূল্যে পাওয়া যেত। এখন পানীয় জলের যোগান আর অঢেল নয়, তাই এখন জল কিনতে হয়। জলের জন্য মূল্য দিতে হয়। এক লিটার দুধের দাম যেখানে দশ টাকা বারো টাকা, সেখানে বোতলবন্দী এক লিটার জলের দাম পনেরো টাকা। বস্তুত এখন জল দুধের চেয়ে দামি।

জল বা দুধের দামের মধ্যে আহামরি বা নূতনত্ব কিছু নেই। এটাই স্বাভাবিক — এরকম না হওয়াটাই ব্যতিক্রম। উন্নত দেশগুলো, জাপান বা আমেরিকা, এসব ব্যাপারে আরও উন্নত বা এগিয়ে আছে। সেখানে অপত্য স্নেহ বা পিতার প্রতি কর্তব্য ইত্যাদি কিনতে বা বেচতে পারা যায়। বৃদ্ধ পিতামাতার পুত্র-কন্যারা বাইরে বিদেশে থাকে। মা-বাবার ইচ্ছে হল পুত্র এবং পুত্রবধূ নাতি-নাতনিরা এসে কিছুদিন একসঙ্গে কাটিয়ে যাক। তখন হয়তো প্রকৃত পুত্র-পুত্রবধূর আসার সময় নেই, তাহলে কী হবে? কুছ পরোয়া নেই। জাপানে কিছু প্রতিষ্ঠান আছে তারা চাহিদামাফিক পুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্রপৌত্রী সরবরাহ করে থাকে। ছেলে বউমা কী রকম আগে বললে মোটামুটি কাছাকাছি ধাঁচের ছেলে-বউমা ওরা সরবরাহ করে। নকল ছেলে-বউমা আসল বাবা-মার কাছে আসার আগে নিজেদের মধ্যে রিহার্সাল দিয়ে নেয়। বৃদ্ধ বাবা-মা সম্পর্কিত তথ্য তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হয়। ধরা যাক, জাপানি বৃদ্ধ বাবা -মার একমাত্র পুত্র কুরুসোয়া এবং পুত্রবধূ ইয়ামিহি থাকে আমেরিকার ফিলাডেলফিয়ায়। তারা সেখানে চাকরি করে। এখন ছুটি নেই বলে আসতে পারছে না। কোম্পানি-প্রেরিত তরুণ তরুণী দম্পতিটি কুরুসোয়া-ইয়ামিহির অভিনয় করবে। জাপানি ভাষায়, আই লাভ ইউ ড্যাড, আই লাভ ইউ ম্যাম বলবে যখন-তখন। পুত্র যা খেতে ভালোবাসত, আগে থেকে জেনে তরুণটি খাবে বলে আবদার করবে। বৃদ্ধা মা কাঁপা কাঁপা হাতে সে রান্নাটি যত্ন করে বানিয়ে রেখে দেবে। সজল চোখে পুত্রের প্লেটের দিকে খাবারের বাটিটি বাড়িয়ে দিয়ে বলবে, বাছা, আরও একটু দিই। পুত্র বলবে, আর দিয়ো না মাগো। তুমি কি আমাকে ভুঁড়িদার সুমো বানাতে চাও?

কয়েকদিন হাসি কান্নায় বৃদ্ধবৃদ্ধাকে আপ্লুত করে তরুণ-তরুণীটি তাদের প্রাপ্য অর্থ বুঝে নিয়ে চলে আসবে। তারপর অপেক্ষা করবে, আবার কবে ডাক আসবে। এবার হয়তো অন্য পরিবারে, সেখানে পুত্র-পুত্রবধূর অন্য নাম — ইয়ামানে এবং মরিয়ামা। জাপানে অবশ্য প্রয়োজনে দাদু-দিদিমাও ভাড়া পাওয়া যায়। শহরে চাকুরিরত পুত্রের বাবা-মা থাকে গ্রামে — অনেক দূরে। তাছাড়া শহরের আবাসনে থাকার জায়গা কম — সেখানে বুড়ো বাবা-মাকে এনে রাখা যায় না। পুত্র এবং তার স্ত্রী দুজনেই চাকরি করে বলে খুদে বাচ্চাটিকে তারা ক্র্যাশে বা নার্সারি স্কুলের হেফাজতে রেখে যায়। এইসব শিশুরা তাদের ঠাকুমা-দিদিমা, ঠাকুর্দা-

দাদুভাইদের মিস করে। তাদের বাল্যকাল নিরানন্দে ভরা থাকে। জাপানে অনেক শক্ত সমর্থ দাদুভাই-দিদিমা আছেন, যারা চাকরিবাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন, কিন্তু এখন সময় কাটছে না। তারা কোম্পানির মাধ্যমে যোগাযোগ করে, কোনও একটি পরিবারে এসে সারাটি দিন থেকে শিশুদের কাছে দাদুভাই-দিদিমার অভিনয় করে যান। বিনিময়ে কিছু অর্থ উপার্জন হয় আর সময়টাও ভালো কাটে। বিদেশের কথা বলে আর লাভ নেই। যান্ত্রিকতা তাদের জীবন থেকে সুকুমার মানবিক গুণগুলোকে দ্রুত মুছে দিচ্ছে। অনেকে বলেন, আমাদের দেশে ভাগ্যিস এখনও এই ইয়াংকি সভ্যতা আসেনি। আমরা এখনও আমাদের সনাতন ধ্যানধারণাকে নিয়ে সাংসারিক জীবনযাপন নির্বাহ করতে পারছি। আমরা অনেক কথা বলি আবার অনেক কথা বলি না। আমাদের দেশে প্রিয়জন মারা গেলে ভাড়াটে কাঁদুনিয়া পাওয়া যায়। মহাশ্বেতা দেবীর গল্প নিয়ে ভূপেন হাজারিকা পরিচালিত চলচ্চিত্র 'রুদালি' তারই নির্মম সাক্ষ্য বহন করছে। আসলে আমরা জাপানিদের চেয়ে কোনও অংশে কম নই।

এটা অবশ্য কম-বেশির ব্যাপার না। — এটা হল যা — তাই। অর্থনীতিতে জাপানি, মার্কিনী এবং ভারতীয়ের মধ্যে কোনও তফাৎ নেই। মোদ্দা কথাটা হল, টাকা দিয়ে প্রায় সবই করায়ত্ত করা সম্ভব।

হাস্যরসিক আমার এক বন্ধু জানালেন, টাকা দিয়ে সবই করা সম্ভব, এটা ঠিক না। দন্তমঞ্জনের টিউব থেকে একবার বের হয়ে যাওয়া অতিরিক্ত টুথপেস্ট কোনোভাবেই আর টিউবের ভেতর ফেরত পাঠানো যায় না। শত টাকা দিয়েও না।

অগ্রাধিকার

ভূমিপুত্র কথাটি এখন খুব প্রচলিত হয়েছে। সম্ভবত 'সন অব দি সয়েল' ইংরেজির বাংলা হল ভূমিপুত্র। যদিও শব্দটিতে পুত্রদের কথা বলা হয়েছে, এই শব্দবন্ধে পুত্রীদেরও বোঝায়। স্থানীয় পুত্র-কন্যাদের অধিকার এবং বঞ্চনার প্রসঙ্গে সাধারণত ভূমিপুত্র কথাটি উচ্চারিত হয়ে থাকে। ভূমিপুত্রী শব্দটি আলাদাভাবে এখনও চালু হয়নি। রামায়ণের জনক রাজার কন্যা সীতাকে ভূমি কর্ষণ করতে গিয়ে পাওয়া গিয়েছিল — প্রকৃত অর্থেই সীতা ছিলেন ভূমিপুত্রী। সেই সুবাদে কন্যা সন্তানদের ভূমিপুত্রী অভিধায় ভূষিত করলে যথাযথ হয়। আগেকার সময়ে সন্তানেরা মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিতে অবতরণ করে ভূমিষ্ঠ হত। গ্রামের বাড়িতে 'অশৌচ' ঘরের খড়-বিচালি পাতানো মাটির মেঝেতে ভূমিষ্ঠ হয়েই যন্ত্রণায় নীল হয়ে কেঁদে উঠত ওঁয়া-ওঁয়া করে। এখন দিনকাল বদলেছে। সন্তানের জন্ম আর সেরকমভাবে অশৌচ বলে গণ্য করা হয় না। নবজাতক-জাতিকারা এখন আর ভূমিষ্ঠ হয় না, হাসপাতালের বা নার্সিংহোমের স্বাস্থ্যসম্মত পরিসরে টেবিলস্থ হয়। জন্মলগ্নে আর যাই হোক, অন্তত ভূমির সঙ্গে তাদের কোনও সংযোগ হয় না। বড় হয়েও অনেকে এমন জীবনযাপন করে যে তাদের মাটিতে পা পড়ে না। সুতরাং আক্ষরিক অর্থে ভূমিপুত্র বা ভূমিপুত্রী যে কারা সে সম্পর্কে সংশয় থেকে যায়। চাহিদা এবং যোগানের মধ্যে ভারসাম্যের অভাবের ফলে বেকার সমস্যা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। স্থানীয়ভাবে বা কোনও নির্দিষ্ট অঞ্চলে অল্পস্বল্প কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা দেখা দিলেই, দাবি উঠছে, ভূমিপুত্রদের চাকরিতে অগ্রাধিকার দিতে হবে। ভূমিপুত্রেরা যদি নিজের জায়গাতেও চাকরিবাকরি না পায়, তবে কোথায় যাবে তারা?

চাকরি এবং সরকারি চাকরির মধ্যে তফাত আছে। লোকে বলে, এদেশে একবার সরকারি চাকরি পেলে, রিটায়ার না করলে এবং মারা না গেলে সরকারি চাকরি কারোর যায় না। চাকরির নিরাপত্তা এক্ষেত্রে হিন্দু সধবার শাঁখা-সিঁদুরের মতো স্থায়ী এবং অক্ষয়। কিন্তু সবার ভাগ্যে তো আর সরকারি চাকরির শিকে ছেঁড়ে না। তাই বেশিরভাগ কর্মপ্রার্থীকে বেসরকারি কর্মসংস্থানের পানে তাকিয়ে থাকতে হয়। সেখানে চাকরিতে তাকেই নিয়োগ করা হয় বা হয়ে থাকে যাকে দিয়ে সুচারুভাবে কাজটা হবে এবং খরচ হবে তুলনামূলকভাবে কম। এক্ষেত্রে

অন্য কোনও বিশেষ কারণ বা যোগ্যতা বিবেচনার মধ্যে আসে না। স্বজাতি বা আত্মীয়তা বা আঞ্চলিকতা কোনও কিছুই কর্মসংস্থানের মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত হয় না।

সংসারে অবিবাহিত পিসি এম এস সি পাশ। চাকরি-বাকরি নেই। বিয়ে হওয়ার সম্ভাবনাও কমছে দিন দিন — তার সময় কাটছে না। ভাইঝি এ বছর জয়েন্ট এন্ট্রান্স দেবে। তার পড়া দেখিয়ে-টেখিয়ে দিতে হয়। কিন্তু না, জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় ভালো করার জন্য তাকে পাঠাতে হয় অধ্যাপক দে বা অধ্যাপক পালের বাড়িতে। বাবা তাকে স্কুটারে দিয়ে আসে, নিয়ে আসে। প্রায়শই অফিসে দেরি হয়ে যায়। বাবা — ভাগ্যিস সরকারি চাকুরে বাবা, তাই বাঁচোয়া। সময়ের টানাটানি, প্রাইভেট ট্যুইটরের মাইনে, অন্যান্য খরচ একদিকে, অন্যদিকে পিসি বিনে পয়সায় পড়াবে ঘরে বসে। তবু পিসির কাছে পড়ানো হয় না কেন? কারণ একটাই — পিসির কাছে পড়লে জয়েন্ট এন্ট্রান্স না পাওয়ার সম্ভাবনা শতকরা শতভাগ। আর বাইরের স্বনামধন্য ট্যুইটরের কাছে পড়লে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পেলেও পাওয়া যেতে পারে। এই পাওয়া যাওয়ার সম্ভাবনার জন্য বাবা খরচ করতে বা বিনিয়োগ করতে রাজি — সেক্ষেত্রে আত্মীয়তা বা খরচ কম এগুলো ধর্তব্য নয়। ঘর বা সংসারের মধ্যেই ভূমিপুত্র বা ভূমিপুত্রীর ব্যাপারটা আসে না, বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে অর্থনীতির অঙ্কের হিসেবটা অন্যরকম হয় কীভাবে?

অঙ্ক একটাই — সম্ভাব্য আয় এবং ব্যয়ের মধ্যে বিয়োগফল। যদি দেখা যায় সম্ভাব্য আয়ের চেয়ে ব্যয় কম, তাহলে কাজটা হবে। যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ হলেও। আর যদি এমন হয় যে সম্ভাব্য আয়ের চেয়ে আখেরে ব্যয়ের পরিমাণ অধিক — তা হলে প্রকল্পটি কখনোই বাস্তবায়িত হবে না, পশ্চাতে যতই ভূমিপুত্র বা ভূমিপুত্রীর মতো শক্তিশালী এক বা একাধিক কারণ থাকুক না কেন। এটা সত্যি সর্বক্ষেত্রে। কৃষিতে, শিল্পে — যেকোনও কর্মসংস্থানের বেলায়। জীবন এবং অর্থনীতি আলাদা কিছু নয়। অর্থনীতির সাদামাটা হিসেব মেনেই চলে জীবন সাধারণত। খুব একটা ব্যতিক্রম দেখা যায় না। তবে জীবন যে অর্থনীতির চেয়ে বড় — সে কথা আমি মানি।

একবার, বেশ কয়েক বছর আগের কথা, আগরতলার একটি পাড়ার দেওয়ালে হাতে লেখা একটা পোস্টার পড়েছিল। আমি পোস্টারটি দেখিনি, তবে বন্ধুদের কাছে পোস্টারটির বক্তব্য শুনেছি। পোস্টারটিতে লেখা ছিল, পাড়ার মেয়ে শাশ্বতীর বিয়েতে পাড়ার ছেলে শুভেন্দুকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

আমি শাশ্বতীকে চিনি না, চিনি না শুভেন্দুকেও। ভূমিপুত্র এবং ভূমিপুত্রীর মধ্যে বিয়ের মালা শেষ পর্যন্ত বিনিময় হয়েছিল কিনা আমার জানা হয়নি। তবে এটা আমি জেনেছিলাম পোস্টারটির মারফত, যে জীবন নিষ্প্রাণ অর্থনীতিরও অধিক।

জীবনের অঙ্ক

পত্রিকায় মাঝে মাঝে নজরে পড়ে, আমি অমুক, এখন থেকে আমি তমুক বলে পরিচিত হলাম। এরকম বিজ্ঞাপনে কেউ নাম বদলায়, কেউ বা বদলায় পদবি আবার কেউ বা নামের মধ্যপদ পরিবর্তন বা বিলোপের কথা ঘোষণা দেয়। কেন যে লোকজন নাম, পদবি বদলায় — এটা আমার কাছে একটা প্রশ্ন। আমি তার উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছি। পত্রিকার বিজ্ঞাপনে অবশ্য অনেক সময় একটা দুটো কারণের উল্লেখ থাকে। যেমন, বাল্যকালের স্কুলের কাগজপত্রে ভুল করে কোনও এক ছাত্রীর নাম মহামায়া ছাপা হয়েছিল, আসলে তিনি এখন শুধু মায়া বলে পরিচিত হতে চান। এটা কি শুধু মায়ার খেলা? জন্মাবার সময় পিতৃদত্ত নাম অনেকের পছন্দ নয়। তারা পরে নিজেদের পছন্দমতো সেকেলে নামটি বদলে আধুনিক একেলে একটি নাম গ্রহণ করে। অনেকে অবশ্য ইদানীং নামের সঙ্গে পদবি লিখতে চায় না। পদবি লিখলেই ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ ইত্যাদি পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ে। কখন কোন্ পরিচয় যে কাজ দেবে কে জানে। তাই আগে থেকে জাতপাতের পরিচয় জানিয়ে লাভ কী। সুকুমার রায়ের একটি কবিতার বিখ্যাত একটি লাইন হল, 'গোঁফের আমি গোঁফের তুমি, গোঁফ দিয়ে যায় চেনা।' কিন্তু মজার ব্যাপার হল, রাশিয়ায় এবং অন্যান্য কয়েকটি দেশে একসময় গোঁফ-দাড়ি রাখলে 'ট্যাকসো' দিতে হত। সরকারের এরকম ফতোয়া জারির ফলে গোঁফ-দাড়ি রাখার হিড়িকে পুরুষ পুঙ্গবদের ভাঁটা পড়েছিল। অনেকে সেদিন নিজেকে বুঝিয়েছিলেন, পুরুষমানুষ পুরুষমানুষই, গোঁফ রাখা না রাখার সঙ্গে তার কী সম্পর্ক।

এফিডেভিটের মাধ্যমে নাম-পদবি বদলানোর পশ্চাতে একটা অর্থনৈতিক কারণ আছে বলেই মনে হয়। এমন হতে পারে, এতদিন নাম পদবি না বদলানোর জন্য কিছু না কিছু ক্ষতি হচ্ছিল। বদলানোর ফলে সেটা রুখতে পারা গিয়েছে। আবার এমনও হতে পারে, নাম-পদবি বদলালে লাভ হতে পারে এই প্রত্যাশায় গাঁটের পয়সা খরচ করে আদালতে এফিডেভিট করে পত্রিকায় পয়সা দিয়ে বিজ্ঞাপন দেবার প্রবণতা বাড়ছে। এমনিতে চাকরি-বাকরির বাজার খুব খারাপ তবে উপজাতি এবং তপশিলি জাতির তরুণ-তরুণীদের জন্য কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে কিছুটা ভালো। যদি সরকারি আইন মোতাবেক এফিডেভিট করে অ-উপজাতি বা অ-তপশিলি জাতির কেউ উপজাতি বা তপশিলি জাতিভুক্ত হতে পারে, তবে পত্রিকা

বিজ্ঞাপনের বন্যায় ভেসে যেত। সংরক্ষিত কোটায় সরকারি চাকরির শেষপ্রান্তে এসে অনেক সময় জানা যায় কর্মচারীটি আদৌ অনগ্রসর জাতি বা উপজাতি গোষ্ঠীভুক্ত নয়। মুশকিল হল, একজন মানুষ প্রকৃত কোন্ পদবি বা কোন্ গোষ্ঠীর লোক কী করে জানা যাবে? এর জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক ডি এন এ টেস্ট ছাড়া অন্য সবরকম শর্তাবলীকে ফাঁকি দিয়ে উলঙ্ঘন করা সম্ভব।

আমি তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি — সে প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার কথা। গিরি বলে একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী অফিসে কাজ করত। অফিসের ফাঁকে ক্যান্টিন চালাত সে। আমাদের ভীষণ ভালোবাসত গিরি। গিরি তার নাম নয়, গিরি হল পদবি। গিরি ছিল উড়িষ্যার লোক। ক্যান্টিনে গিরি চা, ওমলেট বানাত। সেই চা, ওমলেটের স্বাদ এখনও আমার জিভে লেগে আছে। এম এ পাশ করে এসে প্রায়শই আমাকে কাজে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হত। আমাদের আগরতলার তখনকার পোস্ট গ্র্যাজুয়েট সেন্টারটি ছিল ক্যালকাটা য়ুনিভার্সিটির অন্তর্গত।

কলকতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে একদিন তাকে দেখে আমি জিজ্ঞেস করি, গিরি, তুমি কেমন আছ?

জিভ কেটে তার মুখ আমার কানের কাছে এনে ফিসফিস করে সে বলল, দাদাবাবু, আমাকে গিরি বলে ডাকবেন না। আমি নন্দী।

আমি আকাশ থেকে পড়লাম — এ কী কাণ্ড। আমার এত চেনা গিরি এখন নন্দী হয়ে গেল! কিছুক্ষণের মধ্যেই সব জানা গেল। তার কাছে শুনলাম, পদবি পরিবর্তনের ইতিকথা। রহস্য তখন উন্মোচিত হল। অনেক বছর আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস ফোরের চাকরির একটি অফার উড়িষ্যার গ্রামে যায়। নাম এক হলেও পদবি ভিন্ন। আরও নিশ্চয়ই কিছু ভিন্ন ছিল — সেটা ধর্তব্যের মধ্যে ছিল না। সেদিনকার ওড়িয়া এক যুবা গিরি পদবি নিয়ে চাকরিতে যোগ দেয়। তারপর কেটে যায় দীর্ঘ অনেকগুলো বছর। এক সময় এই গিরি তার প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে লোন নেয়। ঋণ পরিশোধ না করায় সুদে-আসলে বেড়ে বহুগুণ হয়ে যায়। ঋণ আদায়ের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গ্রামের বাড়ির ঠিকানায় রেজিস্ট্রি ডাকে চিঠি পাঠায়। সে চিঠি গিয়ে হস্তগত হয় আসল গিরির হাতে। তার চক্ষু চড়ক গাছ। চাকরিই সে করে না — তার আবার প্রভিডেন্ট ফান্ড কী বস্তু! মোটে মা রাঁধে না — তপ্ত না পান্তা? আসল গিরি চিঠি নিয়ে সশরীরে হাজির হওয়ার পর ক্যান্টিনওলা এতকালের গিরির সব ফাঁস হয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য ছিলেন অর্থনীতির অধ্যাপক। সম্ভবত তিনিও গিরির ক্যান্টিনের চা-ওমলেট খেয়েছেন। গিরি ছিল সবার প্রিয় আপনজন। ক্রেতাদের কাছ থেকে সে ধার আদায় করতে কখনই কঠিন কঠোর হত না। আমি যতদূর জানি, তখন ধারে

খেয়েছেন বা ঋণ শোধ করেননি এমন অনেকেই এখন উচ্চপদে আসীন। ভারতের প্ল্যানিং কমিশনে কর্তব্যরত অনেক অর্থনীতিবিদ আছেন যারা গিরির কাছে ঋণমুক্ত নন।

যাই হোক, ছাত্র অধ্যাপক সবাইয়ের অনুরোধে, উপাচার্য তাকে ক্ষমা করে দেন এবং নন্দী নামে তাকে নতুনভাবে একটি অস্থায়ী চাকরিতে নিয়োগ করেন। ঘটনাচক্রে তখনই তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।

দীর্ঘদিন বাদে নন্দী ওরফে গিরির সঙ্গে কলকাতায় আবার দেখা। বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছে সে — তাও অনেকদিন হল।

আমি হেসে বললাম, তুমি কেমন আছ, নন্দী।

না দাদাবাবু, আপনি আমাকে গিরিই বলুন। আপনাদের কাছে আমি গিরিই ছিলাম, গিরিই আছি। নন্দী ছিলাম শেষের দিকে শুধু চাকরির খাতিরে।

আসলে গিরিই নন্দী, নন্দীই গিরি। জীবনটাও সেরকমই। সেখানে কখনও লাভই ক্ষতি আবার ক্ষতিই লাভ। বস্তুত লাভ-ক্ষতির অঙ্কের অন্য নামই হল জীবন।

হাঁপানিয়ার দেশ

বিগত শতাব্দীর সত্তর দশক ছিল এক উত্তাল সময়। সেদিনের অনেক তরুণ যুবা ভেবেছিলেন, সত্তর দশক মুক্তির দশক হবে। এজন্য অনেক অমূল্য জীবনও বিসর্জিত হয়েছে। বিপ্লব এবং বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে একটা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে বলে তখন দাবি করা হয়েছিল। দেয়াল লিখনে বলা হয়েছিল, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন। বিশ্বযুদ্ধ বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করবে। অথবা ইতিমধ্যে বিপ্লব সংঘটিত হলে বিপ্লব বিশ্বযুদ্ধকে রুখবে। দেয়াল লিখন সত্যি হয়নি। সব দেয়াল লিখন সত্যি হয় না। সত্তর দশক মুক্তির দশক হয়নি। সত্তর দশক ছাড়াও আরও তিনটি দশক ইতিমধ্যে পার হয়েছে। না হয়েছে বিশ্বযুদ্ধ, না বিপ্লব।

ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে যদি কেউ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোয় যে আগামী দিনে বিপ্লবের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে, তাহলে বোধহয় ভুল বলা হবে না। তবে বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা

রয়েছে। ছোটোখাটো যুদ্ধ প্রতিনিয়তই লেগে আছে। যে কোনও অজুহাতে পৃথিবীটা দুভাগে ভাগ হয়ে যেতে পারে এবং দুটি পরস্পরবিরোধী পক্ষ মারণাস্ত্র নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারে। বিভীষিকা এবং হত্যায় আসন্ন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ আগের দুটি বিশ্বযুদ্ধকে লজ্জা দেবে বলে বিশ্বাস। পৃথিবীর শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর অস্ত্রাগারে এত বহু মারণাস্ত্র মজুত আছে যে, এই পৃথিবীকে সেই অস্ত্রসম্ভার দিয়ে একশবার ধুলোয় মিশিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারা যায় অবলীলায়। পণ্ডিতেরা বলেন, কোনও অবস্থাতেই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যুদ্ধটা যদি হয়, তবে তা হবে জল নিয়ে।

একসময় যুদ্ধ হত শত্রুপক্ষের ভৌগোলিক অঞ্চল দখল করে ফেলার জন্য, বা ধনসম্পদ লুণ্ঠন করার জন্য। কিন্তু পণ্ডিতদের বিবেচনায় তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধবে পৃথিবীর জলসম্পদের ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে। পৃথিবীতে যত সম্পদ আছে, তার মধ্যে জল হল শ্রেষ্ঠ সম্পদ। একসময় জলের অবশ্য দাম বা মূল্য ছিল না — এখন জলও দুর্মূল্য হয়েছে। এক লিটার দুধের দাম দশ টাকা যেখানে, সেখানে বোতলবন্দী এক লিটার জলের দাম পনেরো টাকা। দুধের চেয়ে জল দামি। এখন যেমন পেট্রোল পাম্প স্টেশান থেকে পেট্রোল কিনতে পাওয়া যায় লিটার হিসেবে, এমন দিন আর আসতে দেরি নেই যখন ওয়াটার পাম্প স্টেশান থেকে লোকজন পানীয় জল কিনবে লাইনে দাঁড়িয়ে।

জলসম্পদের নিরিখে একটি রাষ্ট্র ধনী না গরিব — তা নির্ধারিত হবে। মধ্যপ্রাচ্যের মরুধূসর রাষ্ট্রগুলোর কিছুই নেই, মাটির নিচের তেল ছাড়া। এই তেলের রপ্তানিকে তারা কমিয়ে বাড়িয়ে বিশ্বের বাজার-অর্থনীতিকে ওঠবোস করায়। অবশ্য তেলের যোগানও ফুরিয়ে এল বলে। নীরবে জল তেলের আধিপত্যকে হটিয়ে নিজের স্থান দখল করে নিচ্ছে। এখন যে দেশে জলসম্পদের আধিক্য, সে দেশ নিঃসন্দেহে ধনাঢ্য রাষ্ট্রগুলোর অন্যতম বলে বিবেচিত হবে।

নদীমাতৃক দেশ ভারতবর্ষ। জলের সুবাদে ভারতের দারিদ্র্যের কালিমা মুছবে বলে মনে হয়। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে রয়েছে জলের অঢেল যোগান। এখানে বয়ে যাচ্ছে ব্রহ্মপুত্র নদ। আমাজন নদী ব্যতীত, পৃথিবীর অন্য কোনও নদী দিয়ে এত জল বয়ে যায় না। এখন উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে অপরিশোধিত তেল যায় বারাউনি অবধি পাইপ দিয়ে। অদূর ভবিষ্যতে এ অঞ্চল থেকে পাইপ দিয়ে জল যাবে ভারতের অন্যান্য মরুধূসর এলাকায়। স্রেফ জল বিক্রি করে বা জলের রয়্যালটি দিয়ে অনুন্নত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোতে উন্নয়নের প্লাবন বয়ে যাবে তখন। বেশ কয়েক বছর আগে আমি গুজরাতে গিয়েছিলাম। রাজধানী আমেদাবাদ থেকে যাত্রা শুরু করে লিমড়ি, জামনগর, দ্বারকা, পোরবন্দর, ভেরাবল (সোমনাথ) এবং জুনাগড় হয়ে আবার আমেদাবাদ সফর শেষে ফিরে এসেছি। সেই যাত্রাপথে আমার

একটি চমৎকার অভিজ্ঞতা হয়েছিল। প্রসঙ্গত তা বলার লোভ সংবরণ করতে পারছি না।

দীর্ঘ যাত্রাপথের এখানে সেখানে, আমাদের গাড়ি থেমেছে, তখন আমি জানতে চেয়েছি, 'পাশের গ্রামের কী নাম?' আমাদের দেখভাল করছিলেন যিনি, তিনি জানালেন, গাঁয়ের নাম নাপানিয়া। পরে যখন একবার রেলওয়ে ক্রসিংয়ে গাড়ি থেমেছে, পথিপার্শ্বের দোকান থেকে চা খেতে খেতে একই প্রশ্ন করেছি, 'এই এলাকাটির কী নাম?' ভদ্রলোক শুষ্ক কণ্ঠে বললেন, এই গ্রামটিরও নাম নাপানিয়া। আমি অবাক, এদিককার সব গ্রামগুলোর একই নাম — নাপানিয়া। এরকম কেন? ভদ্রলোক তখন জানালেন, এ গ্রামগুলোতে জলের অভাব। এখানে জল পাওয়া যায় না। তাই এগুলোর নাম না-পানিয়া। গুজরাতি মায়েরা বিবাহযোগ্যা মেয়ের উপর কোনও কারণে রেগে গেলে বলেন, তোকে নাপানিয়া গ্রামে বিয়ে দেব। তখন বুঝবি মজা, দুঃখ কাকে বলে।

ভদ্রলোককে আমি অবাক করে দিয়ে বললাম, জানেন, আমাদের আগরতলার কাছে একটি শহরতলি আছে তার নাম হল হাঁপানিয়া। হাঁ-পানিয়া? তার মানে ওখানে অনেক জল পাওয়া যায়? ভদ্রলোকের বিস্ময়ের সীমা নেই। তিনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন, হাঁপানিয়া বলে কোনও নাম হয় নাকি?

'হয়'। নাপানিয়া নাম হলে হাঁপানিয়াও নাম হয়।

আমি হাসতে হাসতে বললাম।

বস্তুত আমাদের সমগ্র ত্রিপুরাই হাঁ-পানিয়া। প্রকৃতি এখানে অঢেল জলসম্পদ দিয়েছে। এই জলসম্পদ ব্যবহার করে এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত জল রাজ্যের বাইরে রপ্তানি করে আমরা অদূর ভবিষ্যতে উন্নত রাজ্যগুলোর অন্যতম রাজ্য বলে পরিগণিত হব। আমাদের ঘরের বিবাহযোগ্যা মেয়েদের ভিন্ গ্রামে বিয়েতে দুঃখ থাকবে না। আমাদের ঘরের ছেলেদের ভবিষ্যত হবে সমৃদ্ধময়। এগুলো সবই হবে প্রাকৃতিক অঢেল জলসম্পদের সুবাদে।

ভেঙে মোর ঘরের চাবি

গাছের নিচে গাছ হয় না। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। বড়ো গাছের তলায় বড়ো গাছ হয় না। সংসারও এর ব্যতিক্রম নয়। পরিবারের কেউ যদি উচ্চ বা অধিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হয়, তবে অন্য সদস্যেরা তার সমকক্ষ হতে পারে না। হতে পারে না বা কার্যকারণে তাকে হতে দেয়া হয় না।

পিতা-পুত্র-কন্যা-স্ত্রী-ঠাকুরদা-ঠাকুরমা নিয়ে যে একান্নবর্তী সংসার — সেখানে উচ্চশির বৃক্ষটি কে? সাধারণত খুব একটা ব্যতিক্রম না হলে, পিতাই সেই ব্যক্তিত্ব এবং সংসারের কর্তা। তিনিই উন্নতশির বৃক্ষ, তার কথাই সংসারে চলে। কেন একমাত্র তারই কথা চলে, পরিবারের অন্যদের কথা কেন চলে না? সম্ভবত পিতা বয়োজ্যেষ্ঠ, বিবেচক এবং দায়িত্বশীল। কথাটা ঠিক আবার ঠিক নয়ও। ঠাকুরদা অর্থাৎ পিতার পিতা — তিনিও তো আরও বয়োজ্যেষ্ঠ, আরও বিবেচক এবং আরও দায়িত্বশীল। একসময় তিনি সংসারের কর্ণধার ছিলেন — আজ যিনি সংসারের কর্তা, যার কথায় আজ সংসারের সব কিছু চলছে, তিনি ছিলেন একসময় অর্বাচীন নাবালক। সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছে ঠাকুরদার কাছ থেকে পিতার হস্তে। ঠাকুরদার বয়স হয়েছে বলে, পিতা সেক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছেন, এটা একটা যুক্তি বটে। কিন্তু এটাই একমাত্র এবং অকাট্য যুক্তি নয় — যুক্তি হতে পারে না। পরিবারের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু পরিবর্তিত হয়েছে, পিতামহের কাছ থেকে পিতার কাছে সরে এসেছে। তার আসল কারণটি হল, পিতা এখন উপার্জনশীল। সংসারের ভার তার স্কন্ধে এবং তার উপার্জনের অর্থ দিয়ে পরিবারটি চলছে।

পরিবারে কার কথা চলে? শেষ কথাটি কে বলে, সিদ্ধান্ত কে নেয় — এর একটাই উত্তর — কে আবার — যার উপার্জনের আয় দিয়ে সংসার চলে, সে। এক সময় ঠাকুরদার কথা চলত, এখন চলে না এজন্য নয় যে তিনি বুড়ো হয়ে গিয়েছেন, এজন্য যে তিনি এখন আর অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী নন।

রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত গানের প্রথম লাইনটি হল, "ভেঙে মোর ঘরের চাবি / নিয়ে যাবি / কে আমারে ...।" অনেকে অবশ্য রসিকতার ছলে সমালোচনা করে বলেন, চাবি

ভেঙে ঘরের কখনও কিছু চুরি হয় না। চোরেরা চুরি করে তালা ভেঙে। রবীন্দ্রনাথের লেখা উচিত ছিল — 'ভেঙে মোর ঘরের তালা / বাসন থালা / নিয়ে যাবি ...' এরকম ছন্দোবদ্ধ পঙ্‌ক্তি — যার অর্থ আছে, মানে হয় কিছু। সাংসারিক বিষয়বুদ্ধি সম্পর্কে কবিরা যে কত অনভিজ্ঞ রবীন্দ্রনাথ তার উজ্জ্বল উদাহরণ।

চেষ্টা করলে রবীন্দ্রনাথের 'ভেঙে মোর ঘরের চাবির' একটা সাংসারিক আটপৌরে ব্যাখ্যা দেয়া যায়। এখানে ঘরের চাবি বলতে কবি সম্ভবত বোঝাতে চেয়েছেন, ঘর মানে সংসার ঘরের চাবি অর্থাৎ সংসারের চাবি। এখন প্রশ্ন হল, সংসারের চাবি মানেটা কী? সংসারের চাবিটা কার হাতে থাকে? এই প্রশ্নের উত্তর আমরা আগে উল্লেখ করেছি, সংসারের চাবিটা থাকে যখন যার উপার্জনের আয়ে সংসার চলে তার কাছে। এটা হাতবদল হয়। পিতামহ থেকে পিতা — পিতা থেকে পুত্রের হাতে। বয়স এখানে গৌণ এবং অবান্তর। চাবি মানে আর্থিক ক্ষমতা। আর্থিক ক্ষমতা চুরি হয়ে যেতে পারে এ ভয়টা সব সময়ই আমাদেরকে তাড়া করে। এজন্যই চাকরির শেষে পেনশন এবং স্থায়ী আয়ের নিশ্চয়তার জন্য এত আইঢাই।

লক্ষ্মী বড় চঞ্চলা। ইদানীং ঘরের চাবি হস্তগত করার একটা নীরব প্রতিযোগিতা নারীদের মধ্যেও এসেছে। সংসারের আয় বা উপার্জনের উৎস হিসেবে তাদের অবদানও কম নয়। অনেক 'ঘরের চাবি' এখন উপার্জনশীল স্ত্রীর কাছে। তার কথাই শেষ কথা সংসারে। এতে অবাক হবার কিছু নেই। অর্থনৈতিক ক্ষমতা বস্তুত লিঙ্গ নিরপেক্ষ — নারী পুরুষ ভেদাভেদ জ্ঞান তার কাছে নেই।

স্বামীদের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক ক্ষমতার কাছে স্ত্রীরা এতকাল ম্রিয়মাণ ছিল। এখন দ্রুত বদলাচ্ছে চিত্র। সংসারে স্বামী মহীরুহের তলায় স্ত্রীবৃক্ষেরা বিকশিত হতে পারছিল না। গাছের নিচে গাছ বড়ো হতে পারে না বলে স্ত্রী শক্তি উন্মেষিত হতে পারছিল না। নিজের যোগ্যতার ফলে স্ত্রীরা সংসারের চাবি নিজের হাতে নিয়ে নিচ্ছে। তাতে ভালোই হচ্ছে, মন্দ হবার কোনও অকাট্য প্রমাণ নেই। স্বামীর অকালমৃত্যুর পর অনেক সময় বিধবা স্ত্রীর ওপর সংসারের দায়িত্ব বর্তায়। স্ত্রী যদি উপার্জনশীল হয় বা ডাই-ইন-হারনেসের সুবাদে একটা চাকরি পায় — এই স্বল্প আয় দিয়ে সংসারটি সুচারুভাবে পরিচালিত হয়। সংসারটি ভেসে যায় না। বিধবার সংসারের পুত্রকন্যারা কঠিন অনুশাসনে লালিত-পালিত হয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এরকম ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত আছে। প্রচণ্ড প্রাণশক্তি থাকা সত্ত্বেও মহিলারা স্বকীয়তায় বড়ো হতে পারে না, বা স্বাবলম্বী হতে পারে না কেননা গাছের নিচে গাছের বড়ো হবার সুযোগ নেই। আমেরিকার একটি সাহেব পরিবারে একবার ডিনারে নেমন্তন্ন ছিল আমার। নৈশভোজের সময় সাহেব তার মেমসাহেব স্ত্রীর সঙ্গে আমাকে এইভাবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল — 'ইনি আমার দ্বিতীয় স্ত্রী এবং আমি তার তৃতীয় স্বামী।'

এক্ষেত্রে ঘরের চাবি মোট পাঁচ পাঁচবার ভাঙা হয়েছে বলে মনে হয়। কেন যেন আমার মনে হল, ক্ষমতায়ন ভালো, কিন্তু এত ভালো, ভালো না।

কর্তাভজার বহর

কর্তাভজা বলে সংসারে একটা ব্যাপার আছে। এটা নতুন কিছু নয়। আগে ছিল, এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে বলে মনে হয়। শুধু এদেশেই নয়, বিদেশেও কর্তাভজা রমরমিয়ে চালু আছে। 'বস্ ক্যান নট বি রং, বস্ ইজ অলওয়েজ রাইট' — এই আপ্তবাক্যটি বিদেশে যত্রতত্র যখন-তখন শোনা যায়। 'বস'-এর বাংলা প্রতিশব্দ হল 'কর্তা'। এটা ঠিক না। সংসারে কর্ত্রীও বস্ হয়। বস্-এর স্ত্রীলিঙ্গ কী আমার জানা নেই। অবশ্য বস্ বস্ই — বস্-এর আবার স্ত্রী বা পুরুষ হয় নাকি?

একবার আমেরিকায় প্রাতঃরাশ করছিলাম এক সাহেব দম্পতির সঙ্গে। সাহেব খুব দশাসই চেহারার, বাহু পেশীবহুল, ঘাড়েগর্দানে দত্যিকায়। এহেন ব্যক্তিটির স্ত্রী মেমসাহেবটি হলেন রোগাশোকা ছোটখাটো শীর্ণকায়া। বিধাতার বিচিত্র খেয়াল — কার কপালে যে কী লেখা থাকে আগে থেকে জানা যায় না, যায় না পড়াও। আমার জন্য আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। ব্রেকফাস্ট টেবিলের উল্টোদিকে রেফ্রিজারেটারের দরজায় একটি সচিত্র স্টিকার জ্বলজ্বল করছিল — আই অ্যাম দি বস্ অব দি হাউস। আই হ্যাভ মাই ওয়াইফ'স পারমিশান টু সে সো।

সংসারে প্রকৃত কর্তা যে কে নিশ্চিত করে বলা খুবই মুশকিল।

কর্তা ভজনা করা — এটা একটা আর্ট। সম্ভবত ভক্তের ভক্তির পরিমাণের সঙ্গে ভজনার একটি সরাসরি সম্পর্ক আছে। ভক্তির পশ্চাতে আছে একটি লাভ-লোকসানের অঙ্ক। বেশি লাভ বা বেশি লোকসানের সম্ভাবনা থাকলে ভক্তির পরিমাণ বেড়ে যায় এবং স্বাভাবিক কারণেই ভজনায় তখন প্লাবন আসে। মোদ্দা কথা হল, কর্তা ভজনায় যদি লাভ না হয় অথবা কর্তা ভজনা না করলে যদি সমূহ লোকসান না হয়, সেক্ষেত্রে কর্তাভজার সংখ্যায় আকাল দেখা দিতে বাধ্য। আসলে আধুনিক বাণিজ্যিক পরিভাষায় কর্তাভজা শব্দটির সমার্থক হল প্যাকেজিং। বাজারে একটি দ্রব্য বিক্রি করতে হলে তার জন্য একটি চকচকে প্যাকেজিং চাই। এসব বাহানা হল ক্রেতাকে আকর্ষণ করার জন্য, তার মনোরঞ্জনের জন্য, সর্বোপরি ক্রেতার তুষ্টির জন্য। এক্ষেত্রে কর্তাভজা মানে ক্রেতা ভজা। দ্রব্যটি যত রদ্দি বা ভুসিমাল হবে — প্যাকেজিং তত চিত্তহারী এবং নয়নমুগ্ধকর হবে। একটা স্নানের সাবানের এমনিতে দাম হওয়া উচিত দুটাকা — কিন্তু বাজারে সুরম্য প্যাকেজিংয়ে সেজে যখন সেটি আসে তখন তার দাম হয় দশ টাকা। প্রতিটি সাবানের টিকিয়ার জন্য অতিরিক্ত আট টাকা করে দিতে হয় স্রেফ প্যাকেজিং বা ক্রেতাভজার জন্য। প্যাকেজিং বলতে শুধুমাত্র রংচং কাগজে মোড়ানো প্যাকেটটির কথা বলা হচ্ছে না — প্যাকেজিং মানে আরও অনেক কিছু। টিভি-র পর্দায় সিনেমার নায়িকা স্বল্প বস্ত্র পরিহিত হয়ে সেই সাবান দিয়ে ফেনিল শুভ্র বাথটাবে গোলাপ পাপড়ির আড়ালে আব্রু ঢাকার বেসামাল ভাব করে সিনান করছে তার জন্য যে টাকা দিতে হয় তাও প্যাকেজিংয়ের খরচের মধ্যে পড়ে। এক্ষেত্রে সাবানের বিজ্ঞাপন শুধুমাত্র সাবানের বিজ্ঞাপন নয় — স্বপ্নের এক অধরা লাইফ-স্টাইলের বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনের মূল বক্তব্য হল, আমাদের এই সাবান ব্যবহার করলে মাধুরী দীক্ষিতের মতো বিলাসবহুল জীবনযাত্রা আপনার নাগালের মধ্যে এসে ধরা দেবে। আমাদের সাবান ব্যবহার করলে আপনার বাড়ি হবে এরকম বাংলোবাড়ির মতো — আপনার বাথরুমটা হবে এই ছবির মতো আর আপনি হবেন মাধুরী দীক্ষিতের মতো। আপনার ত্বকের ঔজ্জ্বল্যে এবং শারীরিক বিভঙ্গে ফ্রিজ হয়ে থাকবে নতজানু অনন্ত যৌবন। তাই দুটাকার সাবান দশ টাকায় না কিনে আপনি যে কী হারাইতেছেন আপনি জানেন না।

আমাদের দেশে বস্, কর্তা এবং স্যার সমার্থক। কাউকে স্যার বলে সম্বোধন করা মানে তাকে বস্ বা কর্তা বলে সম্ভ্রম করা। স্যার স্যার করার পরিমাণ দিয়ে কর্তাভজার পরিমাণের একটা অস্পষ্ট ধারণা করা যায়। বেশি বেশি স্যার মানে বেশি বেশি কর্তাভজা। আগে প্রতিটি বাক্যের শেষে স্যার বলা হত। যেমন, আপনি কেমন আছেন, স্যার! ভালো আছেনতো, স্যার। ইদানীংকালে, কেন জানা যায় না, কর্তাভজা ব্যাপারটা বেড়ে গিয়েছে। এখন আর শুধুমাত্র বাক্যের শেষে স্যার বলা হয় না। প্রতিটি শব্দের পরে পরেই স্যার বলাটা

রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন, আপনি স্যার কেমন স্যার আছেন স্যার। ভালো স্যার আছেন স্যার তো স্যার।

দিনকাল বদলে গেছে বলে কর্তাভজাতেও এসেছে তীব্র প্রতিযোগিতা। কর্তাভজায় তীব্র প্রতিযোগিতা সম্পর্কিত সাম্প্রতিক একটা দৃষ্টান্তের কথা শুনে আমি বিহ্বল হয়ে পড়েছি। এক সময় বাক্যের শেষে স্যার বলা হত, তারপর সময়ের সঙ্গে তাল রেখে প্রতিটি শব্দের শেষে স্যার বলাটা রেওয়াজ হল, এখন নাকি বাক্য নয়, শব্দ নয়, প্রতিটি বর্ণের পরে পরে স্যার কথাটি উচ্চারণ করাটা স্টাইল হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন, কর্তার নাম যদি ত্রিদিববাবু হয়, তবে কর্তাভজা সম্বোধন করবে এভাবে — ত্রি স্যার, দি স্যার, ব স্যার, বা স্যার, বু স্যার। কর্তাভজা এখন এই পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে জেনে পুলকিত না হয়ে উপায় নেই।

বাজারে একটি দ্রব্য বা সামগ্রী যত ওঁচা বা ভুসি হবে, ক্রেতাকে গছানোর জন্য তার প্যাকেজিং তত উগ্র এবং লাস্যময় হবে এটা মোটামুটি ধরে নেয়া যায়। তবে কর্তা, না কর্তাকে ভজনা করছে যে সে, এই দুব্যক্তির মধ্যে কে বেশি অপদার্থ বা ভুসিমাল হলে তবে স্যার স্যারের প্যাকেজিংয়ের আর্তরব বেশি বেশি হবে তা হলফ করে কিছু বলা যায় না।

ঘরের মানুষ অমল চৌধুরী

বাইরে গিয়ে দেশের মানুষকে পেলে মনটা প্রসন্নতায় ভরে যায়। মুম্বাই আমি আগে অনেকবার গিয়েছি, কিন্তু সাম্প্রতিক মুম্বাইয়ে কর্তব্য উপলক্ষে গিয়ে আমাদের ঘরের আপনজন অমল চৌধুরী মহাশয়ের সান্নিধ্যে আমার হৃদয়মন খুশিতে প্লাবিত হয়েছে।

কিছুদিন আগে অমলবাবু একটি পারিবারিক বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে মুম্বাই থেকে আগরতলায় এসেছিলেন। বিবাহোৎসবটি ছিল তাঁর ভাগ্নি মধুরিমা এবং ভাগ্নি-জামাতা হাবুল ভট্টাচার্যের আত্মজের। রাজবাড়ির চন্দ্রমহলে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। মাত্র স্বল্প সময়ের মধ্যে কুশল সম্ভাষণ শেষে তিনি আমাকে একান্ত আপন করে নিয়েছিলেন। সংসারে কিছু লোক আছেন, যাঁদের সঙ্গে পরিচয় হলেই মনে হয় তিনি যেন কতকালের চেনা এবং

নিকট আত্মীয়ের একজন। অমল চৌধুরী সেরকমই একজন বিরল ব্যক্তিত্ব। প্রাথমিক পরিচয়ের কিছুদিনের মধ্যেই আমার মুম্বাইয়ে আসার সুযোগ এসে যায়। মুম্বাই এসে যোগাযোগ করতেই তিনি আমাকে তাঁর স্বভাবজ আন্তরিক উষ্ণতায় কাছে টেনে নেন।

মুম্বাইয়ের সবচেয়ে অভিজাত অঞ্চল আরব সাগরের পারে আকাশচুম্বী অট্টালিকায় তাঁর ফ্ল্যাট। তাঁর বাসস্থানের ডানদিকে স্বনামধন্য কচ্ছ রাজার দরিয়ামহল আর বাম পার্শ্বে মহারাষ্ট্রের বর্তমান উপমুখ্যমন্ত্রী ছগনলাল ভুজবলের প্রাসাদোপম বাড়ি। আরব সাগরের অন্তহীন উর্মিমালা আছড়ে পড়ছে এসে হর্ম্যমালার প্রাঙ্গণে। অমলবাবুর ষোলো তলার আবাসনের পশ্চিমের জানালা খুলতেই আরবসাগর যেন ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতর হুড়মুড় করে। অমলবাবু জানালেন, কেউ যদি সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ঐ পারে পৌঁছোয় তাহলে সে পৌঁছে যাবে সোজা মাদাগাস্‌কার দ্বীপে।

অমলবাবুর এখন বয়স পঁচাশি। তবে তিনি স্বাস্থ্য উজ্জ্বলতায় যে কোনও যুবককেও হার মানান। কয়েক বছর আগে তাঁর স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে। বর্তমানে তাঁর পুত্র সপরিবারে বিদেশে থাকে। একমাত্র কন্যা থাকে মুম্বাইয়ে তাঁর নিজের সংসার নিয়ে। আরব সাগরের মুখোমুখি অমলবাবু বসে থাকলেও তাঁর মনটা পড়ে থাকে আগরতলা আর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ধূলিধূসর মেঠো পথে, খালেবিলে ঝোপেঝাড়ে। তিনি স্বচ্ছন্দে ফিরে যান তাঁর বাল্যকালে। তাঁর পিতামহ অসিত চৌধুরী ছিলেন রাজন্য আমলের ত্রিপুরার দেওয়ান। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে তাঁর জন্ম। ছোটবেলায় ফুটবল খেলতে হেঁটে চলে আসতেন আগরতলায়। ভারত সরকারের বৃত্তি পেয়ে ইংল্যান্ডের ম্যাঞ্চেস্টারে দুবছর উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য কাটিয়েছেন। ম্যাঞ্চেস্টার দলে তাদের জার্সি গায়ে দিয়ে ফুটবল খেলেছেন সেখানে। বর্ণাঢ্য জীবন অমলবাবুর। ভারত সরকারের 'অফিস অব দ্য টেক্সটাইলস্ কমিশনার'-এ তিনি ডিরেক্টর পদে দীর্ঘ দশ বছর ১৯৫৫ থেকে ১৯৬৫ সাল অব্দি বৃত ছিলেন। এখনও উপদেষ্টা হিসেবে দেশি-বিদেশি বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আছেন। মূলত তিনি বস্ত্রশিল্প বিশেষজ্ঞ। সেই সুবাদে আমেদাবাদ, গোয়ালিয়র এবং ওড়িশার টেক্সটাইলস্ ইন্ডাস্ট্রিতে উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। ভারতের বস্ত্রশিল্পের আজকের এই উন্নয়নের পশ্চাতে তাঁর অবদান অস্বীকার করার নয়।

এত বড়োমাপের মানুষটির মনটা কিন্তু শিশুর মতো। অল্পতেই উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েন। আগরতলার কথা উঠলেই তিনি স্মৃতিতাড়িত হয়ে ফিরে যান ফেলে আসা অতীতে। পুরোনো আগরতলার ছবি ফুটে ওঠে তাঁর চোখের সামনে চলচ্চিত্রের মতো। দীর্ঘকাল বাইরে বাইরে আছেন, কিন্তু মনটা পড়ে আছে এখানে।

অমলবাবুর ফ্ল্যাট জুড়ে রয়েছে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের ছবি। তার পাশেই রয়েছে অন্য একটি ছবি — যে ছবিতে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনুসের সঙ্গে তিনি স্বয়ং। অমলবাবু

জানালেন, চার্চিল এবং ইউনুসের তিনি অনুরাগী। তাঁর মতে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় চার্চিল ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী না থাকলে পৃথিবীর ভূগোলের মানচিত্র আজকে অন্যরকম হত। চার্চিলের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা এবং অনমনীয় ব্যক্তিত্ব ভৌগোলিক মানচিত্রকে পরিবর্তিত হতে দেয়নি। বাংলাদেশের ইউনুসও এমন একজন ব্যক্তিত্ব যিনি কোনও অংশেই চার্চিলের চেয়ে কম নন। চার্চিল পৃথিবীর ভৌগোলিক মানচিত্র বদলাতে দেননি বহু বিঘ্ন সত্ত্বেও; অন্যদিকে ইউনুস বহু বাধা সত্ত্বেও পৃথিবীর অর্থনৈতিক মানচিত্র বদলাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এ কাজে অনেকাংশে ইউনুস সফলও হয়েছেন। শান্তির জন্য তাঁর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি তারই স্বীকৃতি। অনুজ ইউনুসকে ঢাকায় তাঁর বাড়িতে গিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়ে এসেছেন তিনি। আমি শুনেছি, অমলবাবু ঘনিষ্ঠ কয়েকজনের কাছে তাঁর মনের একটি ইচ্ছের কথা ব্যক্ত করেছেন, তাঁর ফ্ল্যাটটিকে একটি অতিথিশালায় রূপান্তরিত করতে চান। ত্রিপুরা বা এদিককার কেউ যদি প্রয়োজনে মুম্বাই যান, তবে সেটিকে আশ্রয় বা ঠিকানা হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন। মুম্বাই এক আজব জায়গা। সেখানে পদে পদে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। অমল চৌধুরীর মতো একজন হৃদয়বান ব্যক্তি স্বয়ং আশ্রয় এবং অবলম্বন হিসেবে সেখানে উপস্থিত, ভাবতেই বুকে বল এবং ভরসা জাগে।

তিন প্রজন্ম

আমার মা বৃদ্ধা, আমি প্রৌঢ় এবং আমার পুত্র যুবা। সম্প্রতি পুত্র এবং পুত্রবধূ বিদেশ থেকে আগরতলায় এসেছে। তিন প্রজন্ম এখন আমরা মুখোমুখি। আবার বউমা, আমার স্ত্রী এবং আমার মা অর্থাৎ বউমা, শাশুড়ি এবং শাশুড়ির শাশুড়ি — তিন নারী প্রজন্মের মিলনও কম চিত্তাকর্ষক নয়।

একদিন আমি শুনতে পেলাম, আমাদের বউমা হাসি হাসি মুখে তার শাশুড়িকে কী যেন বলছে। অনধিকার চর্চা হলেও দূর থেকে যতটা অংশ সম্ভব উদ্ধার করতে পেরেছি, তা উল্লেখ করার লোভ সংবরণ করতে পারছি না।

বউমা বলছে, মা, আপনার ছেলে সংসারের এখানের কুটো ওখানে সরায় না। আপনি

নাকি তার সবকাজ আপনার নিজের হাতে করে দিতেন। সংসারের কোনও কাজ করতে শেখাননি। তাকে আপনি 'স্পয়েল' করেছেন।

হাসিহাসি মুখে বউমা ঐ কথাগুলো তার শাশুড়িকে বললেও আমার শুনে কষ্টে বুক ভেঙে যাচ্ছিল। পুত্র সংসারের দায়িত্ব-সচেতন নয়, অকর্মণ্য — এসব কথা শুনলে কোনও বাপ-মায়েরই খুশি হবার কথা নয়। যেহেতু বউমা-শাশুড়ির মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছে, আমার সেক্ষেত্রে কিছু বলা ঠিক না বলে আমি চুপ করে রইলাম। তবে উৎকণ্ঠিত হয়ে আমি আশায় বুক বেঁধেছিলাম এই ভেবে যে, শাশুড়ি-মার তরফ থেকে এখন একটি জোরালো প্রতিবাদ হবে। হা হতোস্মি। আমাকে প্রচণ্ড নিরাশ করে শাশুড়ি তার বউমার উদ্দেশ্যে বলল, আমার পুত্র আর কী, দায়িত্বজ্ঞানহীন! তোমার শ্বশুরমশাইয়ের এ ব্যাপারে তুলনা হয় না। আমার শাশুড়ি-মা তার পুত্রকে যে কী বস্তু বানিয়েছেন, একমাত্র তিনিই জানেন। গত তিরিশ বছরেরও বেশি তাকে নিয়ে কীভাবে সংসার করছি একমাত্র তা আমি জানি আর জানে অন্তর্যামী। বাইরে থেকে কিছু বোঝার উপায় নেই। যে যাকে নিয়ে ঘর করে সে জানে কত ধানে কত চাল। দ্বিতীয় প্রজন্মের শাশুড়ি এবং তৃতীয় প্রজন্মের বউমা খুব কাছাকাছি চলে এল। এদের দুজনের মুখে মৃদু হাসি ছড়িয়ে পড়ল। দুঃখেকষ্টে আমার সরমে মরে যাবার যোগাড়। আমি এখন কোথায় যাই? অনেক ভেবেচিন্তে আমি আমার অশীতিপর বৃদ্ধা মার কাছে গেলাম। মার বিরুদ্ধে আমার ক্ষোভের শেষ নেই। ছোটবেলায় মার আস্কারার জন্যই স্ত্রীর কাছে আমাকে এত কথা শুনতে হচ্ছে — তাও বউমার সামনে। আমার আর মানসম্মান বলে কিছু রইল না। অনেক রাগ এবং অভিমান নিয়ে মাকে আমি বললাম, তুমি আমাকে এমন কী বস্তু বানিয়েছ যে, সংসারে আমি অচল। আমাকে ছোটবেলায় নিজের হাতে সব করতে দিলে না কেন, তাহলে আজ এরকম হত না। আজকে তাহলে বউমার সামনে আমাকে হেনস্তা করে তোমার বউমা পার পেত না।

নীরবে মা হেসে বলল, আমি সেদিন তোর সবকিছু করে দিয়েছি নিজের কথা ভেবে। তুই যখন ছোট্ট ছিলিস তখন তোর হাগা-মুতো পরিষ্কার করেছি। করেছি এই আশায়, বৃদ্ধ বয়সে আমি যখন অথর্ব হয়ে যাব, তখন তুই আমার দেখভাল করবি।

মৃদু প্রতিবাদ করে বললাম, আমি এই যুক্তি মানি না। দ্বিতীয় প্রজন্মের শাশুড়ি এবং তৃতীয় প্রজন্মের বউমা এগুলো কেন তবে বুঝছে না। তারা কি একদিন বুড়ো হবে না তোমার মতো? আমাকে অবাক করে দিয়ে আমার মা বলল, না, তারা কোনোদিন আমার মত অসহায় বৃদ্ধ হবে না। তাছাড়া তাদের প্রজন্মের সঙ্গে আমার সময়কালের মিল নেই। মার হেঁয়ালি আমি বুঝতে না পেরে বলি, সেটা আবার কী রকম?

'জীবন এখন সম্পূর্ণ অন্যরকম। আমাদের মতো নয়। বাচ্চার হাগামুতো এখন মায়ের আর পরিষ্কার করার দরকার নেই। আজকালকার বাচ্চারা হাগিসে হাগে। হাগার পর প্যান্তালুন সুদ্ধু ফেলে দেয় মায়েরা। মায়েদের আর ভাবনা কী? বাচ্চারা নিজে নিজে সব শিখে বড়ো হয়ে যায়।' নিজের সব কিছু ছোটোবেলা থেকে নিজে করে বলে তারা পরে আর কারোর ওপর নির্ভরশীল হয় না। হয় না পরমুখাপেক্ষীও। তারা হয় স্বাবলম্বী এবং স্বনির্ভর। স্বভাবতই শাশুড়ি বা বউমার কাছে কখনওই হেনস্তা তাদেরকে হতে হবে না।' মাকে থামিয়ে আমি আবার আমার পুরোনো প্রশ্নে ফিরে গেলাম, তারা কি একদিন বুড়ো হবে না তোমার মতো? দৃঢ়তার সঙ্গে মা বলল, না। তারা বুড়ো হবে না কোনওদিন। বুড়ো মানে কী — বুড়ো কি কেবল বয়স দিয়ে হয়? এমন অনেক যুবক আছে যারা বুড়োর চেয়েও অধম। আবার এমন অনেক বুড়ো আছে যারা যে কোনও যুবাকে হার মানায়।'

মার বক্তব্যের সারার্থঃ বার্ধক্যের একটি সংজ্ঞা হল সচলতার অভাব এবং পরনির্ভরতা। কেউ যদি কোনোভাবে বার্ধক্যেও চলমান থাকে এবং হয় স্বনির্ভর — তাকে বৃদ্ধ বলা যায় না। এক্ষেত্রে পুত্র-কন্যাদের কাছে বৃদ্ধ বয়সে প্রত্যাশা করার ব্যাপারটাও তত প্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ণ নয়। আজকে যারা তরুণ এবং যুবা তারা যখন তথাকথিত বার্ধক্যে পৌঁছুবে, তখন তারা প্রকৃত অর্থে বুড়ো হবে না কোনোমতেই। আধুনিক চিকিৎসা এবং প্রযুক্তির সুবাদে তারা আর পরনির্ভর হবে না। দারিদ্র্যও অকাল বার্ধক্যের অন্যতম কারণ। অনেক কারণে দারিদ্র্যও হ্রাস পাচ্ছে দ্রুত। অদূর ভবিষ্যতে দারিদ্র্য 'শূন্য' স্তরে পৌঁছুবে বলে অনেকের দৃঢ় বিশ্বাস। সংসারের সর্বস্তরে প্রগতি এবং সমৃদ্ধি যেভাবে বাড়ছে, তাতে বার্ধক্য দ্রুত পিছু হটছে। সংবাদে প্রকাশ, জাপানে যুবকদের চেয়ে বৃদ্ধের সংখ্যা বেশি। শিশুরা জন্মাচ্ছে 'কম', বৃদ্ধরা বাঁচছে বেশিদিন।

আশা করা হচ্ছে, ভারত একদিন জাপানকে ছুঁয়ে ফেলবে। সবই একদিন হবে, তবে দুঃখ, আমাদের সময় হল না এসব।

লাভালাভই বড়ো কথা

আগে একটি মেয়ের বিয়ে হলে বাপের বাড়ি ছেড়ে প্রথমবার শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার সময় সে কাঁদতে কাঁদতে চোখ ফুলিয়ে ফেলত। আসলে বিয়ের কথাবার্তা পাকা হবার পর থেকেই কান্নার শুরু। বিয়ের লগ্ন যত এগিয়ে আসত কান্নার বহর এবং তীব্রতা তত বেড়ে যেত। আজকাল অবশ্য এরকম আর হয় না। বিয়ে মানেই আনন্দ। বিয়ে মানেই খুশি। তবু যদি কোনও মেয়ে বিয়ের আগে বা পরে কাঁদে — তবে বুঝতে হবে কোথাও কোনও গন্ডগোল আছে। আর আগে ছিল তার ঠিক বিপরীত। না কাঁদলেই বরং সেদিনকার জ্যেঠামশাই মুরুব্বিরা ভ্রূ কুঁচকে হুঁকোয় দীর্ঘটান দিয়ে ঘটনার বিচার-বিশ্লেষণ করতে বসতেন।

এখন প্রশ্ন হল, দেখতে দেখতে একটা প্রথা কেন এমন করে বদলে যায়? একটা প্রথা কেন চালু হয় — আর একটা প্রথা কেন লুপ্ত হয়ে যায়? আগে বিয়ের সময়ে কনের চোখের জল না ফেলাটা অমঙ্গল আর এখন চোখের জল ফেললেই অকল্যাণ। এর একটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হল বাপের বাড়িতে মেয়েটি নিশ্চিন্ত ছিল, ঝুঁকি বা অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ছিল না। এখন বিয়ের পর সে যেই সংসারে যাচ্ছে, তাদেরকে সে চেনে না, জানে না। বিবাহ পরবর্তী জীবনে তার অন্ন বস্ত্র আশ্রয় নিশ্চিত কিনা — তাও অজ্ঞাত। এতদিনকার বাবা-মায়ের আদরে পালিত নিশ্চিত জীবন পেছনে ফেলে যাবার জন্য মন একটু কাঁদবে — তাতে অবাক হবার কিছু নেই। কিন্তু চোখ ফোলানো কান্না একটা অতিরিক্ত ব্যাখ্যা দাবি করে। আগে মেয়ে বিয়ে দেবার সময় বাবা-জ্যাঠামশাইরা খোঁজ করতেন — শ্বশুরবাড়িতে নিজের খেতের ধানে সারা বছর চলে কিনা, বাড়িতে ঢেউটিনের ঘর আছে কিনা, দেওর-ভাসুর মিলিয়ে সংখ্যায় পাঁচ-সাত জন কিনা। এগুলোর অর্থ হল, বিয়ের পরে যেন মেয়েটির অন্তত ভাত- কাপড়ের অভাব না হয়। অধিক দেওর-ভাসুর থাকলে, যদি কোনও কারণে মেয়েটির হাতের শাঁখা ভেঙে যায়, মুছে যায় কপালের সিঁদুর, তবে তাকে ভিক্ষে করে খেতে হবে না। খেতের ধান, ঢেউ টিনের ঘর, অধিক দেওর-ভাসুর — এগুলো ছিল তখনকার দিনের জীবনবিমার অন্যরূপ। এখন অবশ্য ধানের বাধ্যবাধকতা নেই — নেই ঢেউটিনের ঘরেরও। দেওর-ভাসুর না থাকলেই ভালো। নির্ঝঞ্ঝাট সংসার। ভাড়াবাড়িতে থাকলে দোষের কিছু নেই। জামাইয়ের তিন কুলে কেউ না থাকলেও কিছু যায় আসে না। মোট কথা, হবু জামাইয়ের একটি চাকরি আছে কিনা

— সরকারি চাকরি হলেই উত্তম। ডি আর ডব্লিউ হলেও চলে। এরকম একটা নিশ্চিত জীবনে পা রাখতে একটি তরুণীর ভয় পাবার বা কেঁদেকেটে চোখ ফোলানোর কোনও মানে হয় না। কপাল ভাঙলে কোনও কারণে (মানুষের সার্বিক আয়ুষ্কাল বেড়ে যাওয়ায়, খুব একটা কপাল ভাঙবার কারণ ঘটে না আজকাল), লাইফ ইন্স্যুরেন্স আছে, আছে ডাই-ইন-হারনেসে চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা। তাই সঙ্গত কারণেই নতুন সংসারে পদার্পণের সময় কনেকে বেশ হাসিখুশি দেখায়।

অনেক আধুনিকা কন্যা বিয়ের আগেই বাপ-মার সম্মতিসহ নিজের সংসার নিজেই সাজিয়ে দিয়ে আসে। ঝুঁকিবিহীন ভবিষ্যতের জন্য মন খারাপ করার কোনও কারণ নেই। ব্যাপারটা তাহলে মোটামুটি এরকম দাঁড়ায়, পৈতৃক সংসার থেকে স্বামীর সংসারে পদার্পণ করার সময় কান্নার বা হাসির পিছনে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা বা নিশ্চয়তাই দায়ী। মা-বাবার জন্য কেঁদে ভাসাবার ব্যাপারটা নিছক লৌকিকতা বলেই মনে হয়। আগে মনে করা হত, বিয়ের পর মেয়ে পর হয়ে যায়। এটা আর এখন ঠিক না। দেখা গিয়েছে, বিয়ের পরেই ফেলে-আসা মা-বাবার জন্য মেয়ের টান বেড়ে যায়। তখন মেয়েরা সাধ্যমতো অনেক কিছু করে, মুখাগ্নির অধিকারী পুত্রেরাও যা করে না। কয়েকদিন আগে একটি দৈনিকে জনৈক ভদ্রলোক একটি পত্র লিখেছেন — মন্দির কি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান? ক্ষুব্ধ পত্রলেখক জানিয়েছেন আজকাল শ্রাদ্ধ অন্নপ্রাশন ইত্যাদি মন্দিরের প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত করার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। এতে দুপক্ষেরই লাভ। প্রথম পক্ষের (শ্রাদ্ধ / অন্নপ্রাশন কর্তারা) কোনও ঝামেলায় না গিয়ে টাকার ওপর দিয়ে কাজ সমাধা, আর দ্বিতীয় পক্ষের (মন্দিরের কর্তৃপক্ষ) শ্রমের বিনিময়ে অর্থপ্রাপ্তি। জনৈক ভদ্রলোক আক্ষেপ করে বলেছেন, দিনে দিনে মন্দিরগুলো দ্বিপ্রাহরিক ভোজনালয়ে পরিণত হয়েছে।

স্বভাবতই জানতে ইচ্ছে করে আগে মন্দিরগুলো স্রেফ ভোজনালয় ছিল না — তবে এখনই কেন ভোজনালয়ে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে? ধর্ম বা পুণ্যের চেয়ে অর্থনীতিই এখানে বেশি প্রবল মনে হয়। শ্রাদ্ধানুষ্ঠান বা অন্নপ্রাশন মন্দিরে অনুষ্ঠিত করলে তুলনামূলকভাবে অর্থের সাশ্রয় হয় — সময় এবং পরিশ্রম বাঁচে। লোকজন তাই মন্দিরমুখী। তর্কের খাতিরে ধরা যাক মন্দিরে অনুষ্ঠান করলে যা খরচ তার চেয়ে কম খরচে বাড়িতে তা করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে কি লোকেরা মন্দিরকে বেছে নেবে শুধুমাত্র পুণ্যার্জনের কারণে? আগে বিয়ে-শাদিতে বাড়িতে ভিয়েন বসত। বাড়ির মা-বোনেরা নিজেরা হেঁশেলে ঢুকে নাজেহাল হয়ে অতিথি-অভ্যাগতদের জন্য রান্না করত। এখন ক্যাটারারের দিন এসেছে। আগে বিয়ে মিটে গেলে বাড়ির অবস্থা হতো বিধ্বস্ত ছত্রভঙ্গ। এখন বিয়ের জন্য বিয়েবাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়। ফুলবাবুটি হয়ে ভাড়া বিয়েবাড়িতে মেয়ের বিয়ে দিয়ে ষোড়শোপচারে খেয়ে মিঠেপাতি সাঁচি পান মুখে

পুরে ট্যাঁকে তুলে বাড়ি ফেরেন কন্যাকর্তা কন্যাকর্ত্রী। আপনার মেয়ের বিয়েতে অন্যদের মতো আপনিও আমন্ত্রিত — এই হল অবস্থা! এই ব্যবস্থা ভালো কি মন্দ সেটা বড়ো কথা নয়। কথা হল — এটাই সময়ের দাবি। এটাই অর্থনীতি। আমরা তো এতকাল লৌকিকতার পরিবর্তে আশীর্বাদ বাঞ্ছনীয় জানতাম। আমেরিকার একটি বিয়ের অভিজ্ঞতা আমার ওই ধারণা একেবারে পাল্টে দিয়েছে। সেখানে আমি দেখলাম আশীর্বাদের পরিবর্তে লৌকিকতা বাঞ্ছনীয়। সেখানে আমার এক ছাত্রের বিয়ের পার্টিতে যাবার আগে একটি মোটামুটি ধরনের উপহার কিনতে একটা দোকানে গিয়েছি। দোকানি যখন জানল আমি জেফারসনের বিয়ের জন্য গিফট কিনছি, তখন সে বলল, তোমাকে আলাদা করে গিফটটা কিনতে হবে না। জেফারসন আর তার হবু বউ ওই ডাবল ডোর রেফ্রিজেরেটরটি পছন্দ করে গিয়েছে। তুমি গিফট কিনে যত ডলার খরচ করবে বলে মনস্থ করেছ ওই ডলারটা এখানে দিয়ে যাও। তোমার মতো সবাইকে আমরা এ কথা বলছি। পুরো দাম এভাবে উসুল হলে আমরা ফ্রিজটা পাঠিয়ে দেব। বাকি থাকলে কিছু, সেটা ওরা মিটিয়ে দেবে। আমি দেখলাম, ব্যবস্থাটা মন্দ নয়। কেউ বিয়েতে এগারোটা টেবিল ল্যাম্প এবং সতেরোটা ইলেকট্রিক ইস্ত্রি পায় উপঢৌকন হিসেবে। এগুলো নিছক অপচয় ছাড়া আর কী। সেক্ষেত্রে এজমালি উপহার ব্যবস্থাপনাটা অনেক ভালো।

আমি দেখেছি শহরের শনির থালার সামনে রাখা প্রণামির থালায় এক টাকার কয়েন রেখে পঞ্চাশ পয়সা তুলে নেয় কেউ কেউ। পকেটে খুচরো নেই — তাই দৃষ্টিকটু ব্যাপারটি শনিঠাকুরের রক্তচক্ষুর সামনেই করতে হয়। শনিঠাকুর এতে রাগ করেন বলে মনে হয় না। রাগ করলে বরং ক্ষতি। বস্তুত এতে দুপক্ষেরই লাভ। এক্ষেত্রে ধর্ম, পুণ্য বড়ো কথা নয় — লাভালাভই বড়ো কথা।

অধ্যাপক ইউনুসকে আমাদের আমন্ত্রণ

প্রতিবেশী বাংলাদেশের অধ্যাপক মহম্মদ ইউনুস এ বছর শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। এই উপ-মহাদেশের সবাই এজন্য খুশি। খুশি সবাইয়ের সঙ্গে আমিও। কিন্তু আমার খুশির সীমা নেই। দীর্ঘকাল আগে থেকেই আমি তাঁর একজন অনুরাগী এবং অ্যাডমায়ারার। তাঁর খুব নৈকট্যে আসার আমার বিরল সৌভাগ্য হয়েছে। সেই সুবাদে (আমি অবশ্য দাবি করি) আমি তাঁর কাছে অনুজ ভ্রাতৃপ্রতিম।

এক দশক আগে 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকায় আমি 'চলার পথে' নামে একটি নিয়মিত কলাম লিখতাম। সেখানে আমি অধ্যাপক ইউনুসকে নিয়ে লিখেছিলাম। সেই লেখাটি আমার 'চলার পথে' বইয়ে প্রকাশিত হয়েছে জানুয়ারি ১৯৯৭ সালে নয় বছর আগে। ''বাংলাদেশের অনেক জায়গায় আমি গিয়েছি। তবে একজনের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি অথচ তার সাথে দেখা করার জন্য সে দেশে যাওয়ার আগে থেকেই আমি উদ্‌গ্রীব ছিলাম। আমি যেখানে গিয়েছি এবং যার সঙ্গে কথা বলেছি, দেখেছি সবাই তাকে চেনে। গ্রামের চাষাভুষো লোক তাঁকে চেনে, তাঁকে চেনে বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত অধ্যাপকেরা। ইউনাইটেড নেশনস তার রিপোর্টে বাংলাদেশের এই ব্যক্তিটি সম্পর্কে প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তার বয়স খুব একটা বেশি নয়। শুনেছি ষাটেরও কম। অথচ এই বয়সে তিনি তাঁর কৃতিত্বের জন্য পৃথিবীর প্রায় সব সম্মানীয় পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। এখন বাকি আছে মাত্র একটা — সেটি হল নোবেল প্রাইজ। শোনা যাচ্ছে, যেকোনও সময় তিনি নোবেল পুরস্কার (শান্তির জন্য) পেতে পারেন। গতবারে তার নাম মনোনীত হয়েছিল নোবেলের জন্য। সবাই আশা করেছেন, বাংলাদেশের এই সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিটি অচিরেই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কারে ভূষিত হবেন। কে এই ব্যক্তি — যার জন্য সমগ্র দেশ শ্রদ্ধায় অবনত? তিনি হলেন অধ্যাপক ইউনুস। ইউনুস সাহেব অর্থনীতির অধ্যাপক — কিছুদিন আগে পর্যন্ত তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি পড়াতেন। ক্লাসে ছাত্রদের যা পড়াতেন, ক্লাসের বাইরে এসে দেখতেন, না, কিছুই মেলে না। তাই ক্লাসের চৌহদ্দির বাইরে বেরিয়ে এসে এখন তিনি গ্রামের চাষাভুষো গরিব গুর্বো বিধবাদের মুখে হাসি ফোটাবার ব্রতে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। অধ্যাপক ইউনুস সাহেব এখন বাংলাদেশের গ্রামীণ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান। যেখানে ব্যাঙ্ক মানেই হল ব্যর্থতা, অনাদায়ি ঋণ এবং গরিবের

বোঝার ওপর বোঝা বাড়ানো, সেখানে ইউনুস সাহেব বাংলাদেশে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করতে সক্ষম হয়েছেন। বাংলাদেশের অন্যান্য ব্যাঙ্ক যেখানে ঋণ অনাদায়ের ফলে ডুবে যাচ্ছে সেখানে বাংলাদেশ গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ঋণ আদায়ের সফলতার হার হল শতকরা নিরানব্বই ভাগ — যা এক কথায় অভাবনীয়। এখানে উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, জাতীয় গ্রাম উন্নয়ন সংস্থার তরফ থেকে আমি একটা সমীক্ষা ত্রিপুরায় করেছিলাম। সেখানে আমরা দেখেছি ত্রিপুরায় আই আর ডি পি-তে দেয়া ঋণের আদায়ের সফলতার হার হল মাত্র এগারো শতাংশ।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, অধ্যাপক ইউনুস সাহেব কি ম্যাজিক জানেন যে, অবিশ্বাস্যকে তিনি বিশ্বাস্য করে তুলতে পেরেছেন। বাংলাদেশে ইউনুস সাহেবের সঙ্গে শত সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সময়াভাবে আমার দেখা হয়ে ওঠেনি বটে — তবে আমি বিভিন্ন সূত্র থেকে ইউনুস সাহেবের ম্যাজিকের গোপন কথা জেনে এসেছি। তিনি বলেন — গ্রামের লোক ব্যাঙ্কের কাছে যাবে না বরং ব্যাঙ্ক লোকের কাছে যাবে। বাংলাদেশের গ্রামের দুঃস্থ চাষি, বিধবা মহিলা মোট পাঁচজন মিলে নিজেরাই নিজেদের গ্যারান্টার হয়ে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেয়। একজনের ঋণ অনাদায়ি থাকলে অন্যেরা তা মিটিয়ে দেয় — কেননা পাঁচজনের এই ইউনিট একত্রে ব্যাঙ্কের কাছে দায়বদ্ধ। উল্টোদিকে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের তরুণ পরিশ্রমী কর্মীরা ঋণগ্রহীতার বাড়িতে গিয়ে গিয়ে সপ্তাহান্তিক ঋণের টাকা (সুদসহ) আদায় করে নিয়ে আসে। ঋণ দেয়া হয় খুব ছোট অঙ্কের এবং সুদের হারও কিন্তু কম নয়। যেমন চারশ টাকা ঋণ দেয়া হয় একজন বিধবা মহিলাকে। ব্যাঙ্কের কর্মচারী প্রতি সপ্তাহে তার কাছ থেকে দশ টাকা তার বাড়িতে গিয়ে আদায় করে নিয়ে আসে। এক বছরে অর্থাৎ বাহান্ন সপ্তাহে চারশ টাকার সুদসহ জমা ঋণ জমা পড়ে পাঁচ কুড়ি টাকা। ঋণ পরিশোধের সাফল্যের জন্য পরের বছর ঋণের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়া হয়। গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ঋণ দেয় পুঁজি গড়ে তোলার জন্য, ঘরের ছাউনি দেবার জন্য, বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নির্মাণের জন্য। ম্যাগস্যাসে পুরস্কার পাওয়ার পর অধ্যাপক ইউনুস তাঁর এক সম্বর্ধনা সভায় সহকর্মীদের কাছে বলেছেন — এইসব পুরস্কারকে আমি প্রকৃত পুরস্কার বলে মনে করি না। আমার জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ পুরস্কার প্রাপ্তির কথা আপনাদেরকে বলি। একবার গ্রামীণ ব্যাঙ্কের কাজে বগুড়ার কাছে একটা গ্রামে গিয়েছি। খবর পেয়ে গ্রামের লোকজন অনেকে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। ভিড় ঠেলে একজন বুড়ি এগিয়ে এসে বলল — "তুমি নকি ইউনুস। তোমাকে আমি দোয়া করতে এসেছি। লজ্জার মাথা খেয়ে তোমাকে বলি, আগে আমরা বাড়ির মেয়েরা কখন রাত হয়ে অন্ধকার হবে তার জন্য অপেক্ষা করতাম — কেননা অন্ধকার না হলে তো আমরা পুকুর পারে খালের ধারে লোকচক্ষুর আড়ালে পায়খানা করতে যেতে পারতাম না। তোমার গ্রামীণ ব্যাঙ্কের দৌলতে বাড়িতে এখন পায়খানা

হয়েছে — আমাদের শরমের দিন শেষ হয়েছে। খোদার কাছে তোমার জন্য দোয়া মাঙি, তুমি শরমের হাত থেকে গ্রামের মেয়েদের মুক্তি দিয়েছ।''

অধ্যাপক ইউনুস সাহেব বাংলাদেশের গরিব দুঃস্থ বিধবা অসহায় সবার জন্য মুক্তির বার্তা নিয়ে আসছেন। ইউনুস সাহেব এই মুক্তিযুদ্ধে জয়ী হবেন — এই কামনা করি।'' (চলার পথে, পৃষ্ঠা ২০-২১, দে'জ পাব্লিশিং, কলকাতা)

এই লেখাটি বইয়ে ছাপার পর আমি আবার বাংলাদেশে যাই ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বরে। সেবার ইউনুস সাহেবের বাড়িতে গিয়ে তাঁর হাতে ''চলার পথে''র একটি কপি দিয়ে আসি। প্রশস্ত হৃদয়ের মানুষ ইউনুস — ভীষণ আড্ডাবাজ। প্রাণখোলা, দিলদার। সাক্ষাৎকারের দিন পনেরো বাদে আমি তাঁর কাছ থেকে একটা চিঠি পাই —

প্রিয় অরুণোদয়, জানু ১০, ৯৮

আপনার চিঠির জন্য ধন্যবাদ। হঠাৎ করে পঁচিশ ডিসেম্বরে আপনার সঙ্গে দেখা হবে আশা করিনি। আলাপ করে বেশ ভালো লাগল। আমাদের এত কাছে আগরতলা শুনতেই অবাক লাগল। কুমিল্লা পৌঁছানোর আগে আগরতলা পৌঁছানো যায়। অবাক কাণ্ড, অথচ কোনোদিন যাইনি। যাবার কথা চিন্তাই করিনি।

আপনার দেয়া বইটিও পড়লাম। মজা লাগছিল পড়তে। একই ভাষা, একই সমস্যা, একই কৌতুক, একই বেদনা। অথচ আলাপ ছিল না এত কাছের মানুষদের সঙ্গে।

বাংলাদেশে যদি কিছুদিন কাটাতে চান এ বছর গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সঙ্গে যুক্ত থেকে কিছুদিন কাটাতে পারেন। আমাদের কোনও একটি শাখায় আমাদের কর্মীদের সঙ্গে কিছুদিন থেকে দেখতে পারেন আমরা কী কাজ করি, কীভাবে করি।

অন্য কোনও পরিকল্পনা থাকলে জানাবেন।

শুভেচ্ছা নিন আপনারই

মুহাম্মদ ইউনুস

পরে তাঁর আমন্ত্রণে আমি আবার বাংলাদেশে যাই। ঢাকা থেকে ষাট কিলোমিটার দূরে মানিকগঞ্জ আরিচা গ্রামে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের একটি শাখায় তিনদিন থেকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করে ফিরে এসে একাধিক প্রবন্ধ লিখেছি, বক্তৃতা করেছি অধ্যাপক ইউনুস এবং তাঁর গ্রামীণ ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে। তাঁর চিঠি থেকে স্পষ্ট, ইউনুস সাহেবের মনের কোণে আগরতলা একটি বিশেষ স্থান জুড়ে রয়েছে। তিনি আমাকে জানিয়েছেন, সময় পেলে তিনি একবার আগরতলায় আসতে চান। ব্যস্ততা এবং অন্যান্য কারণে তাঁর আসা হয়নি। এখন নোবেল পুরস্কার পাবার

পর তাঁর ব্যস্ততা আরও বেড়েছে। পৃথিবীর সর্বত্র তিনি যাবার জন্য আমন্ত্রণ পাচ্ছেন। তবে খুবই বিনম্রভাবে এই লেখাটির মাধ্যমে অধ্যাপক ইউনুসকে জানাই, আগরতলা এত কাছে যে, যেকোনও ছুটির দিনে সকালে ঢাকা থেকে বেরিয়ে আগরতলায় দুপুরটা কাটিয়ে সন্ধ্যেবেলায় আবার আপনি ঢাকা ফিরে যেতে পারবেন। ত্রিপুরাবাসীদের পক্ষ থেকে আপনাকে আমন্ত্রণ জানাই। উষ্ণ আতিথেয়তার বরণডালা নিয়ে আপনার আসার জন্য আমরা প্রতীক্ষা করছি।

গরম ভাত

স্বল্প সময়ের নোটিশে আস্তাবল ময়দানে বিশাল জনসমাবেশ। সারা শহর জুড়ে উথাল-পাতাল মাইকিং করা হল — ছুটির দিন বিকেলে দলে দলে যোগ দিন। ছ-ছটা কমাণ্ডার জিপে সরু লম্বা লাউড স্পিকার লাগিয়ে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি করে ঘোষণাটি শহরের সর্বত্র কোণে কোণে পৌঁছে দেয়া হল। শব্দ ব্রহ্ম — ব্রহ্মতালু তক্ পৌঁছে গেল তার তরঙ্গ। রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের ভ্রূকুটি উল্লঙ্ঘিত হল — তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হল না।

মহামিছিলের সকালে পাড়ার দাদারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে যোগদানের জন্য আবেদন করতে বেরিয়েছেন। এমনই একটি দাদাদের ছোট্ট দল পাড়ার একটি বাড়ির দরজায় কড়া নাড়ল।

গৃহকর্ত্রী সরকারি অফিসে করণিকের চাকরি করেন। একজন বললেন, বৌদি বিকেলে মিটিং জানেন তো? মিছিল করে পাড়া থেকে বের হব এক সঙ্গে। যাবেন কিন্তু।

বৌদি ঘাড় কাত করে বললেন, নিশ্চয়ই যাব। ঘরের ভেতর থেকে কার যেন ক্রমাগত কাশির শব্দ শোনা যাচ্ছে। আসলে শ্বশুর মশাইয়ের হাঁপানির টান বেড়েছে — তিনিই কাশছেন।

অন্যজন বললেন, ভেতরে কার গলা শুনি। উনাকে মিছিলে নিয়ে যাবেন।

বৌদি উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, ওনার শরীরটা ভালো নেই। উনি যেতে পারবেন না।

শ্বশুরমশাই ভেতর থেকে সব কথাবার্তা শুনেছেন। নিজেই এগিয়ে এসে বললেন, বাবাসকল, আপনারা নিশ্চিত থাকেন — আমি মিছিল কইরা মিটিংয়ে যামু।

বউমা বললেন, আপনি কী করে যাবেন। আপনার শরীর ভালো না।

পাড়ার দাদাদের মধ্যে অন্য একজন বললেন, এটা কী হচ্ছে বৌদি? মেসোমশাই যেতে চান — আপনি না করছেন কেন?

বাবাসকল, ঘর্ঘরে গলায় বললেন মেসোমশাই, আমার কোনও কষ্ট হইব না। আমি যামু। পাড়ার দাদারা সম্মতি আদায় করে চলে গেলে বউমা খানিকটা বিরক্ত হয়ে বললেন, আমি না বললাম — তবু আপনি কেন যেতে রাজি হলেন?

শ্বশুরমশাই খানিকটা কেশে গলা পরিষ্কার করে বললেন, বউমা, তুমি আগের জন্মে আমার মা আছিলা। তুমি আছ বইলা আমি দুবেলা দুই মুঠা গরম ভাত পাই। এখন আমি যদি না যাই মিছিলে — তোমারে যদি ট্রান্সফার কইরা দেয় — তা হইলে আমার গরম ভাত বন্ধ।

তারপর গলার স্বরটা নামিয়ে ফিসফিস করে শ্বশুরমশাই বললেন, আমি কি সাধে মিছিলে যাইতে চাই? আমি যাই গরম ভাতের লোভে।

এটি একটি গল্প হলেও সত্যি অথবা সত্যি হলেও গল্প। তবে সংসারে গরম ভাতের একটা প্রবল ভূমিকা আছে যা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। অনেকে বলে, সব হল রাজনীতি। রাজনীতিই আজকের সমাজ সংসারের সব কিছুর নির্ণায়ক। কিন্তু রাজনীতির পশ্চাতে যে একটা নির্মম অর্থনীতি আছে — তা অনেক সময় দৃষ্টির আড়ালে থেকে যায়।

ভোট, নির্বাচন, সরকার গঠন — এগুলো সবই রাজনীতি। ভারতবর্ষে এখন কোয়ালিশান বা শরিকি রাজনীতি চলছে। মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে দপ্তর বন্টনের সময় গরম ভাতের প্রশ্নটি সামনে এসে দাঁড়ায়। বেশি গরম ভাতের দপ্তরটি পেতে সবাই আগ্রহী। ত্রাণের মতো গুরুত্ববিহীন দপ্তর যাঁর কপালে জোটে — তাঁর মুখ গোমড়া হয়ে যায়। রাজনীতির মুখ্য উদ্দেশ্যই যদি হয় জনগণের সেবা — তবে তাতে গুরুত্বময় বা গুরুত্ববিহীন দপ্তরে কী যায় আসে। না, যায় আসে — খুবই যায় আসে। গরম ভাত, কম গরম ভাত এবং ঠান্ডা ভাতে যায় আসে না? যায় আসে বই কি!

রাজনীতি বাদ দিয়ে বরং সংসারের ভেতরে মুখ ফিরিয়ে এনে দেখা যাক — সেখানে চালিকাশক্তিটি কী? সংসার কে চালায় — কার কথায় চলে সংসার? অনেকের ধারণা, বাবা মা বয়স্কদের কথাতে বা পরামর্শে সংসার চলে।

কারণটা হল, বয়স্করা জীবনে অনেক দেখেছেন — অনেক তাঁদের অভিজ্ঞতা। সুতরাং তাঁদের পরামর্শ নিয়ে ঘর-সংসার চালাতে পারলে — এর চেয়ে আর ভালো হয় না। কিন্তু প্রকৃতই কি তাঁদের কথায় চলে সংসার?

কনে দেখা শেষ। বিয়ের কথাবার্তাও প্রায় পাকা। খানিকটা বাকি আছে দেয়া-নেয়ার ব্যাপারটায়। কোথায় যেন আটকে গেল মুহূর্তের জন্য।

পাত্রপক্ষের একজন বিনয়ের সঙ্গে বলল, পাত্রকে ছোটবেলায় কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছেন তার পিসি। সেই পিসির বয়স আশি। তিনি থাকেন কৈলাসহরের সমরুর পাড়। এই বিয়েতে তাঁর সম্মতি নেয়া হয়নি। এখন উঠি। পরে পিসির সঙ্গে যোগাযোগ করে আমাদের মতামতটা জানিয়ে দেয়া হবে।

সাত জন্মে পিসির খোঁজ হয় না — আজ সেই পিসির আঁচলে বাঁধা আছে বিয়ের চাবিকাঠি। পাত্রীপক্ষ নির্বোধ নয় — তারা ইশারাটুকু বুঝলেন। অল্পের জন্য হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে অনেক কষ্টে জোগাড় করা এই বিয়ের সম্বন্ধ।

শেষ পর্যন্ত, পিসি রইল পিসির জায়গায় — বিয়ে ভাঙতে ভাঙতেও ভাঙল না। ঐ বৈঠকেই ঠিক হল, হিরো হোন্ডা প্রথমে দিতে অপারগ হলেও এখন পাত্রীপক্ষ রাজি। খানিকটা কষ্ট হবে, — এই আর কী। ভেতর বাড়ি থেকে উলুধ্বনির শব্দ শোনা গেল। আদতে পিসি বাহানা মাত্র — আসলে এটাও গরম ভাতের গল্প।

দেখতে দেখতে বাড়ির নম্র বিনয়ী ছেলেটি মাফিয়া হয়ে গেল। টালমাটাল পায়ে রাতে বাড়ি ফেরে — কোনও কোনও দিন ফেরেও না। তার টাকায় ছোট ভাই বাঙ্গালুরে কম্প্যুটার পড়ে।

মাথার ওপরের বোনটির কিছুদিন আগে বিয়ে হয়েছে। ছোটটির এখুনি বিয়ে না দিলে না হয়। বাবা নিম্ন আদালতে জজিয়তি করে অবসর প্রাপ্ত — জীবনে অনেক সুবিচার করেছেন। সত্য বৈ মিথ্যে বলেননি। সত্য এবং ধর্মের জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন। এখন মনে হচ্ছে, নিজের সংসারেই সত্য ধর্ম অনুপস্থিত। অথচ কিছু বলার উপায় নেই। সেই নষ্ট ছেলে ফিরে এলে রাত-বিরেতে জন্মদাত্রী মা আলাদা করে রেখে দেয়া মাছের বড়ো টুকরোটা তার পাতে তুলে দেন।

খেতে খেতে ঘুমিয়ে পড়ে ছেলে। সেই অল্পক্ষণের ফাঁকে, আর কারোর সঙ্গে নয়, সেই উচ্ছন্নে যাওয়া ছেলের সঙ্গেই সংসারের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে মা পরামর্শ করেন। বাঙ্গালুরে মাসের প্রথমে টাকা পাঠানো, ছোট মেয়ের বিয়ের বিষয়ে, বড় মেয়ের দিকের নাতির অন্নপ্রাশন ইত্যাদি। তাই প্রশ্ন একটাই ঘুরে ফিরে আসে — সংসারটা চালায় কে? কে আবার — চালায় গরম ভাত! তাতে কোনও দ্বিমত আছে নাকি?

দাসানুদাস

ইংরেজ,
ফিরে এসো

দাসত্ব আমাদের জন্মগত অধিকার। কলকাতার হাওড়া স্টেশান থেকে মুম্বাই যাবার ট্রেনগুলো ছাড়ে একুশ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে। মুম্বাইগামী ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে বের হতেই বাঁদিকে দেয়ালে বিরাট বিরাট অক্ষরে জ্বল জ্বল করে লেখা শ্লোগানটি চোখে পড়বে — 'ইংরেজ ফিরে এসো ...।' প্ল্যাটফর্মে এবং স্টেশানের সর্বত্র আগডুম-বাগডুম অনেক বিজ্ঞাপন থাকে। তবে 'ইংরেজ ফিরে এসো'-র মতো এমন নজর-কাড়া বিজ্ঞাপন আর নেই। মজার ব্যাপার হল, ইংরেজদের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপনটি হলেও — লেখা হয়েছে বাংলা অক্ষরে বাংলা ভাষায়। অনেক ইংরেজ আজকাল রকমারি প্রয়োজনে কলকাতায় আসে। দমদম এয়ারপোর্ট দিয়েই আসে বেশি — ট্রেনেও একেবারে আসে না যে এরকম নয়। তারা কি বাংলা পড়তে পারে? তারা যদি বাংলা পড়তে না পারে তবে শ্লোগানটির উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হতে বাধ্য।

কাউকে একবার তাড়িয়ে দিয়ে পরে আবার ডাকাডাকি করলেই যে তারা এসে কৃতার্থ করবে একথা জোর দিয়ে বলা যায় না। তাদের না-আসার সমর্থনে যথেষ্ট যুক্তি আছে। ফিরে যদি আসতেই তাদের বলা হয়, তবে সবচেয়ে ভালো ছিল তাদের না-তাড়ানো। যার ন্যূনতম মানসম্মান জ্ঞান আছে তার পক্ষে আবার ফিরে আসার আমন্ত্রণ গ্রহণ করা এক্ষেত্রে কঠিন। অবশ্য আমন্ত্রণ গ্রহণ করার পক্ষেও অন্তত একটা যথেষ্ট জোরালো যুক্তি আছে। যাদের তাড়ানো হয়েছিল — তাদের আসতে বলা হয়নি। এখন যাদের আসতে বলা হয়েছে তাদের তাড়ানো হয়নি। পূর্বপুরুষের সঙ্গে পূর্বপুরুষের কী হয়েছিল বা না হয়েছিল তা নিয়ে কি মান-অভিমান করা সাজে?

ইতিহাস সাক্ষী, একসময় মায়ে-তাড়ানো বাপে-খেদানো ইংরেজরা এদেশে এসেছিল। সময় সবসময় এক থাকে না। এখন আগের মতো মায়ে-তাড়ানো বাপে-খেদানো ইংরেজ আর নেই বললেই চলে। এখন যারা আছে — তারা আগের মতো নয়। এখনকার ইংরেজ প্রজন্ম অনেক বেশি বুদ্ধিমান এবং পরিশীলিত। আগের প্রজন্মের মতো গোঁয়ার-গোবিন্দ নয়

তারা। আগেরবার তারা বণিকের মানদণ্ড নিয়ে এদেশে এসেছিল — শর্বরী পোহাতেই বণিকের মানদণ্ডকে শাসনের রাজদণ্ডে রূপান্তরিত করে ফেলে। ইংরেজের নব্য প্রজন্ম দেখল, রাজদণ্ডের চেয়ে মানদণ্ড অনেক বেশি শক্তিশালী এবং কার্যকরী। তারা এও অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি করেছে — রাজদণ্ড হাতে অপ্রিয় হওয়ার দরকার নেই — মানদণ্ডের মধ্যেই রাজদণ্ডের সমস্ত গুণাগুণ লুক্কায়িত আছে। রাজদণ্ডকে নিজের ইচ্ছামতো চালনা করতে পারে মানদণ্ড। এতে সাপও মরে, লাঠিও ভাঙে না। তাই 'ইংরেজ, ফিরে এসো' বলে শত ডাকাডাকি করলেও ইংরেজ আগের মতো আসবে বলে মনে হয় না।

দেয়াল লিখনটির দুটি অংশ। শেষাংশটি হল — দাসত্ব আমাদের জন্মগত অধিকার। দাসত্ব মানে হল গোলামি। আর গোলামি করা মানে হল চাকরি করা। তাহলে বাক্যটির নির্যাস হল — চাকরি আমাদের জন্মগত অধিকার। এ কথাটির মধ্যে যথার্থ সত্যতা আছে বলে বোধ হয়।

রোমান্টিকভাবে বললে, শ্লোগানটি বদলে এইরকম দাঁড়ায় — তুমি আমাকে চাকরি দাও, আমি তোমাকে দাসত্ব দেব। দাসত্ব আমাদের জন্মগত অধিকার।

দাসত্বে অঙ্গীকারবদ্ধ সবাই চাকরির জন্য হন্যে হয়ে মরছে। জীবনে আর কিছু চাই না — একটা চাকরি চাই-ই-চাই। চাকরি না হলে জীবন বৃথা যেন। চাকরির একটা চাহিদা আছে — চাকরির একটা যোগান আছে। এখন সবাই যদি শুধু চাহিদা করে — তবে যোগানদার কে হবে? অনেকে মনে করেন, সরকার হল মা-বাপ — তাই সরকার চাকরিদাতা। কিন্তু সরকার যদি উন্নয়নমূলক কাজের জন্য বরাদ্দ থেকে অর্থ কেটে এনে চাকরির সংস্থান করে — তবে সরকারের নিজেরই চাকরি থাকবে না যে। সরকার কি বোকা নাকি যে, নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাপথ মসৃণ করাবে? তাছাড়া কিছু লোকের হয়তোবা চাকরি হতে পারে — যারা সরকারের ঘনিষ্ঠ বা যাদের চাকরি হলে সরকারের চাকরি দীর্ঘস্থায়ী হবার সম্ভাবনা। তাই সবার চাকরি হবে না — হবার কথাও নয়।

এখন প্রশ্ন হল, চাকরি হবে না জেনেও লোকে কেন চাকরির মরীচিকার পেছনে ছোটে? চাকরি মানে হল নিশ্চিন্ত জীবন। আসি যাই মাইনে পাই। কোনও ঝুঁকি নেই। চাকরি না করে নিজে কিছু করার মধ্যে ঝুঁকির সীমা নেই। কিছু করতে গেলে কিছু কষ্ট, কিছু পরিশ্রম, কিছু ত্যাগ স্বীকার করতেই হয়। কিন্তু এগুলো করতে অনেকেই প্রস্তুত নয়। এত পরিশ্রমের ধকল কার সয়? এর চেয়ে বরং দাদার পেছন পেছন ঘুরব, তাঁবেদারি করব, দাসত্বের খত লেখাব — যদি একটা চাকরি শিকে থেকে ছিঁড়ে ঝপ্ করে কোলে পড়ে। অথচ স্বাবলম্বী হয়ে একটা ছোটখাটো প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারলে নিজের তো একটা গতি হয়ই — তাছাড়া অনেক হতাশা মলিন চোখেমুখে আলো ফোটানো যায়। কিন্তু সেটা করা এক ধরনের মূর্খামি।

আসলে দাসত্বের কোনও দোষ নেই। আমাদের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য এরকম যে, আমরা দাসত্বের জন্য কাঙাল। একটা রামপ্রসাদী গানে বলা আছে — 'আমায় দে মা তবিলদারি / আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী'। মোদ্দা কথাটি হল, একটা ক্যাশিয়ারের চাকরি লাগে আমার। বিশ্বাস করো, মা, আমি নিমকহারাম নই, আমি বিশ্বস্ত — তছরুপের ভয় নেই। দোহাই তোমার, চাকুরির জন্য সিকিউরিটি মানি চেয়ো না — তাহলে চাকরিটি আমার হবে না। আমরা বিয়ে করে মা-র জন্য দাসী নিয়ে আসি। আমরা উপরওয়ালাকে চিঠিতে শেষ লাইনে লিখি — ইয়োর মোস্ট অবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট। আমরা অধমাধম। আমরা দাসানুদাস। দাসত্ব তাই আমাদের জন্মগত অধিকার।

কে নিবি গো কিনে আমায়

অনেকে দুঃখ করে বলেন, একটা জিনিস বিক্রি করতে চাইছি, পারছি না। পসরা সাজিয়ে রাখা অথচ দোকানি ছাড়াও সংসারে অনেককে অনেক কিছু বেচতে হয়। প্রয়োজনে কেউ জমি বেচেন, কেউ বেচেন গাড়ি, কেউ বা বেচেন পুরোনো সাইকেল। সংসারটা একটা বেচা-কেনার হাট। কেউ না কেউ বেচবেই, নইলে অন্যেরা কিনবে কী করে?

কথা হল, কেউ কিছু বেচতে চাইলে, বিক্রি করতে পারেন না কেন? উত্তরে অনেকে বলেন, ভালো দাম পাচ্ছি না — তাই। আসলে তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে অন্যরকম। এখানে দুটি আলাদা জিনিসকে গুলিয়ে ফেলা হচ্ছে। একটা হল — বিক্রি করা, অন্যটা হল ভালো দাম পাওয়া। তার মানে হল, বিক্রি করা যাচ্ছেই তবে ভালো দাম পাওয়া না পাওয়া অন্য কথা। প্রতিটি সামগ্রীর প্রচলিত বাজারে বিনিময়ের জন্য একটা দাম আছে। সেই দাম কমতে বা বাড়তে পারে পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে। কেউ কিছু বিক্রি করতে চাইলে বাজারের প্রচলিত দামে বিক্রি করতে পারবেই — না পারার কথা নয়। ধরা যাক, একটা জিনিসের বাজারে বর্তমান দাম হল দশ টাকা। কিন্তু বিক্রেতা যদি মনে করে আমি একশ টাকায় জিনিসটি বিক্রি করতে চাই — কেননা আমার বিবেচনায় সেটিই হল 'ভালো দাম' — তাহলে সেই

জিনিস জিন্দেগিতে বিক্রি হবে না। সেক্ষেত্রে আফশোস এবং দীর্ঘশ্বাস ছাড়া কিছু করার নেই — জিনিসটি বিক্রি করতে চাইছি অথচ এতই কপাল মন্দ যে, বিক্রি করতে পারছি না।

মায়ের বয়স গিয়েছে এখন আর কাজকর্ম করতে পারেন না। মা এখন সংসারের বোঝা। গ্রামের একটি লায়েক পুত্র ঠিক করল — মাকে বাজারে বিক্রি করে দেবে। মা-বিক্রির কথা শুনে সবাই 'হায় হায়' শুরু করল। এরকম কথা শুনেছে কেউ কোনওদিন মাকে বিক্রি করে দেয় বাজারে? মুরুব্বি বিবেচক আত্মীয়স্বজনেরা ছেলেকে বোঝাল — পাষণ্ড ছাড়া মাকে কেউ বেচে? ঘরের কোণে পড়ে থাকে মা — আর বাঁচবেই বা কদিন? দশমাস দশদিন গর্ভে ধারণ করেছে, জন্ম দিয়েছে তোকে, লালন-পালন করেছে, নিজে না খেয়ে তোকে খাইয়েছে — সেই মাকে তুই বিক্রি করে দিবি? বেচে মহাপাতক হবার আগে আর একবার ভেবে দ্যাখ?

ছেলে ভাবল। তার সুবুদ্ধির উদয় হল সম্ভবত। শেষে মুচকি হেসে বলল, মাকে বেচবই। বাজারে নিয়ে যাব মাকে। তারপর মার জন্য এমন দাম চাইব — যেন কেউ কিনতে না পারে।

সংসারটা এরকমই। সব জিনিস বেচা-কেনা যায়। তবে কেউ যদি মা বেচার জন্য এমন দাম হেঁকে বসে যে কেউ কিনতে পারবে না — তবে জিনিসটা আর বিক্রি হয়ে হস্তান্তর হবে কী করে? আমাদের যানবাহনগুলোতে যাত্রী বোঝাইয়ের বহর দেখলে যে কারোর রক্তচাপ বেড়ে যাবে। এমনই গাদাগাদি করে যাত্রী তোলা হয় — টিনের মধ্যে মুড়ি রাখার আর্টও তাতে হার মানবে। একদিকে শাপশাপান্ত করে গাড়ির মালিককে — আবার মুখ বুজে গন্তব্যে যায়ও লোকজন। এ ব্যাপারে শহরের অটোগুলোর তুলনা নেই — এরা নিজেরাই নিজেদের তুলনা।

বড়ো বড়ো শহরে অটোতে পেছনে দুজন যাত্রী বসবে — আর সামনে ড্রাইভার। ব্যস্ ২ + ১। কিন্তু এই শহরে এক একটা অটো যখন রাস্তায় চলতে থাকে তখন মনে হবে ভাসমান চলন্ত পিরামিড বুঝি। অতিরিক্ত যাত্রী বোঝাইয়ের কথা বাদ দিলেও স্বাভাবিক অবস্থায় পেছনের সিটে চারজন আর ড্রাইভারের দুপাশে দুজন যাত্রী নেয়া হয়। ৪ + ২ + ১ = ৭ জন। পেছনের চারজনের মধ্যে কেউ কারোর কোলে বসে — আর সহযাত্রী যদি স্থূলকায় হয় তবে তো কথাই নেই।

ট্রাফিক আইনের চক্ষে অতিরিক্ত যাত্রী পরিবহন বে-আইনি। এই আইনি বে-আইনি প্রসঙ্গে আপাতত না গিয়ে এ সম্পর্কে বাজারের কার্যকারিতা এবং তার ব্যর্থতার কথা নিয়ে আলোচনা করা যাক। শহরের একটা জায়গা থেকে অন্য একটা জায়গায় রিক্সায় যেতে যেখানে ভাড়া দশ টাকা সেখানে অটো ভাড়া হল মাত্র তিন টাকা। কে না জানে, রিক্সার চেয়ে অটো

ভালো, অটোতে কম সময় লাগে। কোনো যাত্রী ইচ্ছে করলে পেছনের দুটো সিটের ভাড়া তিন তিন ছটাকা দিয়ে আরাম করে পা ছড়িয়ে যেতে পারে। গাদাগাদি করে কারোর কোলে পিঠে করে যাবার দরকার নেই। দশ টাকার পথ আরামে ছয় টাকায় যেতে পারলেও লোকে কেন তিন টাকায় যাবে বলে হাপিত্যেশ করে বসে থাকে? আসলে কারণটা সম্ভবত এই — আরাম চাই না, সস্তা চাই।

কিছুদিন আগে আমি কলকাতার উল্টোডাঙার মোড় থেকে শোভাবাজার মেট্রো রেল স্টেশনে গিয়েছিলাম অটোতে করে। একটা অটোতে উঠে বসেছি। বসেই আছি — ছাড়ছে না গাড়ি। আসলে অটো ড্রাইভার অপেক্ষা করছে আরও কয়েকজন যাত্রীর জন্য, নইলে পোষাবে না তার। অনেকক্ষণ বসে থেকে যখন আমি ছাড়া আর অন্য যাত্রী জুটল না তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও অটোটি চলতে শুরু করল এই ভরসায় যে, পথে আরও যাত্রী জুটে যাবে। উল্টোডাঙার পর দীনেন্দ্র স্ট্রিট, খান্না, হাতিবাগানও পেরিয়ে গেল। ড্রাইভার কিছুটা এগোয় — তারপর গতি কমিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য থামে। পেছনে থেকে আসা দ্রুতগামী অটোর ড্রাইভারের সঙ্গে ইশারায় কথা বলা সেরে নেয়। তারপর আবার চালাতে শুরু করে।

দেরি হয়ে যাচ্ছে বলে আমি অধৈর্য হয়ে ড্রাইভারকে বললাম — কী হল, একটু তাড়াতাড়ি চালাও। পেছনের সব অটো চলে যাচ্ছে আমাদের ফেলে। তুমি ঐ অটো ড্রাইভারদের সঙ্গে ইশারায় কী কথা বলছ? অটো ড্রাইভারটি সততার সঙ্গে বলল, আপনাকে অন্য কোনও একটা অটোতে বিক্রি করে দিতে চাইছি। কিন্তু কেউ কিনছে না। আমি চমকে উঠলাম। জলজ্যান্ত আমাকে বিক্রি করে দিতে চাইছে লোকটা। কী কাণ্ড! পর মুহূর্তে আমার একটা অদ্ভুত উপলব্ধি হল। ইদানীং আমার একটা ধারণা হয়েছিল — আমি বেশ একজন নামিদামি লোক। বন্ধুদের প্রশ্রয়ে এবং তাদের তালে পড়ে আমার অহংকার বেড়ে গিয়েছিল।

এখন জানলাম আমার এমনই বাজারের দাম যে, একজন অটো ড্রাইভার আমাকে কিনতে রাজি নয়। আমার অহংকার ধূলিতে মিশে গেল।

বাজারে দেখা হবে

খদ্দেরকে বিক্রেতারা বোকা ভাবেন। কে না জানে, বোকাকে প্রতারণা করা সহজ। বুদ্ধুকে ঠকানোর একটা নিষ্ঠুর আনন্দও আছে। বিজ্ঞাপন থেকে আরম্ভ করে সর্বত্র ক্রেতাকে বোকা বানানোর জাল ছড়ানো। বহুল প্রচারিত একটি বিজ্ঞাপন, যা নজর এড়াবার নয়, — বাই ওয়ান, গেট ওয়ান ফ্রি। অর্থাৎ যেকোনও একটা জিনিস আপনি টাকা দিয়ে কিনুন এবং সঙ্গে বিনামূল্যে আর একটা আপনি পান। ধরুন, একটা শার্ট — তার দাম দুশ টাকা। এখন বিজ্ঞাপন মোতাবেক ব্যাপারটা দাঁড়ায়, দুশ টাকা দিয়ে একটা শার্ট কিনলে আপনি ফ্রিতে আর একটা শার্ট পেয়ে যাবেন। কী আনন্দ! একটার দাম দিয়ে দুটো পাওয়া — এর চেয়ে আর আনন্দের কী হতে পারে! আবার উল্টোদিক থেকে ভাবতে গেলে, ক্রেতার আনন্দ মানে বিক্রেতার নিরানন্দ। একটার দাম দিয়ে বিক্রেতাকে ঠকিয়ে ক্রেতা দুটো জিনিস নিয়ে গেলেন। সবাই জানে, আর যাই হোক তাই হোক — বিক্রেতা অতটা আহাম্মক নন। দোকান খুলেছেন বিক্রেতা, দানপত্র খোলেননি। কেননা, এভাবে চলতে থাকলে দোকানিকে শার্ট নয়, বাড়ির ঘটিবাটি বিক্রি করতে হবে খুব শীঘ্রই।

একটা দাম দিয়ে কিনুন এবং আর একটা বিনামূল্যে পান — এরমধ্যে রহস্যের ইঙ্গিত থাকলেও আসলে তাতে বিন্দুমাত্রও রহস্যের লেশ নেই। একটা শার্টের দাম দুশ — অন্যটা ফ্রি। তার মানে দুটোর দাম দাঁড়াল একত্রে দুশ টাকা — অর্থাৎ একটার দাম হল একশ টাকা। বিজ্ঞাপনটা যদি এমন হত — একটা শার্টের দাম একশ টাকা, দুটোর দাম দুশ টাকা, তিনটার দাম তিনশ টাকা, তাহলে সব ল্যাঠা চুকে যায়। ক্রেতা তার খুশিমতো একটা, দুটো বা তিনটা কিনতে পারেন। সমস্ত ব্যাপারটা সহজ সরল হয়ে যায়। অবশ্য তাতে একটা হুজুগ বানিয়ে 'লুট লেগেছে লুটের বাহার' করার আর অবকাশ থাকে না।

বিক্রেতারা খদ্দেরকে বোকা বানালে দোষ নেই। কিন্তু ক্রেতারা বিক্রেতাকে প্রবঞ্চনা করলে সবাই রে-রে করে তেড়ে আসে। একজন লোক মিষ্টির দোকানে ঢুকে একটা রসগোল্লার অর্ডার দিয়েছে। রসগোল্লার দাম পাঁচ টাকা। লোকটা রসগোল্লাটাকে দেখে-টেখে শেষে বলল, না, রসগোল্লা খাব না। তার বদলে বরং পাঁচ টাকা দামের একটা ছানার বরফি দাও। ছানার বরফি খেয়ে লোকটা যখন দোকান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, দোকানি বলল, দামটা দিয়ে গেলেন

না?

কিসের দাম!

ছানার বরফির দাম? দোকানি বলল।

লোকটা তখন সবিনয়ে জানাল, ছানার বরফির দাম কেন সে দেবে? ছানার বরফি তো সে রসগোল্লার বদলে খেয়েছে।

দোকানি তখন বলল, ঠিক আছে। তবে এখন রসগোল্লার দাম দিন।

লোকটা তখন মুচকি হেসে বলল, আমি তো রসগোল্লা খাইনি। যা খাইনি — তার জন্য কেন দাম দেব? হঠাৎ ছুটে এসে বেরসিকের মতো লোকটির পথ আগলে দোকানি বলল, ইয়ার্কি মারার জায়গা পান না — আগে পয়সা ফেলুন। তবে যাবেন। মিষ্টির দোকানের মালিক যেমন ক্রেতাকে ধমকাতে পারেন, তেমনি শার্টের বিক্রেতাকে ক্রেতা তিরস্কার করতে পারেন না। সে ক্ষেত্রে ক্রেতাও তো বলতে পারতেন — 'একটার দাম দুশ — একটা ফ্রি না বলে বরং সত্যটা বলুন। একটা শার্টের দাম একশ টাকা। ইয়ার্কি রাখুন।

ক্রেতারা মুখের উপর এরকম কথা বলতে পারেন না। কেন পারেন না?

কে ক্রেতা বা খদ্দের এবং কে বিক্রেতা তা বাইরে থেকে চট করে বোঝা যায় না। যেমন যারা চাকরিজীবী তারা বিক্রেতা। তারা তাদের শ্রম বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। অবশ্য শ্রম বিক্রির বিনিময়ে প্রাপ্ত মাইনে নিয়ে যখন তারা বাজারে খরচ করতে যান — তখন তারা বিশুদ্ধ ক্রেতা। বস্তুত চাকরিজীবীরা বিক্রেতা। অবসর নেবার বয়স যখন দ্রুত এগিয়ে আসতে থাকে তখন অনেক চাকরিজীবীর মনে দুঃখ জন্মায়। তাদের মনে হয়, চাকরিতে যে মাইনে পাচ্ছেন — তা যথেষ্ট নয়। তাদের মাইনে অনেক বেশি হওয়া উচিত ছিল। কেননা, হাঁটুর বয়সি আজকালকার ছেলেমেয়েরা তাদের চেয়ে তিন চারগুণ বেশি মাইনে পায়। এ দুঃখ কি সয় প্রাণে!

নতুন প্রজন্ম পুরোনো প্রজন্মের চেয়ে বেশি মাইনে পায় — সেটা উচিত না অনুচিত এই তর্কে না গিয়ে, তারা নিজেরা তাদের যা পাওয়া উচিত তার চেয়ে বেশি পায় কি না সেটা বরং খতিয়ে দেখা যেতে পারে।

একজন আই এ এস অফিসার তার রিটায়ারমেন্টের আগে ষাট বছরের কাছাকাছি বয়সে প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা মাইনে পান। য়ুনিভার্সিটির অধ্যাপকেরাও শুনেছি পান ত্রিশ / পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা। এখন প্রশ্ন হল, বয়সের ভারে ন্যুব্জ এইসব ব্যক্তিদের এত বিরাট অঙ্কের মাইনে পাবার পেছনে কোনও যুক্তি আছে কি?

আলাদা করে আই এ এস বা একজন প্রফেসারকে লক্ষ্যবস্তু করা ঠিক নয়। বরং একজন মাঝারি ধরনের সরকারি কর্মচারীর কথা ধরা যাক — যিনি অবসর নেবার মুখে

মাইনে পাচ্ছেন সাকুল্যে পঁচিশ হাজার টাকা। অবশ্য হঠাৎ তার মাইনে পঁচিশ হাজার হয়নি — দীর্ঘ ত্রিশ / বত্রিশ বছর চাকুরিতে বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট হয়ে হয়ে ওই টাকার অঙ্কে এসে দাঁড়িয়েছে। আসলে একজনের মাইনে নির্ধারিত হয় বা হওয়া উচিত ব্যক্তিটির উৎপাদনশীলতা এবং কর্মক্ষমতার নিরিখে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের উৎপাদনশীলতা এবং কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। তাই যদি হয়, তাহলে মাইনে তো কমার কথা — বাড়ার কথা নয়। অথচ চাকরিজীবীদের মাইনে চাকরিতে জয়েন করার পর থেকে ধীর বা দ্রুত লয়ে বাড়তেই থাকে। এই ক্রমবর্ধমান বেতন বৃদ্ধির পশ্চাতে ব্যাখ্যাটা কী?

একবার চাকরি পেয়ে গেলে — চাকরিটা তার নিজস্ব হয়ে যায়। এইখানে এই পদে আর কেউ ঢুকতে পারে না। চাকরিজীবীরা মূলত বিক্রেতা — আর বিক্রির বাজারে তিনি হয়ে যান একমাত্র বিক্রেতা অর্থাৎ মনোপলিস্ট। মনোপলিস্ট মানে একচেটিয়া। একচেটিয়া বাজারে প্রকৃত দামের চেয়ে এমনি দাম বেশিই হয় — যা হওয়া উচিত নয়। চাকরিজীবীরা তাই যা দাম (মাইনে) আদায় করে নেন তা তাদের প্রাপ্যের চেয়েও বেশি। কথাটা শুনতে রূঢ় শোনাবে বটে — কিন্তু সত্যি।

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, যে লোকটা পঁচিশ হাজার টাকা মাইনে নিয়ে আজ রিটায়ার করেন — পরদিন সকালে দশ হাজার টাকার একটা বেসরকারি চাকরি গ্রহণ করতে উৎসুক হয়ে থাকেন। একদিনে একটা লোকের উৎপাদনশীলতা ও কর্মদক্ষতা এত হ্রাস পায় নাকি?

কোথায় পঁচিশ হাজার — কোথায় মাত্র দশ হাজার। আসলে দশ হাজার টাকাই তার বাজারমূল্য। বিক্রেতা হিসেবে নিজের দাম বাড়িয়ে রেখেছিলেন তিনি। বাজারকে উন্মুক্ত করতেই প্রকৃত মূল্য প্রকাশিত হয়েছে। ক্রেতাকে সাময়িকভাবে বোকা বানাতে পারলেও বাজারকে পারা যায় না।

কাকপক্ষীর সংসার

১১ জুলাই বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদযাপিত হয়। তারপরেও কিছুদিন তার রেশ যায়না। এরপর পালিত হয় বিশ্ব জনসংখ্যা সপ্তাহ। এই দিবস বা সপ্তাহ উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্য হল জনগণকে সচেতন করা। বেশি লোক হলে কী সমূহ ক্ষতি? আশা করা হয় সবাই সচেতন হলে লোকসংখ্যা হ্রাস পাবে ও পৃথিবীতে বসবাস আরও আরামদায়ক এবং আনন্দময় হবে।

ভারত সরকারের একটি জাতীয় জনসংখ্যা নীতি আছে — যাতে বলা হয়েছে আদর্শ পরিবারের আয়তন হবে চার — 'হাম দো হামারে দো'। এমনি লোক দেখানো বা শোনানো শ্লোগানটি হলেও, সরকার প্রকৃত খুশি হবে — 'হাম দো হামারে এক' হলে। অনেকের মতে, জনসংখ্যার চাপে ভারত ন্যুব্জ হয়ে পড়েছে। পৃথিবীর প্রতি ছজনের মধ্যে একজন ভারতীয়। ভারতের লোকসংখ্যা যে হারে বাড়ছে তা খুবই উদ্বেগজনক। অস্ট্রেলিয়ার বর্তমান যা জনসংখ্যা, প্রতি বছর ভারতের লোকসংখ্যা সেই হারে বাড়ে। অর্থাৎ একটা বছর পেরিয়ে গেলেই ভারতের মোট জনসংখ্যার সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের সমতুল্য লোকসংখ্যা যোগ হয়। জনসংখ্যা অনুসারে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ হল ভারত। চিনের পরেই ভারতের স্থান। পণ্ডিতেরা আশঙ্কা করছেন, আগামী দুই দশকের মধ্যে ভারত চিনের জনসংখ্যাকেছাপিয়ে যাবে। আর কিছুতে না হোক, ভারত জনসংখ্যায় বিশ্বে এক নম্বর স্থান দখল করে নেবে।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ভারত সরকারের জাতীয় নীতি সঙ্গতিপূর্ণ নয়। একবার বলা হয়েছিল (এখনও কোনও কোনও রাজ্যে বলবৎ আছে) — দুটি সন্তানের বেশি হলে জনক বা জননী বিধানসভা, লোকসভা এমনকী পঞ্চায়েত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। দুটির বেশি সন্তানের চাকুরিরত জননী আরও অধিক সন্তান অভিলাষী হলে মাতৃত্বের জন্য নির্ধারিত ছুটি পাবে না। এমনকী, চাকরিতে ইনক্রিমেন্ট বন্ধ হয়ে যাবে। পদোন্নতিও আটকে যেতে পারে। এই সব বাধা-নিষেধ আরোপ করার কারণ হল জনক-জননীদের নিরুৎসাহিত করা। কিন্তু ইদানীং শোনা যাচ্ছে, ঐ সব বিধিনিষেধ শীঘ্রই উঠে যাবে। কাউকে সন্তান সংখ্যা নিরূপণে বাধ্য করা যায় না। তাতে মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হয়। নিজে থেকে যদি কেউ জন্মনিয়ন্ত্রণে আগ্রহী হয় সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু সরকার কারোর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তে নাক গলাতে পারে না।

জনসংখ্যা বিষয়ে আমাদের সমাজেরও অবস্থান খুব একটা সুস্পষ্ট নয়। একসময়

'শতপুত্রবতী হও' আশীর্বাদ করা হত নবোঢ়া বধূমাতাকে। মহাভারতের গান্ধারী একশটি পুত্র এবং একটি কন্যার জননী ছিলেন। পৃথিবীর অনেক মনীষী অনিয়ন্ত্রিত পরিবারে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ পিতামাতার চতুর্দশ সন্তান এবং অষ্টম পুত্র। অথচ আমাদের সেই সমাজ এখন মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এখন অতি বৃহৎ পরিবারের কর্তা-গিন্নিকে দেখলে নিজের নিকট আত্মীয়স্বজনেরাও আড়ালে মুখ টিপে হাস্য সংবরণ করে।

চিনের অবস্থা ভারতের চেয়ে শোচনীয় ছিল একসময়। তারা এখন এক লৌহকঠিন জনসংখ্যা নীতি প্রচলন করছে। একটি পরিবার — একটি সন্তান। এর ফলে সেখানে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার দ্রুত কমছে।

এখন আমরা কী করব? মানবাধিকার লঙ্ঘন করা থেকে বিরত থাকব? নাকি, চিনের মতো সুকঠিন জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করব? পৃথিবীটা শুধু মানুষেরই না। এখানে পশুপাখি কীট পতঙ্গেরাও বসবাস করে। তাদের মধ্যেও সংসার ধর্ম বলে একটা ব্যাপার আছে। অগ্রজ কাননবিহারী গোস্বামী একটি আলোচনায় বলেছেন, কাকপক্ষীর সংসারে তো ফ্যামিলি প্ল্যানিং বলে কিছু নেই। কই তার ফলে তো পৃথিবীটা পক্ষীতে ভরে যায়নি। শ্রীগোস্বামী কর্তৃক উত্থাপিত প্রসঙ্গটি খুবই চিত্তাকর্ষক। বিষয়টি আমাকে খুবই ভাবিত করে তোলে। মুরগিরাও জন্মনিয়ন্ত্রণ মানে না — সেইজন্য একই কারণে মুরগিতে গিজ গিজ করার কথা চারদিক। কিন্তু তা হয় না, কেননা, মানুষ মুরগি খেয়ে ফেলে। কিন্তু কাক? মানুষ কাক খায় না। এমনকী কাকও কাকের মাংস ভক্ষণ করে না। তাহলে কাকগুলো যায় কোথায়?

পৃথিবীতে অনেক পশু পাখি মাছ আছে — যারা খুব দ্রুত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। কতগুলো প্রজাতি তো কবেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। কেন ঐ সব প্রজাতি ক্রমশ লোপ পাচ্ছে? মনে হয়, তাদের মৃত্যুর হার জন্মের হারের চেয়ে বেশি। ওদের অসুখ-বিসুখ হলে চিকিৎসা হয় না। হৃদরোগ, ক্যান্সারের মতো জীবননাশী অসুখ ওদেরও বাদ দেয় না। তদুপরি রয়েছে তাদের প্রতি মানুষের নির্দয় ব্যবহার যা মৃত্যুকে ত্বরান্বিত এবং অবশ্যম্ভাবী করে তোলে।

তাছাড়া প্রাণীকুলের মধ্যে মানুষ শুধু বুদ্ধিমানই নয় — হিসেবিও। যে পশুপাখি মানুষের খাদ্য বা অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজন — মানুষ সেগুলোর জন্য মৃত্যুর হার কমিয়ে জন্মের হার বাড়াবার চেষ্টায় নিরলস গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। কিছু ক্ষেত্রে সফলও হয়েছে। দেশি-মুরগি বনাম পোলট্রি বা দেশি মাছ বনাম ইনজেকশান দেয়া মাছের প্রবৃদ্ধির উদাহরণ উল্লেখ করা যেতে পারে।

এখন কথা হল, অন্যের বেলায় জন্ম-মৃত্যু নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেও — নিজের বেলায় বিফল হচ্ছে কেন মানুষ? কেন মন্ত্রী-রাজনীতিবিদ-আমলা-বিশেষজ্ঞরা বছর বছর জ্ঞান দিয়ে দিয়ে কান ঝালাপালা করে দিচ্ছেন, অথচ কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না? কেন

মনুষ্য সংখ্যা কেবল বাড়ছেই?

তর্কের খাতিরে একটা প্রসঙ্গ উত্থাপন করি — জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে ক্ষতিটা কী? দুশ বছর আগে সারা পৃথিবীর লোকসংখ্যা ছিল মাত্র একশ কোটি। আর এখন (২০০১ইং সালে) শুধুমাত্র ভারতেরই জনসংখ্যা একশ কোটির বেশি। সেদিনের সমগ্র বিশ্বের লোকসংখ্যা আজকের ভারতে বাস করে। তাতে ক্ষতিটা কী হয়েছে? আগের চেয়ে আমরা খারাপ আছি? তর্কাতীতভাবে বলা যায়, দুশ বছর আগের চেয়ে আমরা অনেক ভালো আছি। এখন আয়ুষ্কাল বেড়ে হয়েছে সত্তর বছর। সাক্ষরতার হার বল্‌গাহীনভাবে বেড়েছে। মানুষের আয় বেড়েছে। স্বাস্থ্য-শিক্ষা-আয় ক্রমবর্ধমান — জীবন হয়েছে তুলনামূলকভাবে আরামদায়ক ও আনন্দময়। জনসংখ্যা বাড়লে আমাদের জীবনধারণের মান বাড়ে। আমরা অধিক ভালো থাকি — এটি একটি ঐতিহাসিক সত্য। যা অস্বীকার করার উপায় নেই। বেশি জনসংখা নিয়ে যদি বেশি ভালো থাকা যায় — অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে তা মোটেই নিন্দনীয় নয়। আজকের আলোচনাটি তাত্ত্বিক পর্যায়ে চলে যাচ্ছে — এখানে থামা দরকার।

উন্নয়ন বনাম বিষ্যৎবার বারবেলা

ত্রিপুরার অর্থনীতি অনুন্নত। অনেকের ধারণা, যোগাযোগের অপ্রতুলতা বা বিচ্ছিন্নতাই এই অনুন্নতির কারণ। অবশ্য এর মধ্যে একটা বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। যোগাযোগহীনতার জন্য ত্রিপুরা অনুন্নত, নাকি ত্রিপুরা অনুন্নত তাই যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। দুপক্ষ দুটি শিবিরে বিভক্ত। দুপক্ষেরই তাদের স্বপক্ষে যথেষ্ট জোরালো যুক্তি আছে। কোনও পক্ষের যুক্তিই ফেলনা নয়। কেউ কারোর চেয়ে কম যায় না।

কোনও একটি অঞ্চলের উন্নয়ন এবং সেখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যে সম্পর্ক কী রকম অর্থাৎ কোনটা আগে বা কোনটা পরে এ বিতর্কটি, অন্য একটি তৃতীয় পক্ষের মতে, একেবারে অর্থহীন। তারা মনে করেন, ডিম আগে, না মুরগি আগে — এই বিতর্কের শেষ

নেই, শুরুও নেই। সুতরাং এসব আলোচনায় মেতে সময়ের অপচয় করার মানে হয় না। তারা আরও মনে করেন, উন্নয়ন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি — দুটোই একই সঙ্গে চলে। অর্থনীতির উন্নয়ন ঘটলেই যোগাযোগ ব্যবস্থা দৃঢ় এবং সম্প্রসারিত হয় এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা দৃঢ় এবং সম্প্রসারিত হলেই অর্থনীতির উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তীর উন্নয়ন-যোগাযোগ বিতর্কে নিজস্ব একটা অবস্থান ছিল। তিনি একটা প্রবন্ধে লিখেছিলেন, 'উপজাতি-অধ্যুষিত কোনও একটি গ্রামে একটা রাস্তা গেল। তাতে তাদের অনেকদিনের একটা দাবি পূরণ হল। রাস্তার উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে বাজারে এল মোটর গাড়ি। ছোটো ঘোড়ার এখন কোনও কাজ নেই, গরুর গাড়ির মালিক এখন বেকার। ব্যবসায়ীরা নানারকম পণ্যসম্ভার নিয়ে বাজারে এসে জাঁকিয়ে বসল। চালু হয়ে গেল অসম বিনিময় প্রথা। কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের চেয়ে কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের দাম তুলনায় বেশি। সুতরাং কৃষকেরা প্রতিদিন ব্যবসায়ীদের দ্বারা শোষিত হতে লাগল।'

নৃপেনবাবুর লেখা থেকে স্পষ্ট যে, তিনি নিঃশর্ত রাস্তাঘাট যোগাযোগ সম্প্রসারণের বিপক্ষে। অবশ্য এরকম চূড়ান্ত মতবাদে নৃপেনবাবু একা নন, আরও অনেকে বিশ্বাসী। অবিভক্ত আসামের রাজধানী একসময় শিলং ছিল। আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মেঘালয়ের জন্ম হয়। এখন শিলং মেঘালয়ের রাজধানী। গৌহাটি থেকে শিলংয়ের দূরত্ব প্রায় একশ কিলোমিটারের মতো। গৌহাটি-শিলংকে ট্রেনের মাধ্যমে যুক্ত করার প্রস্তাব দীর্ঘদিনের। কিন্তু যতবারই প্রস্তাবটির রূপায়ণের প্রসঙ্গে আসে মেঘালয় রাজ্যের জনগণের একটি অংশ তার প্রবলভাবে বিরোধিতা করে। তারা মনে করে, শিলংয়ে ট্রেন এলে যোগাযোগ সহজ সরল হলেও তাতে স্থানীয় জনগণের উন্নয়ন ব্যাহত হবে। নৃপেনবাবুও এই কথাটিই জোর দিয়ে বলতে চেয়েছেন।

ইতিমধ্যে সময় অনেক বদলেছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণকে আর সেরকমভাবে অচ্ছুৎ বলে মনে করা হয় না। বরং সর্বস্তরে যোগাযোগকে বাড়িয়ে প্রসারিত করে কীভাবে অর্থনীতির উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা যায় — সেটাই বর্তমানের অন্যতম ভাবনা। বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে আগরতলা থেকে কলকাতা যাওয়ার কথাবার্তা তখন চলছে। তখনও দুদেশের সম্মতি পাওয়া যায়নি। সে সময় ত্রিপুরার মুখ্যসচিব এক আলোচনায় বলেছিলেন, বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে যাতায়াত চালু হলে ত্রিপুরার অর্থনীতির চেহারাটা বদলে যাবে। কলকাতা তখন কাছে হবে। ত্রিপুরা থেকে মানুষ যখনতখন কলকাতা যেতে পারবে। কলকাতা থেকে দ্রব্যসামগ্রী বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরায় সহজে চলে আসবে।

মুখ্যসচিবের বক্তৃতা শুনে মনে হয়েছিল, ত্রিপুরার যথার্থ উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার অনুপস্থিতির জন্য। যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলেই ত্রিপুরায় উন্নয়নের বন্যা বইতে থাকবে। মুখ্যসচিবের মতে, কলকাতা এবং ত্রিপুরার

মাঝখানে বাংলাদেশের অবস্থান ত্রিপুরার উন্নয়নের পথে বাধা-প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে আগরতলা-কলকাতা যোগাযোগ স্থাপিত হলেই এই সমস্যার সমাধান হবে। ত্রিপুরার অর্থনীতি উন্নত হবে।

বিহার একটি অনুন্নত রাজ্য। বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গ পাশাপাশি। ওদের মাঝখানে বাংলাদেশ বা বাংলাদেশের মতো কোনও বিদেশি রাষ্ট্রের প্রাচীর নেই। পাটনা থেকে কলকাতা সোজা চলে আসা যায়। দুটি রাজ্যের রাজধানীতে যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য মধ্যবর্তী অন্য কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের সম্মতির অপেক্ষায় থাকার দরকার নেই। বাধার প্রাচীর নেই, যোগাযোগ ব্যবস্থা অব্যাহত — তবু তো বিহার অনুন্নত। কেন অনুন্নত?

ইতিমধ্যে আগরতলা-কলকাতা যাতায়াতের জন্য বাংলাদেশ তার রাষ্ট্রের মধ্য দিয়ে যাবার সম্মতি দিয়েছে। খুবই উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থার। অনেক জল্পনা-কল্পনার পর একটি অধরা স্বপ্ন পূরিত হল বলা যায়। প্রথম প্রথম রোজ একটি করে যাত্রীবাহী পরিবহন আসত বাংলাদেশ থেকে, আর একটি করে যাত্রীবাহী পরিবহন যেত আগরতলা থেকে। কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল, যথেষ্ট যাত্রী হচ্ছে না। তাই বাসের সংখ্যা কমতে আরম্ভ করল। এখন সব দিন বাস চলে না। যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকলেও লোকজন সেই সুবিধে নেবার জন্য আগ্রহী নয়। তবে কি বুঝতে হবে, ত্রিপুরার লোকজন ত্রিপুরার উন্নয়নে পরাঙ্‌মুখ?

কেউ কেউ মনে করেন, এখন প্লেনে কলকাতা যাতায়াতের জন্য সহজেই টিকিট পাওয়া যায়। আগের মতো টিকিটের জন্য দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে পুলিশের লাঠির পিটুনি খেতে হয় না বলেই বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে বাসে যাবার জন্য উৎসাহে ভাঁটা পড়েছে। তবু এখনও কেউ কেউ সে পথে যায় কেননা তুলনামূলকভাবে প্লেনের ভাড়া অত্যধিক, তাই। সংবাদে প্রকাশ, আগরতলা-কলকাতা রুটে ডেকান এয়ার চালু হবে। সেক্ষেত্রে ভাড়া হবে মোটে পাঁচশ টাকা। যা কিনা বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে যাওয়ার জন্য বাসের ভাড়ার অর্ধেক। অনুমান করা যেতে পারে, যাত্রীর অভাবে অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে যাতায়াত ব্যবস্থা উঠে যাবে। যে স্বপ্ন সাকার হয়ে ধরা দিয়েছিল, তা স্মৃতি হয়ে যাবে। কেন এমন হয়?

গৌহাটি থেকে ব্যাংকক বৃহস্পতিবার বিকেলে সপ্তাহে একবার প্লেন যেত। যথেষ্ট যাত্রী হয় না বলে বিমান কর্তৃপক্ষ প্লেনটির চলাচল বন্ধ করে দেয়। আমার অসমিয়া এক বন্ধুকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেন প্লেনটা চলল না। তার উত্তরে তিনি মুচকি হেসে বললেন, বাঙালিদের মত আমরা অসমিয়ারাও সংস্কারে বিশ্বাস করি। বিষ্যুৎবার বারবেলায় আমরা বাড়ির বাইরে সাধারণত বের হই না। শুভ কাজ শুরু করি না। গৌহাটি ব্যাংকক প্লেনটা বিষ্যুৎবার বারবেলায় ছাড়ত। এইজন্য এই অবস্থা। এই হাল। আর কিছু না।

জীবন যেরকম (১)

এসময়ে বাজারে সব্জি খুব সস্তা — এত সস্তা আগে কখনও হয়েছে বলে মনে পড়ে না। শহরের বাবুদের জন্য খুবই ভালো অথচ গ্রামে যারা সব্জি ফলায় তাদের অবস্থা শোচনীয়। বাজারে বেচে অনেক সময় উৎপাদনের ব্যয়ও উঠে আসে না। 'কারোর পৌষ মাস আবার কারোর সর্বনাশ'— বোধহয় একেই বলে।

প্রয়াত নৃপেন চক্রবর্তীর একটা প্রিয় গল্প ছিল। তিনি প্রায়শই গল্পটা শোনাতেন। আমি একাধিকবার নৃপেনবাবুর মুখে গল্পটা শুনেছি। গল্পটা বলার সময় নৃপেনবাবু এতই ভাবাবেগে প্লাবিত হয়ে যেতেন যে, গল্পটা আর শুধুমাত্র গল্প থাকত না — সত্যি বলে মনে হত। আসলে গল্প নয় — সত্যি ঘটনাই হয়তো। ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের পরে পরেই উৎপাদনে বিপ্লব এসেছে। প্রযুক্তিতে পরিবর্তনের ফলে শ্রমের বদলে পুঁজি ব্যবহার করে উৎপাদনের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি সম্ভবপর হয়েছে। কয়লাখনিতে উদ্বৃত্ত কয়লার উৎপাদন হওয়ার জন্য কয়লার দাম ভীষণ কমে যায়। কয়লার দাম কম তাই শীতার্ত নভেম্বর ডিসেম্বরে ইংল্যান্ডের সম্পন্ন পরিবারগুলোর ঘরে কয়লার আগুনে উষ্ণ পরিমণ্ডল। শীতের দিনে কয়লার গনগনে আগুনে হাত-পা সেঁকে নেয়ার মৌজই আলাদা।

কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হল — সে বছর অতিরিক্ত কয়লা উত্তোলন খনি থেকে হয়েছে বলে বহু শ্রমিক উদ্বৃত্ত হয়ে যায়। তাদের বস্তুত কোনও কাজ নেই। ছাঁটাই হয়ে যাওয়া একটি শ্রমিকের নাবালক পুত্র তার মাকে প্রশ্ন করে, 'মা, উৎপাদন বেশি বলে বাবার এখন কাজ নেই। কাজ নেই তাই আর্থিক অনটনের জন্য আমাদের ঘরে কয়লা বাড়ন্ত। আমরা শীতে কষ্ট পাই। কেন এমন হয়?

আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি যখন পড়াশুনা করছিলাম — তখন আমার একজন অধ্যাপক প্রায় এরকমই একটা গল্প বলেছিলেন। যা আমি ভুলিনি — ভুলবও না কখনও।

একজন বড়লোক অনেক অর্থব্যয় করে একটা দারুণ সুন্দর বাড়ি বানিয়েছেন। একেবারে ছবির মতো বাড়ি। পথচারীরা পথ দিয়ে যাবার সময় অন্তত একদণ্ডের জন্যে হলেও থমকে দাঁড়াবেই। দৃষ্টিনন্দন ব্যয়বহুল বাড়িটির বানানো প্রায় সম্পূর্ণ। বাড়িটির দক্ষিণ খোলা — সামনের দিক রয়েছে ঝুলন্ত ব্যালকনি। আনুষ্ঠানিক গৃহপ্রবেশের পর বাড়ির মালিক

অধীর আগ্রহে সামনের শুক্লপক্ষের পূর্ণিমার জন্য অপেক্ষা করে আছেন। আগামী পূর্ণিমায় তিনি ইয়া বিরাট চাঁদকে ব্যালকনি থেকে দেখবেন। ব্যালকনি থেকে চাঁদকে কাছে পাবার ব্যাপারটা ভাবতেই তিনি পুলকিত বোধ করছেন। তিনি অপেক্ষা করছেন কবে পূর্ণিমা আসবে তার জন্য।

এ পাড়াতেই অন্যপ্রান্তে রয়েছে বিত্তহীন রিক্ত গরিবেরা। তারা অজানা আশঙ্কায় জবুথবু হয়ে আছে। এখনই এমন শীত — আসছে পূর্ণিমায় আরও জাঁকিয়ে শীত পড়বে — তখন আরও কষ্ট বাড়বে। পূর্ণিমা যত দেরি করে আসে ততই ভালো। না এলে আরও ভালো। পূর্ণিমা আসছে দুপক্ষের কাছে বিপরীত দুই বার্তা নিয়ে। পরিহাস, জীবনেও প্রায় এ রকমটাই ঘটে। হামাগুড়ি দেয়া নিজের আত্মজের দিকে তাকিয়ে বাবা ভাবেন — পুত্রটি কবে বড়ো হবে? বড়ো হয়ে স্বাবলম্বী হবে। নিজের পায়ে দাঁড়াবে। পুত্রটি একদিন বড়ো হয়, স্বাবলম্বী হয় এবং নিজের পায়ে দাঁড়ায় — কিন্তু ততদিনে বাবা আর নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারেন না — তাঁকে লাঠি ভর করে পথ চলতে হয়। একজনের ভালো হলে আরেকজনের ভালো হয় না। অন্তত আপাতদৃষ্টিতে তাই তো মনে হয়। অবশ্য এটা উচিত কি উচিত না এটা ভিন্ন তর্ক। সেই তর্কে যেতে চাই না। কেননা, আলোচ্য তর্ক বস্তুটিকে প্রসারিত করলে তিনটি পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে — (এক) পরিবর্তনের ফলে দুপক্ষেরই ভালো হল (দুই) এক পক্ষের ভালো হল, অন্যপক্ষের ক্ষতি হল না, আগে যা ছিল তাই রইল এবং (তিন) একটি পক্ষের খুব বেশি ভালো হল, অন্যপক্ষের ক্ষতি হল। অবশ্য ক্ষতি এমন হল যে, পরিমাণ যা, তা লাভবান পক্ষ ক্ষতিপূরণ দিয়ে পুষিয়ে দিল। তাতে নিজের লাভের পরিমাণ কমল বটে, আখেরে তার লাভ কম হলেও বহাল রইল। এগুলো অর্থশাস্ত্রের কচকচানি, এগুলো বরং থাক।

নৃপেন চক্রবর্তীর প্রিয় গল্পটি ইংল্যান্ডের আর আমার অধ্যাপকের গল্পটি সম্ভবত চিন দেশের কোনও নীতি বিষয়ক উপাখ্যান। এ রকম গল্প প্রায় প্রতিটি দেশেই খুঁজলে পাওয়া যায়। একটি রাশিয়ান উপাখ্যানের এখানে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। গ্রামের একটি সরল সিধে মানুষের দুই মেয়ে। তাদের বিয়ে-থা হয়েছে। মেয়েদের শ্বশুরবাড়ি খুব দূরে নয়। কাছেই — ভিন গাঁয়ে। অনেকদিন আগের কথা — তখনও গাড়ি-টাড়ির প্রচলন হয়নি। গ্রাম থেকে গ্রামে হেঁটেই যেতে আসতে হয়।

গ্রামের লোকটির স্ত্রী বলল, মেয়েদের খোঁজখবর বেশ কিছুদিন হল পাই না। একদিন নিজে গিয়ে দেখে এসো ওরা কেমন আছে। ওদের জন্য পরাণটা পোড়ে।

গ্রীষ্মের তীব্র দহনে হেঁটে হেঁটে লোকটা প্রথমে তার বড়ো মেয়ের বাড়ি গেল। দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে রওনা হওয়ার আগে বাপ মেয়েকে জিজ্ঞেস করল — 'ফিরে গেলে

তোমার মা জানতে চাইবে মেয়ে-জামাই কেমন আছে। তুমি বলে দাও আমি কী বলব?'

বড়ো মেয়ে বলল, যে রোদ দেখছ বাবা, কয়েকদিনের মধ্যে যদি বৃষ্টি না নামে তবে আমাদের খেতের ধান পুড়ে ঝলসে যাবে। যদি তাই হয়, আমাদের তখন নিঃস্ব হয়ে রাস্তায় নামতে হবে।

ফেরার পথে পাশের গাঁয়ে ছোটো মেয়ের বাড়ি গেল লোকটা। বড়ো মেয়ের মতোই ছোটো মেয়ে বাপকে বিদেয় দেওয়ার সময় অশ্রুসজল চোখে বলল, বাবা আমাদের মাটির হাঁড়িকুড়ির ব্যবসা। এই রোদটা যদি না থাকে, যদি বৃষ্টি নামে কদিনের মধ্যে — তবে আমাদের সর্বনাশ। মাটির হাঁড়িকুড়ি সব গলে যাবে। আমাদের তখন নিঃস্ব হয়ে রাস্তায় নামতে হবে।

নিজের বাড়ি ফিরে এলে স্ত্রী বলল, 'কই, কিছু বলছ না যে। আমাদের মেয়ে-জামাইয়েরা কেমন আছে?'

লোকটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, ওরা এখন কেমন আছে তা আমি সঠিক বলতে পারব না। তবে এটা আমি হলফ করে বলতে পারি — আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই তোমার অন্তত এক মেয়ে-জামাই নিঃস্ব হয়ে রাস্তায় নামছে।

জীবন যেরকম (২)

এক.

নবজাত সন্তান পুত্রও হতে পারে আবার কন্যাও হতে পারে। পুত্র অথবা কন্যা হওয়ার সম্ভাবনা বা প্রবাবিলিটি সমান-সমান। স্বভাবতই পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার অর্ধেক পুরুষ অর্ধেক নারী হওয়ার কথা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। পৃথিবীতে নারীর সংখ্যা পুরুষের চেয়ে কম। ভারতের নরনারীর অনুপাত আরও উদ্বেগজনক। ২০০১ সালের আদমসুমারি অনুসারে, প্রতি এক হাজার পুরুষের বিপরীতে নারীর সংখ্যার হল ৯৩৩। অর্থাৎ হাজারে পুরুষের তুলনায় ৬৭ জন নারী কম। তত্ত্বগতভাবে এই নারীদের আজকের ভারতে থাকার কথা ছিল। কিন্তু তারা অনুপস্থিত। তারা কোথায়।

তারা সম্ভবত জন্মায়নি। আর জন্মালেও তারা এখন নেই, তারা মারা গিয়েছে। তারা জন্মায়নি কথাটি খুব রহস্যজনক। জন্মায়নি, নাকি তাদের জন্মাতে দেয়া হয়নি। এ নিয়ে সংশয় আছে। ভারতে নীরবে লোকচক্ষুর অন্তরালে একটা অদ্ভুত এবং অমানবিক কাণ্ড ঘটছে। যদি কোনওভাবে জানা যায়, মায়ের জঠরে বর্ধিষ্ণু ভ্রূণটি কন্যা সন্তানের, তখন নানা কারণে তার জন্ম হয়ে ওঠে অনাকাঙ্ক্ষিত। সেক্ষেত্রে কন্যাটি যাতে ভূমিষ্ঠ হয়ে পৃথিবীর আলো দেখতে না পায় তার ব্যবস্থা করতে চেষ্টার কোনও ক্রটি করা হয় না। আবার অনেক ক্ষেত্রে আনাকাঙ্ক্ষিত কন্যা সন্তানের জন্মের পরে সংসার এমন হৃদয়হীন হয়ে ওঠে যে তারা স্বল্পায়ু হয়ে আবার ফিরে যায়। সমাজে তো বটেই, এমনকী নিজের পরিবারের মধ্যেও কন্যারা নিদারুণ বৈষম্যের শিকার হয়ে অকালমৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়। ফলশ্রুতিতে দেখা যায়, নরনারীর সংখ্যা সমান সমান হওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও, নারীরা সংখ্যায় কম।

মজার ব্যাপার হল, স্বাস্থ্যগত কারণে, মহিলাদের আয়ুষ্কাল পুরুষদের চেয়ে বেশি। মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে অধিক বাঁচে। তারা অনেক বেশি পরিশ্রমী এবং সহনশীল হয়। উচ্চরক্তচাপজনিত অসুখ-বিসুখ তাদের হয় কম। পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, একজন পুরুষ একশ বছর বাঁচলে, একজন মহিলা একশ ছ বছর বাঁচে। সম্ভবত এই জন্য, সংসারে বিপত্নীকের চেয়ে বিধবার সংখ্যা বেশি। এই হিসেবে, জনসংখ্যায় পুরুষেরা নারীদের চেয়ে কম হওয়ার

কথা। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে দেখা যায়, নারী পুরুষের অনুপাতে নারীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। সেখানে মেয়েদের জন্ম অনাকাঙ্ক্ষিত নয়, সেখানে মেয়েরা অবহেলা অনাদরের শিকার হয় না। সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী হয়ে বাঁচে দীর্ঘদিন। তাই ইউরোপ, আমেরিকা এবং অনেক উন্নত দেশে দেখা যায়, প্রতি এক হাজারে পুরুষের বিপরীতে রয়েছে এক হাজারের চেয়ে বেশি এক হাজার চল্লিশ-পঞ্চাশ জন নারী। একটি দেশ বা অঞ্চল উন্নত কি উন্নত নয় তা জানার সহজ উপায় হল, সেখানকার পুরুষ নারীর জনসংখ্যার অনুপাতের অঙ্কটি জেনে ফেলা। যদি দেখা যায়, নারীরা সেখানে পুরুষদের চেয়ে সংখ্যায় বেশি, তাহলে মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে, অঞ্চলটি উন্নত। অবশ্য তার ব্যতিক্রমও থাকতে পারে। যেমন, কেরালা। কেরালাতে প্রতি হাজার পুরুষের বিপরীতে রয়েছে ১০৫৮ জন মহিলা। আসলে যতটা উন্নত কেরালাকে মনে করা হয়, কেরালা ততটা উন্নত নয়। কেরালায় পুরুষেরা মহিলাদের তুলনায় সংখ্যালঘু কারণ, কেরালার অনেক পুরুষ ভাগ্যান্বেষণে মধ্যপ্রাচ্যে দেশান্তরী হয়ে আছে। তাই পুরুষের সংখ্যা সেখানে সম্ভবত কম। কেরালা আসলে ভারতবর্ষের বাইরে নয়, অধ্যাপক অর্মত্য সেন যাই বলুন আর তাই বলুন।

দুই.

গর্ভস্থ সন্তানের লিঙ্গ অগ্রিম জানার জন্য প্রযুক্তি এখন দুয়ারে উপস্থিত। সোনোগ্রাফি যন্ত্র দিয়ে এমনিতে শরীরের অভ্যন্তরে কোথায় পাথর বা স্টোন লুকিয়ে আছে সহজে জানা যায়। পাথরের অবস্থানটি জানতে পারলে তারপর অস্ত্রোপচার করে পাথর বের করে আনা প্রায় জলভাতের মতো সহজ ব্যাপার। সোনোগ্রাফি মেশিন পাথরের অবস্থান নির্ণয় করে সফল অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে জীবনকে যন্ত্রণামুক্ত করেছে। পাথরজনিত শারীরিক কষ্ট লাঘবের মতো কন্যা সন্তানের জন্মের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিতেও সোনোগ্রাফির জুড়ি নেই। সোনোগ্রাফির মাধ্যমে আগেভাগে নবজাত সন্তানের লিঙ্গ জেনে প্রয়োজনে ভ্রূণহত্যা করে বা না করে জীবনকে দুশ্চিন্তামুক্ত করা এখন সম্ভব। সঙ্গতভাবে মানসিক কারণে, সরকার পূর্বাহ্নে সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণকে বে-আইনি ঘোষণা করেছেন। এই আইন লঙ্ঘনের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা আছে। তবু, কে না জানে লুকিয়ে-চুরিয়ে নার্সিংহোম এবং ক্লিনিকগুলোতে সোনোগ্রাফির মাধ্যমে সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণের রমরমা বাণিজ্য চলছে।

তিন.

কোনও এক নার্সিংহোমের সোনোগ্রাফির টেকনিশিয়ান নিজের বাড়িতে সোনোগ্রাফির মেশিন এনেছে একটা। গোপনে বাড়িতে সন্তানসম্ভবা মায়েদের পরীক্ষা করে আগাম বলে

দেয়, নবজাত সন্তানটি পুত্র না কন্যা। অ্যাবরশান বা ভ্রূণহত্যা ব্যাপারটার সঙ্গে সে যুক্ত নয়। অগ্রিম লিঙ্গ বলে দেয় সে, তাতে তার খুব পসার। উপরি আয়ে সংসারে তার এসেছে সচ্ছলতা। টেকনিশিয়ানের নিজের স্ত্রী যখন অন্তঃসত্ত্বা, তখন সোনোগ্রাফি মেশিনে পরীক্ষা করে সে খুব উৎফুল্ল হল। বাইসাইকেল কিনল অনাগত পুত্রের জন্য। কিন্তু নিয়তির পরিহাস, যথাসময়ে টেকনিশিয়ানের স্ত্রী কন্যাসন্তানের জন্ম দিল। একটি নয় — দুটি। যমজ কন্যাসন্তান। হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে সে রাগে দুঃখে প্রথম যে কাজটি করল, তা হল সোনোগ্রাফি মেশিনটা কলেজটিলার লেকের জলে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

টেকনিশিয়ানের মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড়। ঘরে যমজ কন্যাসন্তান। লেকের জলে সোনোগ্রাফি মেশিন। উপরি আয় শূন্য। অনেক কাকুতিমিনতি করে এবং স্ত্রীর মনোরঞ্জনের শেষে সে জানতে পারল, লেকের কোথায় ফেলা হয়েছে মেশিনটাকে। অবাক কাণ্ড, মেশিনটা তখনও চালু ছিল, অকেজো হয়ে যায়নি। বিলেতি মেশিন তো, তাই। আরও অবাক কাণ্ড, সোনোগ্রাফি মেশিনে তরঙ্গ প্রতিবিম্বিত হতে লাগল এবং তাতে সহজে জানতে পারা গেল, জলের ঠিক কোথায় মাছেরা ঘাই মারছে।

টেকনিশিয়ান সোনোগ্রাফি মেশিন আর বড়শি নিয়ে মাছ ধরতে কলেজটিলার লেকে টিকিট কেটে এসে মাচা বেঁধে বসল। অন্যান্য মৎস্যশিকারিরাও সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত হন্যে হয়ে বসে থাকে মাছের আশায়। তাদের বড়শির ফাৎনা আর নড়ে না। অথচ টেকনিশিয়ান একটার পর একটা মাছ ধরছে। ডোলা ভর্তি হয়ে উপচে পড়ছে মাছ। সোনোগ্রাফি মেশিনের নির্দেশমতো মাঝে মাঝে এখান থেকে সরে ওখানে যাচ্ছে সে।

ভাগ্য মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল একবার। মনে হয় আবার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়েছে তার। সোনোগ্রাফি মেশিন দিয়ে মাছেরা জলের গভীরে কোথায় আছে জেনে টেকনিশিয়ান অন্যান্য মৎস্যশিকারিদের কাছে তথ্যটা দেয়। বিনিময়ে একটা নির্দিষ্ট ফি নেয়। লিঙ্গ নির্ধারণের ব্যবসা হারিয়ে তার যা ক্ষতি হয়েছে, মাছের অবস্থান নির্ধারণ করে তা বিক্রির মাধ্যমে পুষিয়ে যাচ্ছে এখন।

চার.

যমজ কন্যারত্ন দুজনের বিয়ে হয়েছে। তাদের বিয়ের সুবাদে পুত্রসম দুই জামাতাকে পেয়েছে টেকনিশিয়ান দম্পতি। কন্যাদের দৌলতে ডাবল পুত্রলাভ। জামাই বাবাজীবনেরা কোনও অংশেই পুত্রের চেয়ে কম নয়। শাশুড়িকে এক জামাই যদি ডাকে মা, অন্যজন ডাবল করে ডাকে, মা, মা। কন্যারত্ন এবং জামাতা বাবাজীবনদের নিয়ে সুখে কালাতিপাত করছে টেকনিশিয়ান প্রৌঢ় দম্পতি।

স্বার্থপরতার এপিঠ ওপিঠ

যে গল্পটা আমি এখন লিখছি — এটি আমি শুনেছি অনেকদিন আগে। ঐ পুরোনো গল্পটা খানিকটা অদলবদল করে শোনাচ্ছি এবার।

মৃত্যুশয্যায় শুয়ে এক বৃদ্ধ তার চার পুত্রকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, এখন আমার যাবার সময় হয়েছে। যাবার আগে তোমাদের কয়েকটা জরুরি কথা বলে যেতে চাই। তোমরা মন দিয়ে শোনো।

ছেলেরা হাউহাউ করে কান্নাকাটি শুরু করে দিল। বৃদ্ধ পোড়খাওয়া লোক। অসহিষ্ণু হয়ে বললেন, কান্নাকাটি পরে করলেও চলবে। মানে কান্নাকাটি করার জন্য পরে অঢেল সময় পাবে। এখন আমাকে আমার কথাগুলো বলতে দাও। তোমরা জানো, পুরো সম্পত্তি তোমাদের চার ভাইয়ের মধ্যে সমানভাগে ভাগ করে দিয়েছি। স্থাবর অস্থাবর সব সম্পত্তি উইল করে তোমাদের নামে লিখে দিয়ে গেলাম। তোমাদের চিন্তার কোনও কারণ নেই। যা রেখে গেলাম, তাতে তোমদের জীবন হেসে খেলে ভালোই কাটবে।

বাবার কথা শুনে ছেলেরা আশ্বস্ত হল। উইলের কথা জেনে সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। আজকাল বাবারাও চালাক-চতুর হয়ে গিয়েছে — মৃত্যুর সময় যা বলে যায় পরে দেখা যায় উইলে ঠিক উল্টোটা করে রেখেছে। ওদের বাবা ওরকম নন — কথায় ও কাজে তিনি এক।

বাবার কথা শেষ হয়নি। গলা খাঁকারি দিয়ে কেশে তিনি বললেন, সময় বড়ো কম। আমার আসল কথা এখনও বলা হয়নি। সেটা তোমরা মন দিয়ে শোনো — কেননা তার ওপরই নির্ভর করছে সবকিছু।

তারপর বৃদ্ধ যা বললেন তার সারাংশ হল এই ঃ এই বৃদ্ধকে শহরের প্রতিবেশীরা দুচক্ষে দেখতে পারে না। সবসময় শাপ-শাপান্ত করে। কারণটা তেমন কিছু না — কিন্তু বেশ ব্যতিক্রমী। বাড়ির লাগোয়া একটি বিরাট পুকুর আছে। বৃদ্ধ তার মালিক। পাড়ার লোকেরা পুকুরের জল যথেচ্ছ ব্যবহার করে বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। পড়শিরা পুকুরের জলে গরু বাছুর স্নান করায়, কাপড়চোপড় কাচে আবার সেখান থেকে খাবার জলও নেয়। পুকুরের জল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, ব্যবহার উপযোগী আর থাকছে না দেখে বৃদ্ধ একদিন একটা কাণ্ড করে

বসলেন। হুকুম জারি করলেন, এই পুকুর থেকে শুধু খাওয়ার জন্য জল নেয়া যাবে — অন্য কোনও কারণে জল ব্যবহার করা যাব না।

এতে পাড়াপড়শিরা রেগে কাঁই। তাদের প্রত্যেকের স্বার্থে ঘা লেগেছে। এরা বলতে শুরু করল, ব্যাটা, বজ্জাত। লোককে জল ব্যবহার করতে দেয় না। পাড়াতে একটাই পুকুর — সেটাতেও যদি এরকম বাধা-নিষেধ হয় তো লোকের কত অসুবিধে। নিজের পুকুর বলে যেন মানুষের মাথা কিনে নিয়েছে। হারামজাদা কাঁহাকার।

মৃত্যুর সময় বৃদ্ধের মনে দুঃখ চাগিয়ে উঠছে। পাড়াপড়শিরা তাকে পছন্দ করত না। গালিগালাজ করত। বলত — বজ্জাত, হারামজাদা। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে বৃদ্ধ ছেলেদের বললেন, আমার শেষ ইচ্ছা, আমার মৃত্যুর পর তোমরা এমন কোনও জনকল্যাণমূলক কাজ করবে যেন সবাই বলে — হ্যাঁ ছেলেগুলোর বাপটা ভালো ছিল বটে। কী করলে লোকেরা আমাকে ভালো বলবে আমি তা তোমাদের উপর ছেড়ে দিলাম। তোমরা ভাইয়েরা বসে আমার মৃত্যুর পর ভেবে সেটা কোরো, কেমন? আমি উইলে লিখেছি — যদি তোমরা তা না কর, তবে আমার সম্পত্তির ছিটেফোঁটাও তোমরা পাবে না। মোদ্দা কথা, তবে আমার সম্পত্তির ওপর তোমাদের কারোরই কোনও অধিকার থাকবে না। অন্যথায় সম্পত্তি সরকারের হেফাজতে চলে যাবে। বলো তোমরা রাজি কি না — তোমাদের কথা শুনে শান্তিতে আমি দুচোখ বুজি।

ছেলেরা কাঁদতে কাঁদতে তখনকার মতো বলল, রাজি।

ছেলেরা বাবার মুখে গঙ্গাজল দিল। নিশ্চিন্ত হয়ে বাবা দুচোখ বুজলেন।

এতক্ষণ পর্যন্ত শুনে মনে হতে পারে — এটা এমন কী গল্প। স্রেফ সাদামাটা একটা গল্প বলেই তো মনে হচ্ছে। আসলে তা না। গল্পটার মধ্যে একটা মোচড় আসছে শেষে।

বাবার মৃত্যুর পর ছেলেরা ভাবতে বসল — বাবার সুনামের জন্য কী করা যায়। একজন বলল, বাবার স্মৃতিতে একটা হাসপাতাল করা যেতে পারে। প্রস্তাবটা খারাপ না — তবে দেখা গেল তাতে অনেক খরচ এবং এতে ছেলেদের ভাগে প্রাপ্ত সম্পত্তিজনিত ধনের পরিমাণ কমে যাবে। প্রস্তাব এল, একটা স্কুল করলে কেমন হয়? হয়তো হয় ভালোই। কিন্তু তাতেও খরচ বেশ। শেষে দেখা গেল, যাই করা হোকনা — সবেতেই খরচ আছে। অথচ বাবাকে ওরা কথা দিয়েছে কিছু একটা তারা করবেই। কিছু একটা না করে তাদের উপায়ও নেই। উইলের শর্তানুসারে পুরো সম্পত্তিটাই হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে।

সম্পত্তিও থাকবে, খরচও হবে না — আবার বাবার সুনাম বৃদ্ধি পাবে — কী করলে এটা সম্ভব — এক ঢিলে তিন পাখি বধ, ছেলেরা সেই লক্ষ্যে মতলব আঁটতে লাগল। ছেলেরা খুব স্মার্ট বলতে হবে — শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেল সেই ইপ্সিত পন্থা।

পরদিন দেখা গেল, যে পুকুর থেকে পাড়াপড়শিরা শুধু খাবার জল নিত সেই পুকুরের চারপাশে বেড়া দিয়ে প্রবেশ নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে।

বেড়া ডিঙিয়ে পুকুরে ঢুকতে না পেরে প্রতিবেশীরা রাগে-দুঃখে তখন বলতে লাগল, ছেলেগুলো হল হাড়ে হাড়ে বজ্জাত। ছেলেগুলো খাবার জলও নিতে দিচ্ছে না —বাপটা তো খাবার জল অন্তত নিতে দিত। বাপটা সত্যিই ভালো ছিল।

গল্পটা এখানেই শেষ। গল্পটা শুনে অনেকেই প্রতিবেশীদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে একবাক্যে বললেন, ছেলেগুলো পাজি, অমানুষ। ওরা পাষণ্ড। বাপের আত্মা স্বর্গে গিয়েও শান্তি পাবে না। স্বার্থপরতারও একটা সীমা আছে। ছিঃ।

সনাতনী চিন্তাধারায় কাজটা খুবই গর্হিত হয়েছে বলে মনে হবে। খোলা মন নিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে এতে খুব একটা দোষ হয়নি। মানুষ মোটামুটি স্বার্থপর, নিজের স্বার্থ ছাড়া কেউ আর কিছু বোঝে না — বুঝতে চায় না। সবসময় পেতে ভালো লাগে। কিছু দিতে বড়ো কষ্ট। সংসারটা এভাবেই চলছে। না দিয়ে থাকতে পারলে ভীষণ আনন্দ। এতসবের পরেও একথা বলতে হবে — গল্পটি একটি ন্যক্কারজনক স্বার্থরপরতার গল্প এবং অতি অবশ্যই নিন্দনীয়।

এই গল্পটি শুনে আগরতলা পুরসভার পুরপিতা শ্রী শংকর দাশের কী প্রতিক্রিয়া? কাল্পনিক এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, বৃদ্ধের ছেলেরা, আমি বরং বলব, ভালো। এরা পুকুরটার চারধারে বেড়া দিয়ে বুজিয়ে ফেলেনি তাতে আমি খুশি। এরা সুনাগরিক।

ত্রিপুরা দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সভাপতি অধ্যাপক মিহির দেবের কাল্পনিক সাক্ষাৎকারে যোগাযোগ করলে তিনি জানান, ছেলেগুলো কুষ্মাণ্ড বা পাষণ্ড তা আমি মনে করি না। পুকুরের চারপাশে বেড়া দিয়ে ওরা ঠিক কাজই করেছে। জলকে দূষণের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের পক্ষ থেকে সভাপতি হিসেবেও ওদেরকে সাধুবাদ দিই। এরা পরিবেশ-বান্ধব। কাল্পনিক সাক্ষাৎকারে পুরপিতা শ্রী শংকর দাশ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সভাপতি অধ্যাপক মিহির দেবের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারা গেলেও সদ্য পরলোকগত বৃদ্ধের সঙ্গে বি এস এন এলের নেটওয়ার্ক বিজি থাকার কারণে যোগাযোগ করা শেষ পর্যন্ত যায়নি।

বীরবিক্রম বিমানবন্দর

মহারাজা কিরীটবিক্রম মাণিক্যের আকস্মিক প্রয়াণে ত্রিপুরা রাজ্যবাসী শোকস্তব্ধ। গণতন্ত্রের রমরমার যুগে এই রাজন্যপ্রীতি অঙ্কের হিসেবে মেলে না। আসলে রাজা বললেই মনশ্চক্ষে যে ছবি ভেসে ওঠে তা হল, রাজা হবেন স্বৈরাচারী এবং যুদ্ধবাজ। ত্রিপুরার মহারাজারা দুটোর কোনওটাই নয়। তাঁরা প্রজাবৎসল এবং জনগণহিতৈষী। প্রতিবেশী অবিভক্ত বাংলা থেকে কার্যকারণে যখন জনস্রোত ত্রিপুরায় এসেছে, ত্রিপুরার মহারাজা সে সময় তাদেরকে এরাজ্যে আশ্রয় এবং পুনর্বাসনের যথাযথ ব্যবস্থা করেছেন। এত বড়ো মানবিক উদারতার দৃষ্টান্ত খুব কমই আছে। রাজ্যের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রতি মহারাজাদের অপত্যস্নেহ ও প্রীতির বন্ধন অচ্ছেদ্য। স্বভাবতই রাজ্যের আপামর জনগণ ত্রিপুরার রাজপরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞতায় এবং স্নেহডোরে আবদ্ধ।

ব্যক্তিগতভাবে কিরীটবিক্রম ছিলেন স্বল্পভাষী, অমায়িক এবং বন্ধুবৎসল। একসময় ত্রিপুরার রাজপরিবার এবং রবীন্দ্রনাথ নিয়ে একটা লেখার বিষয়ে প্রায়শই আমাকে রাজ অন্তঃপুরে যেতে হত। মহারাজা কিরীট বিক্রম ও মহারাণী বিভুদেবীর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। অনেক অপ্রকাশিত তথ্য আলোচনার মাধ্যমে তাঁদের কাছ থেকে বিশেষ করে মহারাজা কিরীটবিক্রমের কাছ থেকে জানার সুযোগ আমার হয়েছে। তাছাড়া রাজপরিবারের সদস্য এবং নিকট আত্মীয়দের কাছ থেকেও অনেক অমূল্য তথ্য আমি জোগাড় করতে সক্ষম হয়েছিলাম। আমার 'রাজা ও কবি' বইয়ে সেসব তথ্যাবলী আমি অকপটে ব্যবহার করেছি — সেজন্য আমি আমার ঋণ সশ্রদ্ধ চিত্তে স্বীকার করি।

আগরতলা এয়ারপোর্টে কয়েক বছর আগে মহারাজা কিরীটবিক্রমের সঙ্গে আমার দেখা হয়। তিনি সেদিন তাঁর কন্যা রাজকুমারী প্রজ্ঞাকে গৌহাটিগামী প্লেনে তুলে দিতে এসেছিলেন। রাজকুমারী প্রজ্ঞা শিলং যাচ্ছেন। তিনি সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো করছেন। রাজকুমারীর সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন মহারাজা। বিমানে তিনি আমার সহযাত্রিণী ছিলেন। স্বল্প সময়ের আলাপচারিতায়, আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম রাজকুমারীর কাব্যপ্রীতির কথা জেনে। রাজকুমারী কবিতা লেখেন। দেশে বিদেশে তা মুদ্রিত হয়ে প্রশংসা কুড়িয়ে

আনে। মহারাজা বীরচন্দ্রের কন্যা রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবী সেকালের একজন প্রতিভাময়ী কবি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। রাজকুমারী প্রজ্ঞার মধ্যেও আমি সেদিন কবি অনঙ্গমোহিনীর উত্তরাধিকারিণীকে খুঁজে পাবার চেষ্টায় নিমগ্ন ছিলাম।

আগরতলা থেকে গৌহাটিগামী প্লেন ছাড়তে দেরি হচ্ছিল। সেই অবকাশে আমি বিমান বন্দরের লাউঞ্জে মহারাজা কিরীটবিক্রমের সঙ্গে গল্প-সল্প করতে শুরু করে দিলাম। মহারাজা স্বল্পবাক্। কথা বলছিলেন কম। বরং আমিই কথা বলছিলাম বেশি। প্রকৃত বয়সের তুলনায় মহারাজা কিরীটবিক্রমকে অনেক কম বয়সি যুবা বলে মনে হচ্ছিল। আমি হিসেব করে তাঁর ঠিকঠিক বয়স কত বলে দিতেই তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। 'রাজা ও কবি' বইটি লিখতে গিয়ে রাজপরিবারের অনেক ইতিহাস উন্মুক্ত হয়েছিল যা হয়ত অনেকেরই অজানা।

'যেমন ?' মহারাজা কৌতূহল নিয়ে আমাকে প্রশ্ন করলেন। আমি বললাম, ত্রিপুরার রাজন্য প্রথা হল, রাজমাতা বড়োমহিষীর বড়োপুত্র সিংহাসনে আরোহণ করে মহারাজা পদে অভিষিক্ত হন। মজার ব্যাপার হল, রাজপ্রথা এটা হলেও ত্রিপুরার রাজপরিবারের নিয়তি অন্য কথা বলে। মহারাজা রাধাকিশোর পিতা মহারাজা বীরচন্দ্রের বড় ঈশ্বরীর (জ্যেষ্ঠ রাজমহিষী) জ্যেষ্ঠ পুত্র নন। রাধাকিশোর ছিলেন মেজো ঈশ্বরী রাজেশ্বরীর পুত্র। মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোরের প্রথমা স্ত্রী ছিলেন মহারাণী প্রভাবতী দেবী। বীরেন্দ্র কিশোরের পুত্র বীরবিক্রম সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। মহারাজা বীরবিক্রমের মাতা হলেন মহারাণী অরুন্ধতী দেবী। মহারাজা বীরবিক্রমের প্রথমা স্ত্রী ছিলেন বলরামপুরের রাজকন্যা। দ্বিতীয়বার দার গ্রহণ করেন বীরবিক্রম যাঁর — তিনি হলেন পান্নার রাজদুহিতা কাঞ্চনপ্রভা দেবী। মহারাণী কাঞ্চনপ্রভা হলেন কিরীটবিক্রমের মাতা। মহারাজা কিরীটবিক্রমের প্রথমা স্ত্রী হলেন গোয়ালিয়রের রাজকন্যা পদ্মা রাজে সিন্ধিয়া। দুটি কন্যাকে রেখে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর মহারাজা কিরীটবিক্রম দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহণ করেন। বর্তমান মহারাণী বিভুদেবীর দুকন্যা এবং এক পুত্র। পুত্র প্রদ্যোৎকিশোর যুবরাজ পদে অভিষিক্ত হয়েছেন। ইতিহাস সাক্ষী, ঘটনাক্রমে বড়ো মহারাণীর বড়পুত্র মহারাজা হননি বা হতে পারেননি। এমনও হয়েছে বড় ঈশ্বরীর কোনও পুত্র সন্তান হয়নি অথবা পুত্রসন্তান নাবালক। সেক্ষেত্রে অন্য মহারাণীর জ্যেষ্ঠ পুত্র মহারাজা হয়েছেন।

মহারাজা কিরীটবিক্রম বিস্ময়ান্বিত হয়ে বললেন, ইন্টারেস্টিং। এভাবে তো কখনও আমি ভেবে দেখিনি। কিছুক্ষণের মধ্যে প্লেন এসে রানওয়েতে নামল। মহারাজা উদাস দৃষ্টি নিয়ে বাইরে বিমানবন্দরের দিকে জানালা দিয়ে তাকিয়ে বললেন, আজকের আগরতলা বিমানবন্দরের এক সময় নাম ছিল সিঙ্গারবিল এয়ারপোর্ট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সিঙ্গারবিল এয়ারপোর্ট গড়ে উঠেছিল। আমার বাবা মহারাজা বীরবিক্রম এই এয়ারপোর্ট প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

সেদিনের এয়ারপোর্ট উদ্বোধনের ফটো আছে আমার কাছে — মহারাজা উদ্বোধন করছেন এয়ারপোর্টের। আপনার তো রাজপরিবারের ইতিহাস সম্পর্কে আগ্রহ আছে। একদিন আসুন, ছবিটা দেখাব।

খানিক চুপ থেকে মহারাজা কিরীটবিক্রম বললেন, ভারতবর্ষের বিমানবন্দরগুলোর নাম বদলানো শুরু হয়েছে। কলকাতা বিমানবন্দরের নাম বদলে করা হয়েছে নেতাজি সুভাষ বসু এয়ারপোর্ট। গৌহাটির নাম হয়েছে গোপীনাথ বরদলৈ বিমানবন্দর। কৃতী সন্তানদের নামে সেখানকার বিমানবন্দরগুলোর নামকরণ হচ্ছে। আমার খুব ইচ্ছে, আগরতলা এয়ারপোর্টের নাম হোক বীরবিক্রম এয়ারপোর্ট। এই এয়ারপোর্ট বীরবিক্রমের স্মৃতি বিজড়িত। আপনি আসুন, আপনাকে সেই ছবিটা দেখাই।

যোগাযোগের অভাবে মহারাজা বীরবিক্রমের বিমানবন্দর উদ্বোধনের ফটোটি আমার দেখা হয়নি। ত্রিপুরার আধুনিকতার প্রবর্তক, উদার হৃদয় মহারাজা বীরবিক্রমের নামে আগরতলা এয়ারপোর্টের নামকরণ হলে তা হবে ত্রিপুরাবাসীর মহারাজা বীরবিক্রমের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং প্রয়াত মহারাজা কিরীটবিক্রমের ইচ্ছার প্রতি সম্মান প্রদর্শন। এ লেখাটির মাধ্যমে আমি আপামর ত্রিপুরাবাসীর প্রতি প্রয়াত মহারাজা কিরীটবিক্রমের শেষ একটি ইচ্ছার কথা নিবেদন করলাম।

ধাঁধার সমকালীন উত্তর

আপার আসামের শিবসাগর শহর থেকে আরও প্রায় তিরিশ কিলোমিটার দূরের আধা গ্রাম শহরটির নাম হল আমগুড়ি। বছর আড়াই আগে কর্তব্য উপলক্ষ্যে সেখানে আমাকে যেতে হয়েছিল। আমি তখন ছত্তিশগড়ের ভিলাইয়ে কর্মরত ছিলাম। আমগুড়ি পৌঁছুবার আগের দিন স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে শিবসাগরের কাছেই অন্য একটি জেলা ধেমাজিতে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে চোদ্দোজন মারা গিয়েছে। সর্বত্র থমথমে অবস্থা। আমগুড়ি গিয়ে এবং ফিরে এসে গৌহাটিতে পৌঁছানোর পর অনেকে আমাকে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছে, কোনও বিপদ-আপদ ঘটেনি তো?

না, কোনও অসুবিধে হয়নি। সংসারের নিয়মই এ রকম, কোনও কিছুই আটকে থাবে না। ঘটনাচক্রে কখনও কখনও বিরতি ঘটে বটে, কিন্তু তাও সাময়িক। ক্ষণিকের জন্য থেমে আবার আগের মতোই বিরতিহীন চলতেই থাকে সবকিছু। আমগুড়িতে আমাদের কাজ শেষ হওয়ার পর আমাদেরকে আরও দূরধিগম্য এলাকায় একটি চা বাগানে দ্বি- প্রাহরিক ভোজের জন্য যেতে হল। বিশাল একটি চা বাগিচা। বাগিচাটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে নাগাল্যান্ড সীমান্ত শুরু। সর্বত্র সবুজের সমারোহ। বিরাট বিরাট বৃক্ষ — তাদের ছায়ায় দুটি পাতা এবং একটি কুঁড়ির নয়ন মনোহর দৃশ্যাবলী।

চা বাগিচার ম্যানেজারের বাংলোয় দ্বি-প্রহরের ভোজনের ব্যবস্থা। ম্যানেজারের সুরম্য বাংলো আমি আগে কখনও দেখিনি। — এ যেন সিনেমার সেটকেও হার মানায়। আসলে এসব বাংলো বাড়িগুলো ইংরেজ সাহেবরা বানিয়েছিলেন। সাহেব নেই, কিন্তু বাংলোগুলো রয়ে গিয়েছে। বাগিচার ম্যানেজার ভদ্রলোক এদেশী ভারতীয় হলেও আচার-আচরণে ইংরেজ সাহেবদের চেয়ে কোনও অংশে কম নন। তার পরনে স্পোর্টসের ধবধবে শুভ্র কলার তোলা গেঞ্জি, সাদা শর্টস, পায়ে সাদা ক্যাড্স। তিনি স্বয়ং যেন উজালার বিজ্ঞাপন। ভয়ে এবং শ্রদ্ধায় বাগিচার সবাই তাকে সমীহ করে। এমনিতে তিনি বিনয়ী কিন্তু তার কণ্ঠস্বর ব্যাঘ্রগম্ভীর। ম্যানেজার সাহেব গল্পচ্ছলে জানালেন, মুম্বাইয়ের বলিউডের ফারুক শেখ তার বন্ধু। ফারুক একবার এসে এখানে শ্যুটিং করে গিয়েছেন। বাংলো বাড়িটির অন্দর এবং বাহির ছবির মতন

সাজানো। শ্যুটিং করার আদর্শ জায়গা বটে। সমস্ত সৌন্দর্যকে ধরে রাখার জন্য যার একক কৃতিত্ব, তিনি হলেন ম্যানেজারের স্ত্রী স্বয়ং। ভদ্রমহিলার ছেলেমেয়েরা বাইরে, এখানে তার সময় কাটে না। কাজ করার কোনও সুযোগ নেই। চাপরাশি আর্দালির ছড়াছড়ি। এখানে এসে প্রথম তাঁর মন খুব খারাপ ছিল। বাংলোর ঐতিহ্য এবং বাগানের ফুলের পরিচর্যা করতে করতে এখন আর তিনি সময়ে কুলিয়ে উঠতে পারেন না। খানসামা খাবার বানিয়ে দেবার পর তিনি তা স্বহস্তে অতিথিদের সামনে ডাইনিং টেবিলে পরিবেশন করতে লাগলেন। ক্রোকারিজ এবং বাসনপত্র সবই ব্রিটিশ আমলের — শুধু অতিথিরা একালের। পরিবেশন শেষে তিনি এসে আমার পাশে বসলেন। কথাচ্ছলে জানা গেল, তাঁর বাপের বাড়ি ভিলাই। আমি ভিলাই থেকে এসেছি — তাই আমি বাপের বাড়ির দেশের লোক। বাপের বাড়ির দেশের লোককে দেখে অন্যান্য সব মহিলাদের মতোই তাঁর মনটাও ভরে গিয়েছে খুশিতে। নিচুগলায় তিনি ভিলাই রায়পুরের খবরাখবর জেনে নিলেন আমার কাছ থেকে। ছত্তিশগড়ের রাজধানী রায়পুরের পণ্ডিত রবিশঙ্কর শুক্লার বিশ্ববিদ্যালয়ে সত্তর দশকে পড়াশুনো করতেন। পড়তে পড়তে আসামের চা বাগিচার এক তরুণ ম্যানেজারের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়ে যায়। তারপর পড়া ফেলে রেখে তিনি সেই যে এখানে এসেছেন, আজও রয়েছেন, যাননি কোথাও। এখানকার বনানীর প্রেমে তিনি আবিষ্ট। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তার স্পেশাল পেপার ছিল আঞ্চলিক প্রবচন ও ধাঁধা। সময় পেলে এই আমগুড়িতেও স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে মিশে লৌকিক প্রবচন ও ধাঁধা সংগ্রহ করেন।

হঠাৎ তিনি আমাকে অবাক করে দিয়ে বললেন, আপনাকে একটা ধাঁধা বলি। চেষ্টা করে দেখুন তো, উত্তর দিতে পারেন কিনা। প্রশ্ন নিক্ষেপণের আকস্মিকতায় আমি বিমূঢ় হয়ে গেলাম। তাঁর ধাঁধাটি হল ঃ স্বামী-স্ত্রী ঘরে বসে আছে। এমন সময় একজন ব্যক্তি ঐ ঘরে ঢুকল। ব্যক্তিটিকে দেখে স্ত্রী এগিয়ে এসে প্রণাম করল তাকে। পরে ব্যক্তিটি মহিলাটির স্বামীকে চরণ ছুঁয়ে প্রণাম করল। প্রশ্ন হল, ব্যক্তিটি কে? স্ত্রী যাকে প্রণাম করে আবার স্বামী যার প্রণাম পায়, আমি সাংসারিক সম্পর্ক সম্বন্ধে খুবই আনাড়ি। সব তালগোল পাকিয়ে যায়। আমার ধারণা, স্বামী এবং স্ত্রীর মাঝখানে এমন কেউ নেই বা হতে পারে না, যে মধ্যবর্তী স্থান দখল করতে পারে।

ধাঁধাটি বলার কিছুক্ষণের মধ্যেই ভোজনপর্ব শেষ হয়ে গেল। তড়িঘড়ি আমাদের চলে আসার পালা। তাড়াহুড়োর ফলে ধাঁধাটির উত্তর আমার জানা হল না। পরে আমি সুযোগ পেলেই ধাঁধাটি অনেককে বলেছি — যদি উত্তর পেয়ে যাই। বন্ধুরা উপহাস করে বলেছে, ধাঁধা হল মেয়েলি ব্যাপার। মেয়েদেরকে বললে উত্তর পেয়ে যাবে। কমবয়সি মধ্যবয়সি

অনেক মেয়ে বা মহিলাকে আমি প্রশ্নটি করেছি। কেউই উত্তর দিতে পারেনি। শেষে অধিক বয়সি আমার এক মাসিশাশুড়িকে ধাঁধাটি বলতেই তিনি মুচকি হেসে বললেন, এ আর এমন কঠিন ধাঁধা কী? উত্তর তো সহজ। ব্যক্তিটি হল বড় সতীন। স্বামী প্রবরটির দুই স্ত্রী। বড় স্ত্রী ঘরে ঢুকতেই ছোট সতীন তাকে প্রণাম করেছে। এইতো ব্যাপার, তাতে আহামরির কী আছে। এই সহজ উত্তরটি কমবয়সি মেয়েরা কেন জানল না? তারা কি কম স্মার্ট? কৌন বনেগা ক্রোড়পতি বা অন্যান্য ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় দেখি ওদের বেশ রমরমা। তারা ধাঁধাটির উত্তর জানে না, কেননা সমকালীন সাংসারিক অর্থনৈতিক অবস্থানে সতীনের ঠাঁই নেই। আজকালকার স্বামীদের পক্ষেও একজন স্ত্রীর ভরণপোষণ করতেই হিমশিম খেতে হয়, সেখানে দুটি স্ত্রী রাখার প্রশ্নই ওঠে না।

বড়ো কথা এবং শেষ কথা

যতদিন যাচ্ছে, ততই আমার মনের মধ্যে একটা ধারণা বদ্ধমূল হচ্ছে। ধারণাটি হল, যদি কোথাও কোনও ঘটনা ঘটে, তার পশ্চাতে অর্থনৈতিক কারণই দায়ী। আবার যদি প্রত্যাশিত ঘটনাটি না ঘটে তার জন্যও দায়ী কোনও না কোনও অর্থনৈতিক কারণই। অর্থনৈতিক কারণ অর্থাৎ লাভ-ক্ষতির হিসেবই কোনও একটা ব্যাপার সংঘটিত হবার বা না-হবার পশ্চাতে অনুঘটকের কাজ করে।

একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। ব্রিটিশ রাজত্বে নীল বিদ্রোহ হয়েছিল। চাষিরা নীল চাষ করতে চাইত না। কিন্তু ইংরেজ মনিবেরা চাষিদের দিয়ে জমিতে নীল চাষ করাবেই কেননা উৎপাদিত নীলে অধিক লাভ। ফলত কৃষিজমিতে ধান চাষ না করে কৃষকদের বাধ্য করত সে সময় ইংরেজরা নীল চাষ করতে। একটা সময় উপস্থিত হয়েছিল যখন চাষিরা বেঁকে বসেছিল। তারা কিছুতেই নীল চাষ করবে না বরং জমি অনাবাদি করে রেখে দেবে। ইংরেজরা খেপে যায়। চাষিদের দিয়ে নীল চাষ করাবেই তারা। মনিব বলে কথা। মনিবের কথা চলবে না, মানে? অকথ্য অত্যাচারে জর্জরিত চাষিরা বিদ্রোহ করল শেষ পর্যন্ত। উত্তাল বিদ্রোহের মুখে ইংরেজরা রণে ভঙ্গ দেয়। নীল চাষ বন্ধ হয় এবং চাষিরা আবার তাদের জমিতে ধান ও অন্যান্য শস্য উৎপাদনে ফিরে যায়। এ নীল বিদ্রোহকে ভিত্তি করে দীনবন্ধু মিত্রের রচিত নাটক 'নীল দর্পণ' বাংলা সাহিত্য এবং সমাজে তৎকালে আলোড়ন তুলেছিল। কালীপ্রসন্ন সিংহ, মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং রেভারেন্ড লং সাহেবকে আইন আদালতের প্রাঙ্গণে গিয়ে দাঁড়াতে হয়েছিল এই নীল বিদ্রোহ বিষয়ক উপাখ্যানকে কেন্দ্র করে। সে অবশ্য অন্য উপাখ্যান। ইতিহাসে চাষিদের নীল বিদ্রোহকে ইংরেজদের একচ্ছত্র কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে প্রথমবারের মতো চ্যালেঞ্জ হিসেবে গণ্য করা হয়। বিদ্রোহের অবসানে ইংরেজদের নৈতিক পরাজয়কে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে ইতিহাসে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। পরবর্তীকালে সিপাহি বিদ্রোহে জ্বলে উঠেছিল সমগ্র ভারত। ইংরেজরা সিপাহি বিদ্রোহকে নির্মমভাবে দমন করেছিল। যে ইংরেজরা সিপাহি বিদ্রোহের মতো বিশাল বিদ্রোহকে পরাস্ত করতে পেরেছিল, তারা মাত্র কয়েক শত চাষিদের কাছে নীল বিদ্রোহের সময় পরাজয় স্বীকার করল কেন? কেন মেনে নিল, জমিতে নীল চাষ নয়, চাষিদের ধান চাষ বা অন্য যে কোনও চাষ করার অধিকার

আছে।

ইতিহাস লেখায় অনেক সময় আবেগ প্রাধান্য পেয়ে থাকে। আবেগকে বর্জন করে ঘটনাকে নির্মোহ বিশ্লেষণ করলে জানা যায়, নীল বিদ্রোহের সময়কালে জার্মানিতে গবেষণাগারে কেমিক্যালের মাধ্যমে নীল উৎপাদনের পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়ে যায়। এই অভাবনীয় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে নীল ল্যাবরেটরিতে যেমন প্রস্তুত করা সম্ভব, তেমনি সম্ভব জমিতেও জৈবিক পদ্ধতিতে। মজার ব্যাপার হল, দেখা গিয়েছে, ল্যাবরেটরিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ নীল বানাতে যা খরচ, খেতি-জমিতে সেই পরিমাণ নীল প্রস্তুত করতে খরচ অনেক বেশি। ইংরেজরা গোঁয়ার হতে পারে, তবে মূর্খ নয়। তারা বুঝতে পেরেছিল, মিছিমিছি চাষিদের নীল চাষ করাতে বাধ্য করার দরকার নেই। তার চেয়ে সস্তায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গবেষণাগারে নীল বানিয়ে বাজারে বেচলে অনেক লাভ। স্বাভাবিক কারণেই নীলচাষ জমিতে বন্ধ হয়ে যায়। ভালোবাসা বা দুঃখ কোনোটাই এর জন্য দায়ি নয়। ভারতের মাটিতে নীল চাষ চালু এবং বন্ধের জন্য অর্থনৈতিক কারণই দায়ি, অন্য কিছু নয়।

এক সময় বাড়ি বানাতে গেলেই লোকে একটা পুকুর কাটত প্রথম। পুকুরের মাটি দিয়ে বাড়িকে খানিকটা উঁচু করা হত যেন বৃষ্টি বা বন্যার জল ঢুকে না যায়। পুকুরের ছিল দরকার অন্য কারণেও। স্নানের জন্য, গৃহস্থালী ক্রিয়াকর্মের জন্য, মাছের জন্য। এখন পানের জন্য বা স্নানের জন্য পুকুরের জলের দরকার নেই, সেক্ষেত্রে পুরসভার সাপ্লাইয়ের জল পাইপের মাধ্যমে দোরগোড়ায় হাজির। মাছ আসে বিভিন্ন রাজ্য থেকে, স্থানীয় পুকুর থেকে নয়। আগে জমির দাম যা ছিল, তা এখন বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে একশ গুণ। পুকুর তাই ভরাট হয়ে, হয়ে যায় ফের জমি। পুকুর ধুয়ে আর জল খাওয়ার দরকার নেই। এখন মাটি দিয়ে ভরাট পুকুর, পুকুর নয় মাটিই টাকা। এক সময় অর্থনীতির অঙ্ক বলেছিল, জমির চেয়ে পুকুরে লাভ বেশি। তাই জমি সেদিন পুকুর হয়ে গিয়েছিল। আবার এখন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অর্থনীতির লাভ লোকসানের হিসেব-নিকেশ বলছে পুকুর নয়, জমিতে লাভ। তাই পুকুর হয়ে যাচ্ছে ফের জমি। বস্তুত অর্থনৈতিক বাস্তবতাবোধই ঠিক করে দেয় সম্পদ কোন্ দিকে প্রবাহিত হবে। আজকে কথায় কথায় অর্থনীতি নিয়ে কচকচি বেশি হয়ে গেল বলে, সম্ভবত অর্থনীতিই শেষ কথা নয়। ঘটনার পশ্চাতে অন্য কিছুও থাকতে পারে বলে সন্দেহ জাগে মনে।

আগরতলার প্রাণকেন্দ্র পোস্টাফিস চৌমুহনির কাছে একটা বেশ বড়োসড়ো কাগজ কলমের দোকানে ঢুকে আমি সাদা খাম কিনতে চাইলাম। দোকানি বেশ অপ্রসন্ন হয়ে উত্তর দিল, এখানে খাম বা এনভেলাপ বিক্রি হয় না। আমি অবাক হয়ে বলি, সে কী এটা একটা কাগজ কলম কার্বন পেপারের দোকান! স্বাভাবিকভাবে আশা করা যায়, এখানে চিঠিপত্রের সরঞ্জাম আঠা, খাম, লেফাফা ইত্যাদিও পাওয়া যাওয়ার কথা। দোকানি অসীম বিরক্ত হয়ে

বলল — সবই বেচি আমি, কিন্তু খাম বেচি না।

অদ্ভুত কাণ্ড! দোকানে সবই বিক্রি হয়, শুধু খাম ছাড়া এর কারণ কী হতে পারে? এমন হয়তো হতে পারে, খাম বিক্রিতে লাভ নেই। অথবা যা কম লাভ, তাতে পোষায় না। তবে যাই হোক তাই হোক, একটাতে খানিকটা লাভ হলেও, দোকানে সেটি রাখতে হয়, নইলে ক্রেতা ফিরে যায়। একথাটি তো দোকানির না জানার কথা নয়।

খাম এখানে বিক্রি হয় না জেনেও আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দোকানি আমার কাছ থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য মরিয়া হয়ে বলল, একটি খামের দাম পঞ্চাশ পয়সা। খাম নিয়ে তাতে অ্যাড্রেস লিখে টিখে ক্রেতা দাম দেওয়ার সময় একটা দশ টাকার নোট বের করে দেয়। খুচরো নেই বলে খামের দাম রাখতে পারি না। আবার ফেরতও নিতে পারি না খামটি, কেননা ঠিকানা লেখা হয়ে গিয়েছে তাতে। পরে দাম দেবে বলে, ক্রেতা সেই যে যায়, আর ফিরে আসে না। আমার আমও গেল, ছালাও গেল। আমার সবটাই লোকসান। তাই আমি বেচি না খাম। আসলে লাভ-লোকসানই বড় কথা এবং শেষ কথা।

আমাগো সময় হইল না

কলকাতায় দূরদূরান্ত থেকে লোকজন চাকরি করতে আসে। বর্ধমান দুর্গাপুর খড়গপুর এইসব দূরবর্তী অঞ্চল থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে প্রচুর লোক। বাড়ি থেকে অফিসে আসতে এবং যেতে তাদের প্রতিদিন কম করে তিন তিন ছ ঘন্টা লেগে যায়। রিক্সা বাস ট্রেনে করে গলদঘর্ম হয়ে শুধুমাত্র অফিসে পৌঁছুতেই জীবনীশক্তি নিঃশেষিত প্রায়। এটা একদিনের ঘটনা নয়। দিন মাস বছর ধরে চলছে এই ট্র্যাডিশন। প্রায় শেষ রাত্তিরে ঘুম থেকে উঠে বাড়ির কর্তা স্নান করে মুখে দু মুঠো গুঁজে দুগ্‌গা দুগ্‌গা বলে অফিসের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে এবং বাড়িতে যখন ফেরে তখন মধ্যরাত্রি। যখন বের হয় তখন পরিবারের সবাই ঘুমোয় আর যখন ফেরে তখনও পরিবারের সদস্যেরা ঘুমে কাদা। এই হল সংসার।

এ সম্পর্কে একটি রসিকতা চালু আছে। এরকম একজন নিত্য অফিস যাত্রীকে জনৈক নিকট আত্মীয় জিগ্যেস করেছিল, আপনার বড়ো ছেলে কত বড়ো হয়েছে এখন? অর্থাৎ মাথায় কত উঁচু হয়েছে? এক্ষেত্রে অন্যেরা যা করে অর্থাৎ মাটি থেকে উচ্চতা মাপতে হাত তুলে দেখায়, তা না করে, পাশাপাশি হাত রেখে লোকটি পুত্রের উচ্চতা নয়, শুয়ে থাকলে দৈর্ঘে সে কতটা হয় সেটা দেখাল।

এটি রসিকতা হলেও সত্যি । লোকটি যখন শেষ রাত্রিতে অফিস যাবার জন্য প্রস্তুতি নেয় তখন নাবালক অঘোরে ঘুমোয়। আবার যখন মধ্যরাত্রিতে অফিস থেকে ক্লান্ত হয়ে ফেরে তখনও পুত্রটি পড়াশুনা করে খেয়েদেয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকে। বস্তুত জন্মাবার পর থেকে লোকটি তার পুত্রকে কখনও দাঁড়ানো অবস্থায় দেখেনি। যখনই দেখার সুযোগ হয়েছে, তখনই পুত্রটি শয্যাশায়ী। সুতরাং বাবা হিসেবে পুত্রের উচ্চতা নয়, আড়াআড়ি দৈর্ঘ্যই তার জানা। জীবিকা যে সংসার জীবনের ওপর কী রকম সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলতে পারে এটি একটি তার উদাহরণ।

আগরতলা, কলকাতা নয়। সুতরাং উপরের রসিকতাটুকু সম্ভবত আগরতলার অফিসযাত্রী বা ভুক্তভোগীদের জন্য প্রযোজ্য নয়। অন্তত তাই মনে হয়। কিন্তু ঘটনা হল এই আগরতলাও এ ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। মনে হচ্ছে খুব দ্রুত আগরতলা ভারতের বড়ো বড়ো শহরের মতো ঐ অমানবিক অফিস সংস্কৃতিকে ছুঁয়ে ফেলবে।

চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর আগেকার কথা। বিমানে কলকাতা যাতায়াতের জন্য তখন একমাত্র ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের একাধিপত্য। আগরতলা সেন্ট্রাল রোডের খোশমহল বাড়িটিতে প্লেনের টিকিট বেচত ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স। এয়ারলাইন্সের কর্মী সুধাময়বাবু, বর্ধনবাবু, দাশবিশ্বাসবাবু এবং সিংহবাবু প্রমুখেরা কাউন্টারে টিকিটের জোগান দিতেন। আমরা তখন ছোটো। স্কুলে-কলেজে পড়ি। প্লেনের একটি টিকিটের জন্য শেষ রাত্রি থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতাম। তখনকার সময়ে সুধাময়বাবু এবং সহকর্মীদেরও যাত্রীদের চাহিদা মেটানোর জন্য তাদের সংসারের প্রতি সুবিচার করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। ভোরবেলায় দেখতাম তাদেরকে অফিসে, অধিক রাত্রিতেও তারা অফিসে থাকতেন। সংসারের বাইরে জীবিকার প্রশ্নে অধিক সময় ব্যয় করতে হত তাদের। কলকাতা বা বড়ো শহরের নিত্যযাত্রীদের মতোই ছিল তাদের জীবন। যাতায়াতে সময় নষ্ট হত বটে, তবে অফিস তাদের অনেকটা সময় গ্রাস করে নিত। এখন অবশ্য বদলে গিয়েছে সব কিছু। এয়ারলাইন্সের মনোপলি শেষ। ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের টিকিট পাওয়া যায় অলিতে-গলিতে ট্র্যাভেলিং এজেন্টের দোকানে। আগে এরকম হলে আমাদের ভোগান্তি হত না। কেন যে হল না?

বি এস এন এল বা ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেডের পরিসেবা ক্রেতাদের ভোগান্তি চূড়ান্ত করে ছাড়ছে এখন। মাসান্তে টেলিফোনের বিল দিতে গিয়ে ক্রেতারা বুড়ো হয়ে যাচ্ছে। শহরের দুর্গাবাড়ির পাশে ছোট্ট ঘুপচি ঘরে হাজার হাজার লোকের ভিড়ে দম বন্ধ হবার জোগাড়। বাইরের রাস্তায় সাইকেল মোটরবাইক অন্যান্য যানবাহন রেখে যানজটে পথচারীদের জীবন অতিষ্ঠ। লোক বি এস এন এল-এ টেলিফোন বিলের টাকা জমা দিতে চায়, এটা তাদের অপরাধ। উল্টোদিকে বি এস এন এলের যারা কর্মী তাদেরও জীবন জেরবার। সকাল থেকে সন্ধ্যে, অফিসের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পরও, বিলের টাকা তাদের নিতে হচ্ছে। সারাদিনের টাকাপয়সার হিসেব-নিকেশ শেষ করে বাড়ি ফিরতে ফিরতে মধ্যরাত্রি প্রায়।

ক্রেতার সার্বভৌমত্ব বলে একটা মুখরোচক কথা চালু আছে আজকাল। কোনও কোনও দোকান বা প্রতিষ্ঠানে বাঁধানো ফ্রেমে লেখা থাকে, দোকান হল মন্দির, ক্রেতা হল দেবতা, দোকানি হল পূজারী। এসব কথা লেখা থাকে বটে। আসলে এটি হল একটা মস্করা। আগরতলার বি এস এন এলের কাণ্ডকীর্তি দেখেশুনে মনে হয়, ক্রেতার সার্বভৌমত্ব মানে হল স্রেফ কলাপাতা। ক্রেতাদের ভোগান্তিই হল মূল ব্যাপার।

এই ভোগান্তি ব্যাপারটা এড়ানো সম্ভব ইচ্ছা করলেই বা সদিচ্ছা থাকলেই। যাদের টেলিফোন আছে, তাদের প্রায় প্রত্যেকেরই ব্যাঙ্ক একাউন্ট আছে। ভারত সঞ্চার নিগম অন্যান্য শহরের মতোই আগরতলাতেও টেলিফোন গ্রাহকদের কাছ থেকে তাদের সম্মতি সাপেক্ষে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে নিয়ে নিতে পারে বিলের বকেয়া টাকা। তাতে গ্রাহকদের ভোগান্তিও

শেষ হয়, শেষ হয় স্টাফদের অমানুষিক অপ্রয়োজনীয় পরিশ্রম। আসলে ছোট্ট একটা প্রযুক্তির ব্যবহার বদলে দিতে পারে সবকিছু। ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের মুখে হাসি ফোটাতে পারে। অবশ্য এর জন্য চাই মনের উদারতা। অনেক অফিসে অনেক কর্মী আছে যারা নিয়মকানুনের অছিলা দেখিয়ে সাধারণ গ্রাহক বা ক্রেতাদের টাইট দিতে আনন্দ পায়।

আমার অবশ্য বন্ধুভাগ্য ভালো। আগরতলার অনেক অফিসে-কাছারিতে আমার সহপাঠীরা উচ্চপদে অধিষ্ঠিত। কোথাও কোন কাজে গেলে, আমি অবধারিতভাবে চায়ে আপ্যায়িত হই। সহপাঠীদের সৌজন্যে কাজটা আমার হয়ে যায় অল্প আয়াসে বা অনায়াসে। বি এস এন এলের একজন পদস্থ অফিসার হলেন গৌরীশঙ্কর চক্রবর্তী। দক্ষ এবং পরোপকারী অফিসার হিসেবে তিনি সুনাম অর্জন করেছেন। তিনি একসময় আমার সহপাঠী ছিলেন বলে আমি গর্ববোধ করি। টেলিফোন গ্রাহক পরিসেবার সাম্প্রতিক হাল নিয়ে তার কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করলে তিনি নিজে এগিয়ে এসে সুরাহা করার জন্য উদ্যোগী হয়েছেন। তবে একাধিক ক্ষেত্রে গৌরীশঙ্কর তাঁর অসহায়ত্বের কথা জানান। সেক্ষেত্রে প্রচলিত সিস্টেম না বদলালে গ্রাহকদের কষ্ট লাঘব করা যাবে না, এ ব্যাপারে অনেকে সহমত পোষণ করেন। আগরতলার ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের অভিজ্ঞতার নিরিখে বলা যায়, বি এস এন এলের হাত থেকেও গ্রাহকদের লাঞ্ছনা এবং কষ্টের শেষ হবে একদিন। সেদিন অবশ্য বেশি দূরে নেই।

শেষ পর্যন্ত আমার একটা আক্ষেপ — সবই তো হইল, তবে আমাগো সময় হইল না, এই যা দুঃখ।

জীবন বয়ে চলে

মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক ফলাফল বের হবার পর স্থানীয় দৈনিক পত্রিকাগুলোতে ছবিসহ প্রথম দশজন কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। সাক্ষাৎকার পড়ে জানা যায়, কৃতীরা ভবিষ্যতে কে কী হতে চায়। কেউ কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়, কেউ পড়তে চায় ডাক্তারি, কেউ ইলেকট্রনিক্স নিয়ে বি ই পড়বে বলে ঠিক করেছে ইত্যাদি। কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সাফল্যের পশ্চাতে কাদের অবদান বেশি, এই প্রশ্নের উত্তরে তারা যা জানায় তা হল প্রথমে তাদের বাবা-মা, তারপর গৃহশিক্ষকেরা এবং সবার শেষে উল্লেখ করে যে স্কুল থেকে পাশ করেছে সেই স্কুলের নাম। সাক্ষাৎকার থেকে আরও জানা যায়, পরীক্ষায় প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় হয়ে যারা বাবা-মা এবং বিদ্যালয় ও পাড়াপড়শিদের মুখ উজ্জ্বল করেছে তাদের গৃহশিক্ষকের সংখ্যা ছিল দশজনের কাছাকাছি। যেখানে পরীক্ষায় সাকুল্যে দশটি বিষয় নেই — সেখানে দশ দশজন গৃহশিক্ষক কী পড়ায় — সেটা একটা প্রশ্ন বটে। তাছাড়া একটি তরুণ ছাত্রের দশজন গৃহশিক্ষকের বাড়িতে ছোটাছুটি করতে হলে, সে নিজে পড়ে কখন, খায়-দায় ঘুমোয়ই বা কোন্ সময়ে? ছাত্রটির অভিভাবকেরা যত বড়োই চাকরি করুক বা যত অধিকই উপার্জন করুক না কেন, দশজন গৃহশিক্ষকের মাস মাইনে, প্রতিদিন কোনও না কোনও স্যারের বাড়িতে যাওয়া আসার রিক্সাভাড়া এবং অন্যান্য আনুষাঙ্গিক ব্যয়ভার বহন করা চাট্টিখানি কথা নয়। তবু অভিভাবকেরা পুত্রকন্যার জন্য এত সময় এবং অর্থ ব্যয় করে কেন? অভিভাবকেরা কি নির্বোধ? ওরা কি টাকাকড়িকে খোলমকুচি মনে করে?

এবার বরং পুত্র বা কন্যাটির দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টিকে বিচার করা যাক। প্রায় সব কৃতী ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রেই এটা দেখা যায়, তারা তাদের পিতার মাতার অবদানকে তাদের পরীক্ষার সাফল্যের জন্য এক নম্বরে রেখেছে। গৃহশিক্ষকেরা দ্বিতীয় স্থানে। পরীক্ষার ভালো রেজাল্টের সঙ্গে বাবা-মার সরাসরি কোনও সম্পর্ক থাকার কথা নয়। কিন্তু তবু তারা কেন বাবা-মাকে এই প্রসঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানায়? এমন হতে পারে, পুত্রকন্যার লেখাপড়ার জন্য বাবা অধিক ব্যয় করতেও পিছপা হয় না, এইজন্য কৃতজ্ঞতাবোধ। এটা দেখা যায়, তাই এই কারণের পশ্চাতে নতুন কিছু নেই। অনেকে যা হয়তো খোঁজ রাখে না, জানতেও পারে না, তা হল, পরীক্ষায় শারীরিকভাবে দৃশ্যত পুত্র বা কন্যাটি বসে বটে, কিন্তু বাবা-মাও যে পরীক্ষায়

বসে অদৃশ্যভাবে সে খবর কজন রাখে?

জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার প্রস্তুতি কি শুধু ছাত্র বা ছাত্রীটিই নেয়? যে বাড়িতে পুত্র বা কন্যা জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় বসবে একবার মন স্থির করে, তার পরক্ষণেই পুরো পরিবার মা-বাবা কাকা পিসি সবাই তটস্থ হয়ে যায়। ঘরে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা বন্ধ, টিভিতে যখন তখন সিরিয়াল দেখা নিষিদ্ধ। পরীক্ষার সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর বাবাকে খুঁজে খুঁজে জোগাড় করে তৈরি করে রাখতে হয়। গৃহশিক্ষকের দেয়া হোমটাস্কও বাবা-মাকে পড়াশুনো করে বানিয়ে রাখতে হবে। ছোট্টবেলায় আদরের সোনামণিকে যেমন গাছের পাখি, বনের জুজু বা আকাশের চাঁদমামাকে দেখিয়ে গ্রাস মুখের মধ্যে পুরে দিতে হত — এখন ঠিক তেমনি। ফিজিক্সের দুরূহ অঙ্ক, কেমিস্ট্রির ফর্মূলা, ইংলিশের অ্যামপ্লিফিকেশন — সবই বাবা বা মাকে প্রথমে মুখস্থ করতে হয় এবং পরে তা পুত্র বা কন্যাদের জন্য পরিবেশন করতে হয়। বাড়ির অন্যান্য সদস্যেরাও অব্যাহতি পায় না। বেকার কাকুকে গাদা গাদা পাতা জেরক্স করে নিয়ে আসতে হয় ভাইপোর জন্য। বিয়ের বয়স পেরিয়ে যাওয়া পিসিকে শেষ রাত্তিরে উঠে ভাইঝিকে পড়ার জন্য জাগিয়ে শুধু দিতে হয় না; নিজেকেও জেগে থাকতে হয়।

কেন এমনটা হয়? কারণ, কাকুর চাকুরি হয়নি, কেননা তার রেজাল্ট ভালো ছিল না বলে লেখাপড়ার ইতি টানতে হয়েছে অসময়ে। বিয়ে হয়নি পিসির , কেন? চাকুরি তো নেই-ই, পড়াশুনোও নেই ততটা, তাই। পিসির যা জুটেছে কপালে, ভাইঝির যেন তা না হয়। এজন্য সবাই নেমে পড়েছে কোমর বেঁধে যেন অর্থ এবং সময় ব্যয়ে কোনও কার্পণ্য না থাকে। একবার যদি উচ্চশিক্ষার দুয়ার খুলে যায়, তবে আর আটকায় কে? সমস্ত পরিশ্রম সার্থক হবে তখন। আজকের বিনিয়োগ, সুদে আসলে আগামী দিনে উসুল হবে।

যদি উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মোচিত হয়, যদি শিক্ষার শেষে কাঙ্ক্ষিত একটা চাকরি জোটে, যদি চাকরিটা দেশে না হয়ে হয় বিদেশে — এইসব 'যদি'গুলোকে অতিক্রম করার শেষে জীবন কিন্তু প্রবাহিত হয়ে থাকে জীবনের নিজস্ব ধারাতেই। কারোর ব্যক্তিগত ভাবাবেগ বা সুখ-দুঃখ সেক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পায় না। আমি উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে ছিলাম কিছুকাল। খানিকটা বেশি বয়সে আমি বিদেশে গিয়ে গবেষণার কাজে নিযুক্ত ছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে যেদিন আমি প্রথম যোগদান করি, সেদিনই নবাগতদের একটা অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান ছিল। নবাগতদের মধ্যে অনেকেই ছিল আমার মতো বয়স্ক। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তাঁর নাতিদীর্ঘ ভাষণের শেষে বললেন, এখানে তোমরা যারা উপস্থিত আছ, তারা বেশিরভাগই বিদেশ থেকে এসেছ। এসেছ হয়ে গিয়েছে কয়েকদিন। এসে মাকে চিঠি লিখেছ তো? মাকে চিঠি লিখেছ কারা কারা হাত তোলো?

একজনও হাত তোলেনি। কেউই হাত তুলল না দেখে উপাচার্য মহোদয় তখন বললেন,

মাদারকে লেখনি চিঠি অথচ মাদার-ইন-লকে লিখেছ — তারা এবার হাত তোলো। অনেকে এবার হাত তুলল। হাসির তরঙ্গ বয়ে গেল সারা প্রেক্ষাগৃহে। উপাচার্যও হাসলেন — তবে তাঁর হাসিতে ছিল বিষাদমাখা।

উচ্চ মাধ্যমিক এবং জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় কৃতকার্য ছাত্রছাত্রীরা অনেকেই পরবর্তী জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে থাকে। এই প্রতিষ্ঠার পেছনে যাদের অপরিসীম ত্যাগ, সুবিচার তাদের প্রতি অনেক সময়ই করা হয়ে ওঠে না।

পড়াশুনো ভালো করে আই এ এস হওয়ার কথা ছিল কাকুর। আই এ এস হওয়ার পর সেক্রেটারি কমিশনার হওয়ার কথা। সেই কাকু যে জেরক্স করে দিয়েছিল ভাইপোর নোটপত্র, সে একদিন জীবনে সেক্রেটারি হয় বটে — সেটা হল পাড়ার ক্লাবের সেক্রেটারি — আই এ এস সেক্রেটারি নয়।

পিসির বিয়ে হয় না। বিয়ের বয়স পেরিয়ে যায়। নিজের সংসার থেকে যায় অধরা। বয়সের ভারে ন্যুব্জ হয়ে আসে বাবা-মা। পুত্র-কন্যার ভবিষ্যৎ গড়তে গিয়ে নিজেদের ভবিষ্যৎ নড়বড়ে হয়ে যায়। বিদেশ থেকে বা নিকটবর্তী প্রবাস থেকে মাকে নয়, শাশুড়িকে চিঠি লেখে পুত্র। জীবন প্রবাহিত হতে থাকে নিজস্ব গতিতে এবং স্বধারায়।

সবার উপরে মানুষ

যখন আমার হাতে সময় থাকে, তখন আমি মনোযোগ দিয়ে দৈনিক বাংলা ইংরেজি পত্রিকাগুলো পড়ি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আদ্যোপান্ত পত্রিকা পড়ার অভ্যেস আমার। পত্রিকা পড়ে আমি নির্মল আনন্দ পাই। পত্রিকাতে শুধু নীরস খবরই থাকে না, খবরের ভেতরে লুকিয়ে থাকে বৈচিত্র্যে ভরপুর জীবনের অনালোকিত অনেক তথ্য। তাই শত ব্যস্ততার মধ্যেও আমি পত্রিকা পড়ার সময়কে কাটছাঁট পারতপক্ষে করি না।

প্রভাতী দৈনিকগুলোতে যেমন রক্ত হিম করা সংবাদ থাকে, আবার পাশাপাশি থাকে এমন সমাচার যা পড়ে আনন্দে পুলকিত এবং হাসিতে উচ্ছ্বসিত হতে হয়। যথেষ্ট সতর্ক হওয়া সত্ত্বেও, প্রকাশিত সংবাদে মুদ্রণ প্রমাদ থেকে যায়। ছাপার ভুলের জন্য নির্মল হাসির যোগান জোটে প্রায়শই। শুধু আমাদের ত্রিপুরার নয়, কলকাতা বা দিল্লি এবং বিদেশেরও পত্রিকায় মুদ্রণ রাক্ষসের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

একবার স্থানীয় একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের শিরোনাম ছিল — জলে ডুবিয়া বকের মৃত্যু। বক অনেকভাবে মারা যায় বা যেতে পারে, কিন্তু জলে ডুবে বক মারা যাওয়ার চিত্র দিবাস্বপ্নেও কেউ দেখে না। শিরোনামের শেষে, সংবাদটি পড়ে জানা গেল, বামুটিয়ায় জলে ডুবে একজন যুবকের মৃত্যু হয়েছে। যুবকের 'যু' অক্ষরটি মুদ্রণ প্রমাদের জন্য অমুদ্রিত থেকে গেছে। তাতেই সৃষ্টি হয়েছে যত রহস্যের।

সংবাদপত্রের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে আমি উৎসাহ সহকারে পড়ি শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনগুলো। সেখানে থাকে চাকরি/বাড়ি ভাড়া/ডাক্তারের চেম্বারের খোলা বন্ধের নোটিশ/পামেরিয়ান কুকুর শাবকের বিক্রি/গৃহকর্মের জন্য পিছুটানহীন নির্ঝঞ্ঝাট মহিলা/পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন ইত্যাদি। এগুলো পড়ে আমি পরিবর্তনশীল আমাদের চারপাশের সমাজ সংসার এবং সময়কে সঠিক প্রেক্ষাপটে ধরার চেষ্টা করি। সমাজ যে সতত পরিবর্তনশীল, বিজ্ঞাপনগুলোর ভাষা এবং বিষয়বস্তুতে ধরা পড়ে। এগুলো খোলা মন নিয় পড়লে অনেক অজানা তথ্য জানতে পারা যায়। এ বিষয়ে শ্রেণীবদ্ধ পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপনগুলো চোখ খুলে দেয়। সমাজের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি এবং মানসিকতার পরিবর্তন নির্ভুলভাবে প্রতিফলিত হয় পাত্র-পাত্রী বিজ্ঞাপনে, আমার স্থির বিশ্বাস। পঁচিশ-তিরিশ বছর আগে পাত্র-পাত্রী বিজ্ঞাপনে

ছাপা হত, 'পাত্র ভরদ্বাজ গোত্রীয়। অ-ভরদ্বাজ ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই .....। সমগোত্রীয়দের মধ্যে বিয়ে হয় না। কেন হয় না? এক গোত্র বলে, একই বংশধারা এবং পিতৃপুরুষ একজনই — পাত্রপাত্রী ভ্রাতা ভগ্নী সম্পর্কিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, তাই স্বগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। এই একই যুক্তিকে প্রসারিত করে বলা যায়, বিভিন্ন গোত্রের আদি পুরুষ ভরদ্বাজ, শাণ্ডিল্য বা অন্য মুনি ঋষিরাও তো এসেছেন একজন পরমপুরুষ থেকে এবং সেই সূত্রে এঁরাও এঁকে অপরের কাছে ভ্রাতৃপ্রতিম। তাই বৈবাহিক সম্পর্ক অসম গোত্রেও প্রশস্ত না হবার কথা। কিন্তু কালের সামাজিক বিধানে তার ঔচিত্য নিয়ে প্রশ্ন ওঠেনি।

এক সময় যোগাযোগহীনতার জন্য অপরিব্যাপ্ত গ্রাম নিয়ে গড়ে উঠেছিল গোষ্ঠী বা সমাজ। গ্রামবাসীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ রক্ত সম্পর্ক ছিল । সম্পর্ককে প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে নিজের গ্রামের বাইরে অন্য গোষ্ঠীর মধ্যে আত্মীয়তা স্থাপনের জন্য সম্ভবত অ-স্বগোত্রীয়দের মধ্যে বিয়ের বিধান দেয়া হয়েছিল। প্রাকৃতিক প্রতিকূলতাকে রুখতে সম্ভবত ওই রকম যূথবদ্ধ জীবন-যাপনের প্রয়োজনীয়তা ছিল।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, রাজারা প্রতিবেশী রাজ্যের রাজকন্যাকে বিয়ে করত — মিত্রতার জন্য, লোকবল, অর্থবল বৃদ্ধির জন্য। মোগল সম্রাট আকবর মুসলমান হয়েও হিন্দু রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেছিলেন, হিন্দু বৈরীদেরকে বশে আনার জন্য। বিবাহ ব্যাপারটা একটা লেনদেনের সম্পর্ক এবং স্বার্থই এখানে আসল কথা। স্বার্থ বলতে বুঝতে হবে, লোকবল এবং অর্থবলের সংস্থান।

সাম্প্রতিক কালের পাত্র-পাত্রীদের বিজ্ঞাপনে আর আগের মতো গোত্র বা উচ্চকুলের উল্লেখ থাকে না। বরং তার পরিবর্তে থাকে 'অসবর্ণে আপত্তি নেই' বা 'অসবর্ণেও চলিবে'। অনেক সময় অনেক কিছু স্পষ্ট করে লেখা থাকে না, কিন্তু দুটি পঙ্‌ক্তির মধ্যবর্তী অংশে লুক্কায়িত ইঙ্গিতটুকু বুঝে নিতে হয়। যেমন, অসবর্ণে আপত্তি নেই, যখন পাত্রী চাকুরিজীবী হবে। মোদ্দা কথা হল, পাত্র বা পাত্রী যদি উপার্জনশীল হয়, পরনির্ভরশীল না হয়, তবে গোত্র, বংশ, সাবেক সিলেট নিবাসী, অধুনা কৃষ্ণনগর আগরতলা ইত্যাদি কুলপঞ্জিকা অপ্রাসঙ্গিক এবং অবান্তর। বৈবাহিক সূত্রে জাতপাতও একদিন লুপ্ত হবে বলে অনেকের ধারণা।

এখনও আমাদের সমাজে সন্তানেরা পিতৃপরিচয়ে পরিচিত হয়। উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার ধর্ম ও জাতকুল প্রাপ্ত হয়। সম্প্রতি অফিস আদালত এবং শিক্ষাক্ষেত্রে পিতার নামের পাশাপাশি মাতার নামও উল্লেখ করার আইনি রীতি চালু হয়েছে। কিন্তু এখনও যা চালু হয়নি তা হল অসবর্ণ বিবাহসঞ্জাত পুত্রকন্যার যথাযথ জাতকুলের নির্ধারণ। মা যদি এস সি/এস টি হয়, তবে কেন পুত্রকন্যারা মা-অনুসরণে এস সি/এস টি হবে না? বাপ হলে হবে, মা হলে হবে না — এটা অনুচিত। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, পুত্রকন্যাদের এক্ষেত্রে তপশিলি জাতি বা

উল্টোদিকের চেয়ারে বসে হাসি হাসি মুখে এম এল এ বললেন, এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম আপনার সঙ্গে দেখা করে যাই ও সি সাহেব।

সবাইকে অবাক করে দিয়ে শান্তনু চিৎকার করে বলল, আমাকে সাহেব নয়, বলুন বাবা! চারপাশের দাঁড়িয়ে থাকা অফিসার এবং অন্যান্য পুলিশ কর্মী — নতুন বড়োবাবুর কাণ্ড দেখে হতবাক হয়ে গেল। এম এল এ সাহেব হতভম্ব হয়ে গেলেন।

অপমানিত ক্ষুব্ধ এম এল এ রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন, আপনি কাকে কী বলছেন, বুঝতে পারছেন না! আপনাকে পরে ভীষণ পস্তাতে হবে, এখুনি বলে রাখছি।

রক্ত চড়ে গেল শান্তনুর মাথায়। ড্রয়ার থেকে লোডেড পিস্তলটা বের করে টেবিলে রেখে চিৎকার করে বলল, শালা এম এল এ-র বাচ্চা, তুই আমাকে ভয় দেখাচ্ছিস! তুই আমাকে চিনিস না। মনে হয় ভুলে গেছিস। আমি তোকে বাপ ডাকিয়ে তবে ছাড়ব।

শান্তনু পকেট থেকে একটা একশ টাকার নোট বের করে থানার ছোটোবাবুর হাতে তুলে দিয়ে বলল, যান তো, একশ টাকার ক্যাডবেরিস চকোলেট নিয়ে আসুন। ব্যাটা একবার বাবা বলবে আর একটা ক্যাডবেরিস দেব। যান তাড়াতাড়ি নিয়ে আসুন। থানার ভেতর অনেক ধরনের জটলা হয়, নাটক জমে ওঠে। কিন্তু এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। দরজা জানালা দিয়ে উঁকি-ঝুঁকি মারছে প্রচুর লোক। চারপাশ ভিড়ে একাকার। অনেকে ধরে নিলেন, নতুন বড়োবাবুর মাথার বেশ কয়েকটা স্ক্রু ঢিলে আছে। বড়োবাবু পাগল কোনও সন্দেহ নেই, তবে আধা না দুই-তৃতীয়াংশ, নাকি পুরো — সেটাই জানতে বাকি এখনও।

ছোটোবাবু ক্যাডবেরিস আনতে গিয়েছে। অফিস নিস্তব্ধ। শুধু মাথার উপরে ঘূর্ণায়মান পাখার শব্দ শোনা যাচ্ছে। শান্তনুর বাঁ হাত ছুঁয়ে রেখেছে পিস্তলের বাঁট। ছোটোবাবুর ফিরতে দেরি হচ্ছে বলে, সবাইকে অবাক করে দিয়ে শান্তনু এম এল এ-কে বেমানান নম্র গলায় বলল, চলুন, আমার কোয়ার্টারে। আপনাকে চা খাওয়াব।

যা বলা, তাই কাজ। শান্তনু প্রায় জোর করে এম এল একে নিয়ে থানার পেছনের পুকুর পেরিয়ে নিজের কোয়ার্টারে উপস্থিত হল। আর্দালি চা বানিয়ে আনার আগেই নিজে উঠে গিয়ে তার বিধবা মাকে চা নিয়ে আসতে বলে এল। শান্তনুর মা তখন সবেমাত্র স্নান শেষে আহ্নিকে বসেছিলেন। পুত্রের কথামতো ট্রে-তে করে চায়ের পেয়ালা-পিরিচ নিয়ে ড্রয়িংরুমে উপস্থিত হতেই শান্তনু বলল, দেখো তো মা, এই ভদ্রলোককে চেন কিনা? তোমার সঙ্গে কি ওর বিয়ে হওয়ার কথা ছিল?

মা চোখ তুলে তাকালেন। এম এল এ-ও তাকালেন চোখ তুলে। মার এলোচুল লুটিয়ে পড়েছে পিঠ বেয়ে। এই প্রৌঢ়ত্বেও মার চেহারায় লাবণ্যটুকু নজর এড়িয়ে যাবার কথা নয়।

শান্তনু আবার বলল, কী হল মা, কিছু বলছ না যে? চেনো কিনা ওকে? ওর সঙ্গে কি বিয়ে হবার কথা ছিল তোমার?

'না'। বলে সজোরে মাথা নাড়লেন মা। তারপর দ্রুত চলে গেলেন ভেতরের ঘরে।

টি-পয়ে চা ঠান্ডা হতে লাগল। লোকটি আবেগে বিহ্বল হয়ে উন্মনা হয়ে রইল।

শান্তনু আর্দালিকে ডেকে বলল, যা ওকে নিয়ে গিয়ে আমার অফিসে বসা। ক্যাডবেরিস এলে আমাকে খবর দিস। একবার আমাকে 'বাপ' ডাকবে আর একটা করে ক্যাডবেরিস দেব। যা ওকে নিয়ে যা, দেখিস ও যেন চলে না যায়। গেলে তোদের একদিন কি আমার একদিন।

মফঃস্বল শহর সাধারণত নিস্তরঙ্গ থাকে। কিন্তু নতুন বড়োবাবুর দৌলতে হঠাৎ সমস্ত এলাকাটিতে দাবাগ্নি জ্বলে উঠল। অল্প সময়ের মধ্যে রটে গেল, এলাকার বিধায়ককে নতুন বড়োবাবু আটকে রেখেছে থানায়। অপমান করছে তাকে। বিধায়কের সমর্থকেরা থানা ঘেরাও করতে জড়ো হতে লাগল। এম এল এ মন্ত্রী না হতে পারে, কিন্তু শাসক দলের বিধায়কের অনেক ক্ষমতা। থানার বড়োবাবু টেরটি পায়নি এখনও, এখনই পাবে। উদ্বেল জনতার শ্লোগানে থানা মুখরিত হয়ে উঠল। উত্তেজনার পারদ বাড়তে লাগল হু-হু করে।

শান্তনুর মা আহ্নিক অসমাপ্ত রেখে আবার ফিরে এলেন। বললেন, আমি তখন ঠিক বলিনি। ওর সঙ্গে আমার বিয়ের কথা পাকা হয়েছিল। পরে অনেক কারণে বিয়েটা হয়নি। তোর বাবার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল।

হঠাৎ ছুটে বেরিয়ে শান্তনু পুকুর পাড়ে এসে এম এল একে বলল, আমাকে বাবা বলে ডাকতে হবে না। আমার বেয়াদবির জন্য আমাকে ক্ষমা করুন। আমার ভুল হয়ে গিয়েছে, স্যার।

স্মিত হেসে এম এল এ বললেন, বড়ো রকমের ভুল যে কোথাও একটা হচ্ছে সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত ছিলাম। দুগ্গা ঠাকরুণের মত যিনি মা, তার কখনও অসুরের মতো সন্তান হতে পারে? থানার ছোটোবাবু একশ টাকার ক্যাডবেরিস নিয়ে আসার পর, এম এল এ-ও একশ টাকার চকোলেট আনালেন। উপস্থিত সবাই মিলে চকোলেট খেল। মধুরেন সমাপন হল সবকিছু। সব ঠিকঠাক মতো হল। তবে একটা বিষয় সঠিক জানা গেল না, তা হল লোকটার সঙ্গে মার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল, নাকি লোকটা ছিল মার ব্যর্থ প্রণয়ী? উত্তাল জনরোষ থেকে ছেলেকে বাঁচাতে মা হয়তো ছোট্ট একটু মিথ্যে বলেছেন। কোন্‌টা যে সত্যি, কোন্‌টা যে মিথ্যে, তা আর কোনোদিন জানতে পারবে না থানার বড়োবাবু শান্তনু।

প্রভু নষ্ট হয়ে যাই

স্মিত হেসে মানিক চক্রবর্তী বললেন, আপনি কি সেই গল্পটা জানেন? 'কোন্ গল্পটা?' আমি পাল্টা প্রশ্ন করি তাঁকে। আগরতলার বনমালীপুরে মানিক চক্রবর্তীর বাঁশের বেড়া দেওয়া ঢেউ টিনের অপরিসর ঘরে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ নিয়ে আমাদের দুজনের মধ্যে আড্ডা হচ্ছিল। রাত হয়নি, সন্ধে গড়িয়েছে মাত্র। অনুজ্জ্বল বিজলির আলোয় ঘরটা যত আলোকিত, তার চেয়ে বেশি ছমছমে রহস্যে আচ্ছন্ন। পরিপাটি বিছানায় বসে মানিক চক্রবর্তী, পরনে লুঙ্গি, গায়ে ফতুয়া। শ্বেতশুভ্র দাড়ি সম্বলিত মুখে তাঁর মিটিমিটি হাসি। লোডশেডিংয়ের দৌরাত্ম্যে হঠাৎ আলো চলে গেল। কেরোসিনের লণ্ঠন স্থান নিল তার জায়গায়। ঘরের ভেতরের পরিস্থিতির কোনও রদবদল হল না। পুরোনো প্রসঙ্গের জের টেনে মানিক চক্রবর্তী বললেন, গল্পটা হল আবু বিন আদমের। গল্পটা সবাই জানে। স্কুলের ছেলেমেয়েদেরও জানা। অথচ আপনি জানেন না, আশ্চর্য তো? আমার সংকোচের সীমা নেই। কতকিছুই জানি না — জীবনের কতকিছু জানার বাকি। আবু বিন আদমের গল্পটা শোনার সৌভাগ্য হল আমার মানিক চক্রবর্তীর কাছে। মানিকবাবু মূলত একজন নাট্যব্যক্তিত্ব। তিনি যখন কিছু বলেন, তখন তাঁর বলার মধ্যে প্রতিভাসিত হয়ে ওঠে নাটকীয় অভিব্যক্তি। তাঁর বলা নিছক শোনার স্তরে আটকে থাকে না, শ্রোতার দৃষ্টিকেও নন্দিত করে। মানিকবাবুর গল্প শোনাও তাই এক নান্দনিক অভিজ্ঞতা।

রাত্রির শেষ প্রহরে আবু বিন আদমের হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। ঘুমের ঘোরে আবছা আবছা আলো আঁধারিতে আবু বিন আদম দেখল ঘরে একটি লোক বিরাট ফর্দে কালি কলম দিয়ে কী যেন লিখছে। লোকটির শুচি-শুভ্র বেশবাস দেখে আবু বিন আদম বুঝে ফেলল, আসলে সে আর কেউ নয়, দেবদূত। প্রশ্ন করে জানা গেল, সংসারে যারা যারা ঈশ্বরকে ভালোবাসে, দেবদূত তাদের নামের লিস্টি বানাচ্ছে। আবু বিন আদমের দৃঢ় বিশ্বাস, এই নামের লিস্টিতে তার নামও থাকবে, কেননা সে ঈশ্বরকে ভালোবাসে। অবশ্য এমন হতে পারে যে, তার নাম লিস্টির প্রথমে নয় শেষের দিকে স্থান পেয়েছে। সে ভালোবাসে ঈশ্বরকে, নিশ্চয়ই এমন আরও আছে অনেকে। তাদের নাম লিখে টিখে সবার শেষে যদি লাস্ট নামটা আবু বিন আদম হয়, তাহলেও শান্তি। কিন্তু হায় ঈশ্বর। দেবদূত যখন ভোর হওয়ার আগে

নামের লিস্টিটা পূর্ণ করল, তখন দেখা গেল আবু বিন আদমের নাম কোথাও নেই। একেবারে শেষেও নয়। ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল তার। পরদিন রাত্রির শেষ প্রহরে আবু বিন আদমের আবার ঘুম ভাঙল। তাকিয়ে দেখল সে, আগের দিনের মতোই আজও এসেছে দেবদূত। লিস্টিতে নাম লিখতে আজও ব্যস্ত সে। আজ আবার কাদের নাম লিখছে দেবদূত ? কালকে লিখেছে ঈশ্বরকে ভালোবাসে যারা তাদের নাম। আর আজকে লিখছে সংসারে ঈশ্বর ভালোবাসেন যাদের, তাদের নাম। হতাশ এবং বিষণ্ণ হয়ে চোখ বুজল আবু বিন আদম। ভোর হয়ে এলে দেবদূতের চলে যাবার সময় হল। ঈশ্বর ভালোবাসেন যাদের সংসারে, তাদের নামের ফর্দ তখন তৈরি। অবিশ্বাস্য কাণ্ড। তাকিয়ে দেখল সে, ঈশ্বর ভালোবাসেন যাদের তাদের নামের মধ্যে প্রথম নামটি হল — আবু বিন আদম। আবু বিন আদমের গল্পটি স্রেফ একটি গল্প নয়, গল্পের চেয়েও অধিক। মানিক চক্রবর্তী গল্পটির বিভিন্ন মাত্রা বা ডাইমেনশনের মধ্যে নাটকীয উপাদান নিয়ে সরস আলোচনা করলেন। বিগত শতাব্দীর সত্তর দশকে মানিক চক্রবর্তী এবং তাঁর সহকর্মীরা নাটককে রবীন্দ্র ভবনের মঞ্চ থেকে রাস্তায় নিয়ে এসেছিলেন। রাস্তার মোড়ে মোড়ে তাঁর এবং তাঁর বন্ধুদের মঞ্চস্থ নাটক সেদিন আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল রাজধানী আগরতলায়। রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ তাঁর পরিচালিত 'ফালতু লতু' এক অসামান্য নাটক। ত্রিপুরার নাট্য আন্দোলনের ইতিহাস দীর্ঘদিনের। এই আন্দোলনে সামিল হয়েছেন অনেক নাট্যব্যক্তিত্ব। তাঁদের মধ্যে অনেকে বিরল প্রতিভার অধিকারী। এদের মধ্যে মানিক চক্রবর্তী উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। তিনি অন্যদের চেয়ে একবারেই আলাদা। বোহেমিয়ানদের মতো জীবনযাপনে অভ্যস্ত তিনি। চলচ্চিত্র পরিচালক আদুর গোপালকৃষ্ণনকে বলা হয় দক্ষিশ ভারতের সত্যজিৎ রায়। অনেক বিষয়ে মিল আছে বলে মানিক চক্রবর্তীকে বলা যায় ত্রিপুরার 'ঋত্বিক ঘটক'। একসময় মানিকবাবু কলকাতায় গিয়ে ঋত্বিক ঘটকের কাছে নাড়া বেঁধেছিলেন। দিল্লিতে মানিক চক্রবর্তীর একবার দেখা হয়েছিল আদুর গোপালকৃষ্ণনের সঙ্গে। তাঁর 'মুখোমুখম' সিনেমাটি আলোড়ন সৃষ্টি করেছে চলচ্চিত্র জগতে। "আমার সিনেমাটিতে রাজনীতি নেই" আদুরের এই দাবিকে নস্যাৎ করে মানিকবাবু প্রশ্ন করেছিলেন, "প্রকাশ্যে রাজনীতি না থাকলেও যদি কোনও দর্শক এই বইটি দেখে রাজনৈতিকভাবে উদ্বেলিত হয়, তার কী ব্যাখ্যা দেবেন আপনি ?" তারপর মানিকবাবুর সঙ্গে আদুরের চলচ্চিত্রের ভাষা এবং বক্তব্য নিয়ে দীর্ঘস্থায়ী আলোচনা হয়। ত্রিপুরার বর্তমান নাট্য আন্দোলন সম্পর্কে মানিক চক্রবর্তীর বক্তব্য খুবই চিত্তাকর্ষক। তার মতে, ইদানীং কালের প্রযোজিত এবং অভিনীত নাটকগুলোতে নাটক থাকে কি না বলা না গেলেও তাতে একটা শ্লোগান বা পোস্টার থাকে।

সেটি হল, এই পুকুরে গরু বা মোষ স্নান করানো নিষেধ। এবার আপনি যা বোঝার বুঝে নিন। মানিক চক্রবর্তীর জীবনযাপনের ধারা নাটকের মতোই বর্ণাঢ্য। অনেকেই নাটক

ভালোবাসেন। নাটককে ভালোবাসেন যারা তাদের নামের লিস্টিতে মানিক চক্রবর্তীর নাম নাও থাকতে পারে। এক্কেবারে শেষেও না। তবে নাটক যদি ভালোবাসে কাউকে এবং যাদের ভালোবাসে তাদের নামের লিস্টি যদি বানানো হয়, তবে ত্রিপুরার মানিক চক্রবর্তীর নাম এক নম্বরে থাকবে বলে মনে হয়।

ভুল, সবই ভুল

মানুষের সমস্যার শেষ নেই। রকমারি সব সমস্যা। সংসারের অন্যান্যদের মতো দীপংকরেরও সমস্যা অন্তহীন। সবাইয়ের সচরাচর যা সমস্যা আছে, দীপংকরেরও সেগুলো আছে। এসবের বাইরেও তার একটি অন্য সমস্যা আছে — যা আর কারোর আছে বলে তার জানা নেই। দীপংকরের যে মামা, আবার সে মামাই তার পিসেমশাই। রক্তের সম্পর্কে যে তার পিসি, সে তার মামিমাও। খুবই গোলেমেলে ব্যাপার। ধৃতিমান নামে একজন মামাতো ভাই আছে দীপংকরের, সে আবার তারই বয়সি। মামাতো ভাইটি তার পিসতুতো ভাইও। অন্যদিক থেকে দেখতে গেলে, দীপংকর নিজেও একই সঙ্গে মামাতো ও পিসতুতো ভাই।

সম্পর্কটি এরকম যে জটিল হয়েছে, তার জন্য দায়ী দুই বুড়ো। দীপংকরের ঠাকুর্দা এবং দাদামশাই। বস্তুত বাবার বাবা এবং মায়ের বাবার আদিখ্যেতার জন্যই আজ এই অবস্থা। দুজনের কেউই এখন নেই। না থাকলেও তারা যে ভীষণ কিপ্টে এবং ঘোরতর সংসারী ছিলেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কে যে বেশি বা কে যে কম কিপ্টে বা ঘোরতর সংসারী ছিলেন, এখন আর তা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে দুজন দুজনকে টেক্কা দিয়েছিলেন বলে মনে হয়।

বছর তিরিশেক আগে দীপংকরের ঠাকুর্দা অথবা দাদামশাই পত্রিকায় পাত্র-পাত্রী কলামে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন — বদলে চলিবে। পাত্র স্কুল শিক্ষক, ব্রাহ্মণ, আগরতলায় নিজস্ব বাড়ি,

বয়স ২৬। পাত্রের জন্য সুশ্রী, গৃহকর্মে নিপুণা, দীর্ঘাঙ্গী পাত্রী চাই। পাত্রের ভগিনী হায়ার সেকেন্ডারি পাশ, উত্তম শ্যামবর্ণা, সংগীতে বিশারদ। তার জন্য অ-ভরদ্বাজ গোত্রীয় পাত্র চাই। সম্ভ্রান্ত বংশীয় ভ্রাতা ভগিনীর জন্য উপযুক্ত পাত্রী এবং পাত্র চাই। বদলে আপত্তি নেই। অগ্রহায়ণে বিবাহ। এই পাত্রপাত্রীর বিজ্ঞাপনের সুবাদে দীপংকরের মার সঙ্গে দীপংকরের বাবার বিবাহ হয়। দীপংকরের পিসির সঙ্গে বিয়ে হয় দীপংকরের মামার। সেই সূত্রে মামা হয়ে যায় পিসেমশাই, পিসি হয়ে যায় মামিমা। ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকেই দীপংকর এই গোলমেলে সম্পর্কের জটিলতার মধ্যে বড়ো হতে থাকে। মামা বা পিসেমশাইয়ের পরিবারে বড়ো হতে থাকে ধৃতিমান। ধৃতিমান নাদুস-নুদুস; গোলগাল। লেখাপড়ায় ভালো। ক্লাসের ফার্স্ট বয়। হায়ার সেকেন্ডারি পাশের পর জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে পন্ডিচেরিতে ডাক্তারি পড়তে চলে যায়। দীপংকর পড়াশুনোয় সাদামাটা, প্রায় ফেল করতে করতে কোনও রকমে উতরে যায়। উতরালেও উচ্চশিক্ষার দরজা খোলে না দীপংকরের জন্য। ননদের ছেলে ডাক্তারি পড়তে গিয়েছে ভালো রেজাল্ট করে, তাতে মার কষ্টে বুক ফেটে যায়। বাবার চোখে জল টলটল করে নিজের ছেলের কোনও হিল্লে হচ্ছে না দেখে।

ঈর্ষা এবং হীনমন্যতার জন্য দুটি পরিবারের মধ্যে অদৃশ্য প্রাচীর গড়ে ওঠে। অতি কাছের দুটি পরিবার ধীরে ধীরে দূরে সরে যায়।

মা অদৃষ্টকে দায়ী করে। বলে, এরকম বিয়ে ঠিক না। আর যাই হোক তাই হোক, বিয়েতে বদল প্রশস্ত নয় কোনও মতেই।

বাবাও বলে, কোনও বাবারই এটা করা ঠিক হবে না। এটি একটি মহা ভুল।

ভুলটা এরকমই যে তা আর শোধরানোর সুযোগ নেই। যেন সুযোগ থাকলে দীপংকরের বাবা এবং মা দেরিতে হলেও একবার চেষ্টা করে দেখত।

যথাসময়ে ধৃতিমান ডাক্তারি পাশ করে এল। আগরতলায় চেম্বার খুলে বসল। জাঁকিয়ে চেম্বার খুলল বটে কিন্তু পসার হল না। সারাদিনে একটাও রোগী আসে না, মাছি তাড়াবার অবস্থা। অন্যদিকে দীপংকর কোনও চাকরি-বাকরি হবে না নিশ্চিত জেনে কিছুদিন কাটা ছিট কাপড়ের ব্যবসা করল। জমল না। বর্ডারে পাচার বাণিজ্য করল কিছুদিন। তাতে কিছু কাঁচা টাকা হাতে এল দীপংকরের। স্মাগলিংয়ে সব ভালো, কিন্তু তাতে রিস্ক বেশি। একদিন তুচ্ছ কারণে অন্য একজন আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী দীপংকরের বুকে পিস্তলের শীতল নল ঠেকাল। এখন দীপংকর রিয়েল এস্টেটের বিজনেস করে। শহরে এখানে ওখানে খালি জায়গা কেনে। সেখানে বহুতল ফ্ল্যাট বানায়। সেগুলো বিক্রি করে। দীপংকর এখন আগরতলার ধনাঢ্য ব্যক্তিদের অন্যতম। নাম্বার ওয়ান হতে আর বেশি দেরি নেই। দীপংকরের দেখা হল একদিন ধৃতিমানের সঙ্গে এক নিকট আত্মীয়ার বিয়েতে। পাত্রীপক্ষ তো বটেই পাত্রপক্ষেরও অনেকে দীপংকরের

কাছ ঘেঁষে গা উষ্ণ করার চেষ্টায় যেন নেমেছে। ধৃতিমান বিয়েবাড়ির এক কোণে ম্রিয়মাণ হয়ে রইল সারাক্ষণ। মামাতো-পিসতুতো ভাইয়ের সঙ্গে পিসতুতো-মামাতো ভাইয়ের নিভৃত সাক্ষাৎকার একটি ঘটনা, যা মনে রাখার মতো। একথা সে কথা বলার পর দীপংকর বলল, ধৃতি রে, বাবা মা বা মামা মামির বিয়েটা ঠিক হয়নি। বদল ব্যাপারটা চলে না, এটা একটা ভুল। তুই কী বলিস?

ধৃতিমান ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। পরে আস্তে আস্তে বলল, ভুল কি একটা? আমি যে তালেগোলে ডাক্তার হয়েছি — সেটাও তো মনে হয় একটা ভুল। এত যে পড়াশুনা করলাম, ভালো রেজাল্ট হল, কী লাভ হল তাতে?

এরকম প্রতিক্রিয়া প্রত্যাশা করেনি দীপংকর। দীপংকর কিছুই মাথামুণ্ডু বুঝতে পারে না। ইতিমধ্যে বিয়ে বাড়িতে একটা ব্যাচের খাওয়া শেষ হল। অন্য ব্যাচ শুরু হতেই দীপংকর এবং ধৃতিমানকে প্রায় জোর করে নিয়ে বসিয়ে দিল খাবার টেবিলে। পাশাপাশি দুটো সিট পাওয়া গেল না। ধৃতিমানকে বসানো হল কোণের দিকে যেখানে রান্না হচ্ছে তার কোল ঘেঁষে। মশলাপাতির ঝাঁজ গন্ধ ম-ম। পাখাও নেই সেখানে।

আর দীপংকরকে বসানো হল ঘূর্ণায়মান একটি পাখার নিচে। সেখানে অন্য একজন অতিথি বসেছিল আগে থেকে। তাকে অন্যত্র সরিয়ে দিয়ে দীপংকরকে আপ্যায়ন করে সেখানে বসতে দেয়া হল। কন্যাকর্তা হাত কচলে দীপংকরের কাছে দাঁড়িয়ে রইল বহুক্ষণ। ধৃতিমান দূর থেকে সমস্ত ঘটনাটাকে প্রত্যক্ষ করল। নিজে নিজ বিড়বিড় করে ধৃতিমান বলল, দীপু রে, বাবা মা বা মামা মামির বিয়েটা ঠিক হয়নি। এটা একটা ভুল ছিল বটে, যা শোধরানো নাগালের বাইরে। আমি যে ডাক্তার হয়ে এখন হন্যে হয়ে মরছি, এটাও তো একটা ভুল। কিন্তু ভুলটা ইচ্ছে করলেই সংশোধন করা যেত। আমি তা হলে তোর মতো হতে পারতাম। সেদিন কি আমি ইচ্ছে করলে বাজে রেজাল্ট করতে পারতাম না হায়ার সেকেন্ডারিতে, পারতাম না লাড্ডা মারতে জয়েন্ট এন্ট্রান্সে। তাহলে জীবন এখন অন্যরকম হত।

ধৃতিমান দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

অভাগার মরে গরু

গ্রামের মানুষেরা তুলনামূলকভাবে শহরের মানুষদের চেয়ে কম শিক্ষিত হয়। গ্রামের মানুষ বলতেই যা ভেসে ওঠে চোখের সামনে তা হল, মুখ্যু সুখ্যু, খোঁচা খোঁচা দাড়িসহ দুঃখী দুর্ভাগা কেউ। শূন্য বা কম লেখাপড়া জানা লোকেরা সাধারণত কম বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি হয়। স্কুল কলেজের লেখাপড়া মানুষকে চালাক-চতুর হতে সাহায্য করে বলে অনেকের বিশ্বাস। অনেকের মতে, লেখাপড়া না জানলে লোক বোকাসোকা হয়। গ্রামের মানুষেরা এসব সঙ্গত কারণেই বোকাসোকা।

অজ পাড়াগাঁয়ের একটি চায়ের দোকানে একদিন একজন সিড়িঙ্গেপনা গ্রাম্য লোককে বলতে শুনলাম — 'ভাগ্যবানের স্ত্রী মরে, অভাগার মরে গরু'। এ কথাটি শুনে আমি ভীষণ চমকে যাই। কে বলে গ্রামের লোক মুখ্যসুখ্যু, কে বলে গ্রামের লোক বোকাসোকা! অনেকের ধারণা, অর্থনীতি বিষয়টি বেশ কঠিন। অর্থনীতি বিষয়টি বুঝতে গেলে বিশেষ জ্ঞান থাকা দরকার। লোকটির কথা শুনে আমার মনে হল লেখাপড়ার মাপকাঠিতে লোকটির জ্ঞান কম থাকলেও, অর্থনীতিকে লোকটি গুলে খেয়ে বসে আছে। আমার ধারণা, কেউ শিক্ষিত না হলে, অশিক্ষিত হতে পারে কিন্তু সে স্টুপিড না-ও হতে পারে। আবার লেখাপড়া জানা উচ্চশিক্ষিত অনেকে আছেন যাদের স্টুপিডিটির সীমা নেই। অশিক্ষা এবং ভোঁদামি এক কথা বা সমার্থক নয়। 'ভাগ্যবানের স্ত্রী মরে, অভাগার মরে গরু' এই গ্রাম্য কথাটির শেষাংশ নিয়ে শুরু করা যাক। গরু দুধ দেয়, বৎসরান্তে দেয় বাছুর। আর বলদ ছাড়া হাল চাষ করা অসম্ভব। গ্রামের লোকের পক্ষে গরু হল সম্পদ। গরু যদি কারও মরে যায়, তার মত ভাগ্যহীন অভাগা আর কে আছে। গরুর দুধ বিক্রি করে সংসার চলে অনেকের। এহেন গরু মরে গেলে গরিবেরা আরও মরে যায়। দরিদ্র পরিবারটির জীবন দুঃসহ হয়ে ওঠে। যার গরু মরে তার চেয়ে অভাগা আর কে আছে সংসারে! বাক্যটির প্রথমাংশ অনুসারে, যার স্ত্রী মরে যায়, সে ভাগ্যবান। মনে হয়, 'ভাগ্যবানের স্ত্রী মরে' বলে যা বোঝানো হয়েছে তা হল, স্ত্রীরা সংসারে বোঝা। স্ত্রীরা মরলে স্বামীরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। সবার স্ত্রী মরে না, তাই সবাই ভাগ্যবান হয় না। ভাগ্যবান হয় মাত্র অল্প কয়েকজনই যাদের স্ত্রী সৌভাগ্যবশত মারা যায়। স্ত্রী মারা গেলে আর একটি বিয়ে করার সম্ভাবনা দেখা দেয়। স্ত্রীর অকালমৃত্যু হলে স্বামীদেবতা আবার দারপরিগ্রহ করবে কি

করবে না এ ব্যাপারে সম্ভবত বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের বিভিন্ন অনুশাসন রয়েছে। অন্য স্বামীদের চেয়ে হিন্দু স্বামীরা অধিক সৌভাগ্যবান। সদ্যমৃত স্ত্রীকে শ্মশানে দাহ করতে করতেই হতভাগ্য স্বামীপ্রবরটির জন্য অন্য একটি বিবাহের সম্বন্ধের কথা উত্থাপন করতে হয়। ব্যাপারটি খুবই দুঃখের এবং হৃদয়হীন হলেও, সমাজপতিরা নিরুপায়। সংসার এক কঠিন জায়গা — এখানে ভাগ্যবান হতে হলে নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা বলে কিছু থাকতে নেই। পূর্বপুরুষেরা যা করে গিয়েছেন, উত্তরপুরুষেরও তাই করা বিধেয়। পূর্বপুরুষেরা ভোঁদা ছিলেন না নিশ্চয়ই, তাঁরা ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ। শাস্ত্রে বিধান না মেনে উপায় কী? গ্রামের লোকেরা অশিক্ষিত হলে কী হবে, এরা খুব বৈষয়িক হয়। গ্রামের অন্য একটি বহুল প্রবাদ হল, যে গরু দুধ দেয়, সে গরু লাথি মারলেও ভালো। এখানেও অর্থনীতির একটি তত্ত্ব খুবই স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। এক্ষেত্রে লাথি হল ব্যয়, দুধ হল আয়। আয়ের জন্য ন্যূনতম ব্যয় স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকতে হয়। লাথিটা বড়ো কথা নয়, বড়ো কথা হল গরুটা দুধ দেয় কি না। দুধ দিলে সব অপরাধ ক্ষমা। নইলে নয়। অবশ্য যে গরু দুধ দেয় না অথচ লাথি মারে সে গরু থাকার চেয়ে না থাকা অনেক ভালো। গ্রাম্য কথায় এটাও বলা আছে, দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল অনেক ভালো। 'ভাগ্যবানের স্ত্রী মরে' প্রেক্ষিতে কোন্ ধরনের স্ত্রী মারা গেলে স্বামী ভাগ্যবান হয়, এটি একটি প্রশ্ন বটে। যে স্ত্রী উপার্জন করে এবং তার অর্জিত আয় দিয়ে সংসারের ক্ষুণ্ণিবৃত্তি হয়, সেই স্ত্রী মারা গেলে আর যাই বলা হোক, স্বামীকে ভাগ্যবান বলা যায় না। স্ত্রীর প্রয়াণে পুরো সংসারটিতে দুঃসময় নেমে আসে। অপরপক্ষে স্ত্রী যদি দুঃশীলা এবং উপার্জনহীনা হয় তবে সেক্ষেত্রে স্ত্রীবিহীন শূন্য সংসার অধিক কাম্য। এ হল গ্রাম্য অর্থনীতির পশ্চাৎপট।

অবশ্য এই একই বিষয়ে শহরের অর্থনীতিও অভিন্ন। শহরের জন্য আলাদা কোনও ব্যাপার নেই। বরং শহরের লাভ-লোকসানের অঙ্কটি আরও বেশি মর্মান্তিক এবং হৃদয়বিদারক। অর্থনীতির অধ্যাপিকা আমার অগ্রজ এক দিদি আমাকে প্রসঙ্গত বলেছিলেন,শহরের তথাকথিত শিক্ষিত লোকেরা গ্রামের চাষাভুষো মানুষের চেয়েও অধম। আমি তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম, এটা রাগের কথা। অন্যেরা যে যাই বলুক, আপনার মত উচ্চশিক্ষিত হৃদয়বতী মহিলার পক্ষে এরকম কঠিন কঠোর কথা বলা মানায় না। মানাক আর না মানাক, যা সত্যি তা তো বলবই। অধ্যাপিকা দিদি ক্ষোভে দুঃখে অধীর হয়ে বললেন, যে গরু দুধ দেয়, গ্রামের চাষাভুষোরা সেই গরুকে হালে জুতে দেয় না। অথচ তথাকথিত শহুরে শিক্ষিত স্বামীরা তাদের স্ত্রীদের, যারা সংসারের দেখভাল করে, সন্তানদের স্তন্যপান করায়, তাদেরকে দশটা-পাঁচটা অফিসে পাঠিয়ে অতিরিক্ত উপার্জনের জন্য খাটিয়ে মারে। ছিঃ।

দুদণ্ড শান্তির ঠিকানা

কিছুদিন আগে পুজোর ছুটিতে পেশাগত কারণে আমাকে প্রথমে দিল্লি এবং পরে মুম্বই যেতে হয়েছিল। মুম্বই থেকে ফিরছি। সান্তাক্রুজ এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করছি — প্লেন লেট। নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে প্লেন ছাড়ল। আমার পাশের সিটে জানালার পাশে বসেছেন একজন মহিলা। আজকালকার মেয়েদের দেখে বয়স বোঝার উপায় নেই। দেখে একবার মনে হল আমার অর্ধবয়সী, কন্যাসম। আবার কেন যেন মনে হল, পঞ্চাশোর্ধ্ব এই তরুণীর কাছে বয়স হার মেনে নতজানু হয়ে আছে। মেয়েদের বয়স বোঝা মুশকিল — তাই চেষ্টা করা বৃথা। তবে বয়স যাই হোক তাই হোক, আমার সহযাত্রিণীর চোখে মুখে সর্বত্র একটি মাতৃত্বের ছবি। সংসারে আমি কখনও-সখনও দু একজন মহিলাকে দেখেছি যাদের মধ্যে সবসময়ই একটা মা-মা ভাব। বয়স তাদের কাছে অপ্রাসঙ্গিক অবান্তর। আমার পাশের সিটে উপবিষ্ট মহিলাও তাই। রূপের স্নিগ্ধতাকে ছাপিয়ে উঠেছে তার সহজাত মাতৃত্বের ঔজ্জ্বল্য।

সিটে বসেই মহিলা জানালাটিকে পর্দা দিয়ে ঢেকে দিলেন। আমি অবাক, জানালার পাশে তবে লাভ কী! একসময় দুহাতে তিনি তার কপাল টিপে ধরে রাখলেন। তাকিয়ে দেখি, সারা মুখে যন্ত্রণার ছাপ। দুঃসহ মাইগ্রেনের ব্যথা। যন্ত্রণায় মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে। বেল বাজাতেই ছুটে এল এয়ারহোস্টেস। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে গিয়ে নিয়ে এল স্যারিডন ট্যাবলেট।

মহিলা জল দিয়ে ট্যাবলেট খেয়ে চোখ বুঁজে রইলেন সারাক্ষণ। প্লেনের খাবার এলে ফিরিয়ে দিলেন ইশারায়। আমি খুব অস্বস্তি বোধ করছিলাম। এক্ষেত্রে আমার ঠিক কী ভূমিকা আমার জানা নেই। অযাচিত হয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলাম আমি।

কথাবার্তার সুবাদে জানা গেল, মুম্বইনিবাসী এই মহিলা দিল্লিতে তার পুত্র, পুত্রবধূ এবং নাতনির কাছে যাচ্ছেন। মহিলা আসলে শাশুড়ি, আমি তাকে আমার কন্যাসম ভেবেছিলাম। আমার নত্ব ষত্ব জ্ঞান যে কত কম, তা অনেকবারের মত আবারও প্রমাণ হল। গত কয়েকদিন ধরে তার মাইগ্রেনের জন্য শিরঃপীড়া বেড়েছে। মাইগ্রেনের ব্যথা বেশ কয়েকদিন ধরে চলে। ব্যথা প্রচণ্ড হলে তখন ওষুধ-বিষুধেও কিছু হয় না। সেসময় মহিলা মুম্বই থেকে দিল্লি চলে আসেন। পুত্রের কাছে এলেই মাথার মাইগ্রেনের ব্যথা ধীরে ধীরে কমে যায়। কেন কমে যায় তার কোনও ব্যাখ্যা নেই।

মুম্বই হাজি আলির কাছে আরব সাগরের পারে আকাশচুম্বী বহুতল বাড়িতে প্রৌঢ় স্বামীকে নিয়ে তার নিঃসঙ্গ সংসার। মাথার যন্ত্রণা বাড়লে পশ্চিমখোলা জানালায় তরঙ্গায়িত আরব সাগরের ঊর্মিমালার বিরামহীন দৃশ্য, ব্যস্তসমস্ত স্বামীর কাছ থেকে কিছুটা সময় বের করে তার বিনিময়ে করলে পণের শুশ্রূষা — কিছুতেই কিছু হয় না। তখন দিল্লিতে ছেলের কাছে এলেই সব ঠিক হয়ে যায়। সন্তানসন্ততিদের সান্নিধ্যে মহিলা আরোগ্য খুঁজে পান। মহিলার কাছে আরোগ্যের এই অভিনব পদ্ধতির কথা শুনে আমার একটা গল্প মনে পড়ল। গল্পটা আমার এত প্রিয় যে মহিলাকে শোনাবার লোভ আমি সংবরণ করতে পারলাম না।

একজন তালিবান মুসলমানের চার স্ত্রী। তালিবানি লোকটির শরীর কিছুদিন ধরে ভালো যাচ্ছে না। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে এসেছে সে হেলথ চেকিংয়ের জন্য। ডাক্তার ইসিজি, সোনোগ্রাফি, রক্ত ইত্যাদি অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে। রিপোর্টগুলো কদিন বাদে জানা যাবে। তালিবানি লোকটা সব রিপোর্টগুলোর বিল অগ্রিম মিটিয়ে দিয়ে তার নিজের একটা ভিজিটিং কার্ড ডাক্তারের কাছে রেখে গেল। ভালোমন্দ কিছু রিপোর্টে থাকলে ডাক্তার যেন তাকে টেলিফোনে সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দেয়। কার্ডটিকে চোখের সামনে তুলে ধরে ডাক্তার দেখল তাতে পরপর পাঁচটা টেলিফোন নাম্বার দেয়া। পাঁচটার মধ্যে কোন্‌টাতে ফোন করবেন ডাক্তার? জানা গেল, প্রথম চারটি তালিবানি লোকটির যথাক্রমে এক, দুই, তিন এবং চার নম্বর বিবির ফোন নাম্বার।

'আরও একটা যে ফোন নাম্বার রয়েছে। পাঁচ নম্বর?' ডাক্তার জানতে চাইল, কোন্‌টায় ফোন করব? তখন তালিবানি লোকটি বলল, সাধারণত আমি কোনও না কোনও একজন বিবির সঙ্গে থাকি। এক দুই তিন চার — ফোন করলে কোনও এক বিবির কাছে আমাকে পেয়ে যাবেন। সংসারে মাঝে মাঝে এত ঝামেলা এবং অশান্তি হয় যে, কোথাও যখন শান্তি খুঁজে পাই না তখন আমি সব বিবিদের থেকে দূরে পাঁচ নম্বর মহিলার কাছে চলে যাই। চার বিবির কোথাও আমাকে না পেলে আপনি আমাকে পাঁচ নম্বর ফোনে পাবেনই। পাঁচ নম্বর মহিলা আমার বৃদ্ধা মা। আমি দুদণ্ড শান্তির জন্য তার কাছে ছুটে যাই তখন।

আমার কাছে গল্পটা শুনতে শুনতে সহযাত্রিণীর চোখে মুখে প্রশান্তি ফুটে উঠল। মনে হল, মাইগ্রেনের যন্ত্রণা কিছুটা কমেছে তার। মিটিমিটি হাসি হাসি মুখ। মহিলা নিজে কিছু না বলে তার ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে 'টাইমস অব ইন্ডিয়া' পত্রিকার একটা ক্লিপিং আমার হাতে গুঁজে দিলেন। তাতে লেখা — আফটার এ চাইল্ড ইজ বরন্, দেন এ মাদার ইজ বরন্। একটা শিশু জন্মাবার পরেই একটি মায়ের জন্ম হয়। একটা সন্তান যখন জন্মে তখন একটি মায়ের জন্ম হয়। একটা সন্তান যখন জন্মে তখন একটি নারী মায়ে রূপান্তরিত হয়ে ধন্য হয়। সন্তান আগে মা পরে।

মধ্যাকর্ষণের কিছুটা উর্ধ্বে নিচের পৃথিবীর আবিলতার বাইরে উড্ডীয়মান বিমানে বসে আমি যতই মায়ের উচ্চাসনের কথা বলি, একজন মা তখন সন্তানসন্ততির কথা বলে। কী বৈপরীত্যে ভরা এ সংসার।

একসময় আমাদের প্লেনটি দিল্লির পালাম বিমানবন্দরে অবতরণ করে। আমি মহিলাটিকে আর খুঁজে পাইনি। তার সাথে আর দেখা হবে না কোনোদিন।

বাঘের দুধ

কথায় আছে টাকা দিলে বাঘের দুধও মেলে। অর্থাৎ বাঘের দুধ অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রীর মতোই। তার সম্ভবত চাহিদা আছে। আছে যোগানও। যোগানের কথা পরে হবে, আগে চাহিদার ব্যাপারটা নিয়ে ভাবা যাক। বাঘের দুধের চাহিদা কারা করে? কেন করে? সম্ভবত বড়লোকের শিশুরা, মাতৃক্রোড়ে যাদের মায়ের বুকের দুধ মেলে না, তাদের কাছ থেকেই বাঘের দুধের জন্য চাহিদা আসে। শিশুরা সাধারণত অবুঝ হয়, তাই দুধের পরিবর্তে বাঘের দুধ নয়, বরং পিটুলিগোলা জল দিয়ে তাদের শান্ত করা হয়, গরিবের ঘরে এই চিত্র নতুন নয়। পুরাকালেও এর ব্যতিক্রম ছিল না। মহাভারতের দ্রোণাচার্য ছিলেন পাণ্ডব এবং কৌরব রাজপুত্রদের শিক্ষাগুরু। রাজপুত্রেরা প্রশিক্ষণ বা অনুশীলনের শেষে পাত্রভর্তি দুগ্ধপান করত। নিজের ছেলে অশ্বত্থামার জন্য দ্রোণ দারিদ্র্যের কারণে দুধ জোগাড় করতে পারতেন না। শিশু অশ্বত্থামার দুধের আবদার পিতা দ্রোণ পিটুলিগোলা জলে মেটাতেন।

দুধের বিকল্প কী হবে তা নির্ভর করে আর্থিক সঙ্গতির ওপরে। দুধের বদলে ঘোল সরবরাহে সংসারে আপত্তি নেই বলেই মনে হয় কখনও কখনও। মায়ের দুধের বিকল্প বাঘের দুধ কিনা এ নিয়ে সংশয় আছে। ছোটোবেলায় অনেক শিশুই গরু ছাগল মোষের দুধ খেয়ে বড়ো হয়। তবে বাঘের দুধ খেয়ে বড়ো হয়েছে কেউ, এমন শোনা যায় না। সংসারে মাঝে

মাঝে মানুষের মধ্যে দুএকজনকে বাঘের বাচ্চা বলে উল্লেখ করা হয়। অফিস আদালতে ওই রকম বাঘের বাচ্চার সাক্ষাৎ মেলে, যদিও তাদের সংখ্যা আঙুলের কড়ে গোনা যায়। ঐসব বাঘের বাচ্চারা সম্ভবত বাল্যকালে বাঘের দুধ খেয়ে বড়ো হয়েছে। বাঘের দুধ খেয়ে যারা বাঘের বাচ্চা হয়ে সংসারে দাপটের সঙ্গে ছড়ি ঘোরাচ্ছে, তাদের শৌর্যের বন্দনা করা, এখন আর মানায় না। সরকারি বিজ্ঞাপনে সর্বত্র যা এখন প্রচার করা হচ্ছে, তা হল, মাতৃদুগ্ধের কোনও বিকল্প নেই। মায়েদেরও অনুরোধ বা সতর্ক করা হচ্ছে, তারা যেন সন্তানদের মাতৃদুগ্ধ থেকে বঞ্চিত না করেন। মাতৃদুগ্ধও অনির্দিষ্টকাল ধরে পান করার দরকার নেই। একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরে শিশুরা ধীরে ধীরে শক্ত খাবার খেতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। মাতৃদুগ্ধ খাওয়ার প্রয়োজনীয়তা একসময় ফুরিয়ে আসে। শিশুদের দাঁত গজায়। শুধুমাত্র তরল দুধে শারীরিক প্রয়োজন মেটে না। প্রোটিন আয়রনযুক্ত সুষম খাদ্যের প্রয়োজন হয়। এক সময় প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে মাতৃদুগ্ধের যোগান স্তব্ধ হয়ে আসে। তখন অবশ্য তার আর প্রয়োজনও নেই। যদি থাকত, তাহলে মাতৃদুগ্ধের সরবরাহ অক্ষুণ্ণ থাকত। মানুষ সেয়ানা। নিজের মায়ের দুধ ফুরিয়ে এলে গরু ছাগল মোষের মায়ের দুধে এসে থাবা বসায়। স্বাস্থ্যগত কারণে দুধ না হলেও চলে, সেক্ষেত্রে অন্য মায়ের দুধ লুণ্ঠন করে পান করতেও মানুষ এতটুকু অপরাধবোধে পীড়িত হয় না।

সাব্রুমের হরিণায় চায়ের দোকানে একটা লোককে দেখেছিলাম একবার। সে বছর পনেরো আগের কথা। লোকটা চায়ের গ্লাসে দুধ খাচ্ছিল। ফিকে জলো দুধ — হোয়াইট লিকার। প্রতিটি চুমুকে সুড়ুৎ সুড়ুৎ শব্দ হচ্ছিল। একটি চুমুকের থেকে অন্য একটি চুমুকের অন্তর্বর্তী সময়ে লোকটি মৌজ করে গল্প বলছিল। চায়ের দোকানে তার মন্ত্রমুগ্ধ শ্রোতাদের মধ্যে সেদিন আমিও একজন ছিলাম। চোখের পলক না ফেলে লোকটা একসময় বলল, জানেন তো, দশরথ দেব এবং সন্তোষ মোহন দেব — তারা বিরোধী রাজনীতি করলে কী হবে, আসলে তারা আত্মীয়। দুজনেই 'দেব', লক্ষ করেছেন? শ্রোতারা সবাই নড়েচড়ে বসল। আমার কেন যেন মনে হল, লোকটা চায়ের গ্লাসে যে দুধ খাচ্ছে সেটা বাঘের দুধ। ত্রিপুরার প্রত্যন্ত অঞ্চলে চায়ের দোকানে বাঘের দুধ পাওয়া যায়, বিশ্বাস করতে আমার ভালো লাগল। আমার ভালো লাগল এই ভেবে যে, বাঘের দুধ যে খায়, সে নিশ্চয়ই বাঘের বাচ্চা না হয়ে যায় না।

মফস্বলের চায়ের দোকানগুলো এক আজব জায়গা। এখানে বিনে পয়সায় এমন সব অভিজ্ঞতা লাভ হতে পারে যা পয়সা দিয়েও অন্যত্র মেলে না। সত্তর দশকে একসময় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন সিদ্ধার্থশংকর রায়। সিদ্ধার্থশংকর সকালে-বিকালে প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দিতেন। কিন্তু এগুলো রক্ষা করা বা কার্যে রূপায়ণ করা তাঁর পক্ষে দুষ্কর হত।

তখনকার পত্রপত্রিকায় প্রতিশ্রুতিগুলোকে মিথ্যের ফুলঝুরি হিসেবে অভিহিত করা হত। সে সময় পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরায় চায়ের দোকানে এক কাপ চায়ের দাম দিলে এক কাপকে দুকাপে ভাগ করে দিত। অর্ডার দেয়ার সময় বলতে হত — এক কাপ চা আর একটা ফল্‌স্‌। আর ব্যাখ্যা করার দরকার হত না — এই-ই যথেষ্ট।

কালক্রমে শেষে এমন দাঁড়াল, এক কাপ চা আর একটা ফল্‌স্‌ না বলে, এক কাপ চা আর একটা সিদ্ধার্থ বললেও চলত। দোকানি যা বোঝবার তা বুঝে নিত।

'টাকা দিলে বাঘের দুধও মেলে' এর মর্মার্থ হল, সংসারের যে কোনও জিনিস দুষ্প্রাপ্য হলেও তার জন্য দাম মিটিয়ে দিতে প্রস্তুত থাকলে জিনিসটি মিলবেই। এক্ষুনি আগরতলায় পেট্রল পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ দাম দিতে রাজি থাকলে পেট্রল পাওয়া যাচ্ছে। পেট্রল এখন বাঘের দুধের মতো। টাকা হলে বাঘের দুধের মতো পেট্রল মিলছে।

এই বৃষ্টিবাদলের দিনে ত্রিপুরার প্রত্যন্ত অঞ্চলে সরকারি ন্যায্যমূল্যের দোকানে চাল ডাল কেরোসিনের আকাল। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরকারি ন্যায্যমূল্যের দোকানগুলোতে না পাওয়ার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ রয়েছে। রাস্তাঘাট জলমগ্ন। কোথাও গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে সংযোগরক্ষাকারী একমাত্র সেতুটি বন্যার জলে ভেসে গিয়েছে। স্বাভাবিক কারণে সরকারি সরবরাহ এসে পৌঁছুতে পারছে না। কথাটি শতকরা শতভাগ সত্যি। কিন্তু প্রশ্ন হল, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন গ্রামগুলোতে সরকারি সরবরাহ পৌঁছুতে না পারলেও বেসরকারি স্তরে যোগান অব্যাহত থাকছে কী করে? গ্রামের দোকানগুলোতে জিনিসপত্র পাওয়া যাচ্ছে না, তা ঠিক নয়। পাওয়া যাচ্ছে, তবে বেশি দামে। এই দুঃসময়ে টাকা দিলে বাঘের দুধের মতো চাল কেরোসিনও জুটছে।

বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির দৌলতে টাকা দিলে এখন অনেক দুর্লভ জিনিসও পাওয়া যাচ্ছে — যা আগে কখনও ভাবাও যায়নি — বাঘের দুধ তো তুচ্ছ। টাকা দিলে এখন মাতৃজঠর ভাড়া পাওয়া যায়। বিদেশে তো অনেকদিন 'ভাড়া দেবার জন্য আগ্রহী' বলে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন। কোনও মা শারীরিক ত্রুটির কারণে নিজের জরায়ুতে সন্তান ধারণে অক্ষম হলে অন্য মহিলার জরায়ু সাময়িক কালের জন্য ভাড়া নিতে পারেন। চুক্তি অনুসারে ভাড়ার টাকা মিটিয়ে দিলে ভূমিষ্ঠ শিশুটির উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে প্রথম মায়ের। এ যেন, 'না বিইয়ে যশোদারানি কানাইয়ের মা'। টাকা দিলে বাঘের দুধ মেলে, না দিলে কিছুই মেলে না।

নাচ-গান কিছু না

কত ধরনের যে ব্যবসা বা বাণিজ্য আছে তা ভেবে অবাক হতে হয়। লোকে দ্রব্যসামগ্রী বিক্রি করে টাকা উপার্জন করে আবার কিছু লোক আছে কোনও দ্রব্যসামগ্রী নয়, স্রেফ টাকা কিনে বেচে টাকা উপার্জন করে। যেমন কিছু টাকা দিয়ে বর্তমান বাজারদরে বিদেশি মুদ্রা ডলার কিনলাম, পরে টাকার মূল্যে ডলারের দাম বাড়লে ঐ একই ডলার বিক্রি করে বেশি টাকা পেয়ে গেলাম। কোনও খাটাখাটুনি নেই, ধুলোবালি নেই, শার্টের কলারে ফুঁ দিয়ে অর্থোপার্জনের পথ এটি। আন্তর্জাতিক মুদ্রা বাণিজ্য বাজারের এখন খুবই রমরমা। ফোকটে বা বিনা পরিশ্রমে অর্থোপার্জনের যে কত পন্থা আছে তা গুনে শেষ করা যাবে না।

বিমা বা ইন্সুরেন্স কোম্পানিগুলোর বাণিজ্যও এরকমই। জীবনবিমা কোম্পানিগুলোর কথাই বলা যাক। অনেকেই জীবনবিমা করেন, শেষ প্রিমিয়াম দেওয়া অব্দি বহাল তবিয়তে বেঁচে থাকেন। খুব কম লোকই নির্দিষ্ট সময়ের আগে মারা যান। বিমার দৌলতে কোম্পানির কাছে প্রচুর অর্থ গচ্ছিত থাকে। তার ফলে, হিসেব করে দেখা গিয়েছে, বিমাকারী ব্যক্তি মারা গেলে যত লাভ, মারা না গেলে বেশি লাভ কোম্পানির। অ্যাক্সিডেন্ট বা আগুনে বিষয়-সম্পত্তি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনার ওপরও বিমার ব্যবস্থা আছে। বিমা মানে ফাঁকতালে ব্যবসা।

সব জেনেশুনে লোকে তবু বিমা করে। যদি অঘটন ঘটে, তখন সন্তানসন্ততিরা যেন অকূল সাগরে ভেসে না যায়। একসময় জীবনবিমা কোম্পানি সম্পর্কে অনেক অভিযোগ ছিল। মৃত্যুর পরে উত্তরাধিকারীদের বিমার টাকা পেতে জুতোর সুকতলা খইয়ে ফেলতে হত — তবু বিমার টাকা জুটত না। অহেতুক ফ্যাকড়া তুলত, তাতে জীবিত ব্যক্তির জীবনও দুর্বিষহ হয়ে উঠত। টাকা দেবার বেলায় ভোগান্তির জন্য শুধু বিমা কোম্পানি কৃতিত্বে এক নম্বর নয়। অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোও এ ব্যাপারে সমান দাবিদার। যারা পেনশন পান — তাঁরা জানেন ভোগান্তি কারে কয়। যথাসময়ে ঠিকঠাক পেনশন পেতে হলে, মার্চ মাসে বেঁচে আছেন এই সার্টিফিকেট দিলেই চলবে না, তার আগের মাসে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারিতেও আপনি যে বেঁচে ছিলেন তার জন্য আলাদা সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে। সরকারি আইন বলে কথা! বামুন ছিঁড়ে যাবে তবু পৈতা ছিঁড়বে না। বস্তুত পেনশান মানে যে দান-খয়রাতি নয় এটা অনেকে বুঝতে চান না। শর্তানুসারে, চাকুরিকালে ন্যায্য মাইনের চেয়ে কম মাইনে দেওয়া

হয়েছিল। এখন অবসর প্রাপ্তির পর বকেয়া পাওনা টাকাটা দেওয়া হচ্ছে। পেনশন নিয়ে যারা হৃদয়হীন ব্যবহার করছেন তারা জানেন না বা ভুলে যান একদিন তাদেরকেও রিটায়ার করে পেনশনের জন্যে হা-পিত্যেশ করতে হবে। ঘুঁটে যখন পোড়ে তখন গোবর হাসে বটে তবে তা মানায় না।

ইদানীং তরুণ প্রজন্মের জীবন দর্শনে পরিবর্তন এসেছে। এরা বিমা বা ইন্সুরেন্সে অনাগ্রহী। বেঁচে থাকাকালীন সময়ে জীবনকে উপভোগ করতে উৎসাহী বেশি ওরা। মৃত্যুর পরে উত্তরাধিকারীরা বিমা কোম্পানির কাছ থেকে ইন্সুরেন্সের টাকা ঠিকঠাক পাবে কী পাবে না কে জানে। ক্রেতা হল লক্ষ্মী। ক্রেতা মুখ ঘুরিয়ে নিলে কোম্পানির মাথায় হাত। এ সত্যটা পাগলেও বোঝে। তাই পাগল হলেও তাকে ভাত ফেলতে দেখা যায় না।

বিদেশে বিমাকারীদের সন্তুষ্টির জন্য কোম্পানিগুলো চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখছে না। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বিমার টাকা তুলে দিচ্ছে উত্তরাধিকারীর হাতে। একটি কোম্পানি অবশ্য এ ব্যাপারে অন্য সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে — এমনই দাবি ওদের। একজন জীবনবিমাকারী ব্যক্তি পা পিছলে একশ দশতলা বাড়ির ছাদ থেকে নিচে বড়ো রাস্তার ওপর পড়ে যাচ্ছিল। তার মৃত্যু অবধারিত। ঐ বাড়িরই ছেচল্লিশ তলায় ছিল বিমা কোম্পানিটির অফিস। উজ্জ্বল নজির হিসেবে একশ দশতলা বাড়ির ওপর থেকে শূন্যে পড়তে পড়তে যে মুহূর্তে ছেচল্লিশ তলায় এসেছে লোকটি, তক্ষুনি তার হাতে জানালা দিয়ে তারই জীবনবিমার পুরো টাকার ড্রাফ্‌ট গুঁজে দিয়েছে ওরা। ইন্সুরেন্সের টাকা পায় না গ্রাহকেরা, এই বদনাম আর যারই হোক এই বিমা কোম্পানির হবে না। নিজের বিমার টাকা মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে নিজেই গ্রহণ করেছে। গ্রাহক পরিসেবা আর কাকে বলে! নাম-ধাম উল্লেখ না করে আমি আমার নিজস্ব একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। একজন তরুণ একদিন এসে সারা সকাল জুড়ে আমাকে বোঝাল, আমার জীবন অমূল্য। ব্যক্তিগত কারণে তো বটেই, সামাজিক কারণেও আমার জীবনের সুরক্ষা দরকার। এক্ষেত্রে জীবনবিমাই প্রকৃত সুরক্ষা প্রদান করতে পারে। সুতরাং আর কালক্ষেপ না করে আমি যেন আমার জীবনবিমাটি করে ফেলি। বলাবাহুল্য তরুণটি একটি বেসরকারি জীবনবিমা কোম্পানির এজেন্ট। পরের মাসের প্রথমে আবার আসবে বলে তরুণটি গাত্রোত্থান করল।

অবাক কাণ্ড। পরের মাসের শুরুতে সে আর এল না! এমন তো হবার কথা নয়। কী ব্যাপার? আমি ভালো করে খোঁজ নিয়ে জানলাম, বিমা কোম্পানিটি হঠাৎ এজেন্টদের কমিশনের পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছে। এই স্বল্প কমিশনে এজেন্টদের পক্ষে লোকজনের বিমা করানো নাকি পোষায় না। সম্ভবত সেই কারণেই তরুণ এজেন্টটি আমার দরজা আর মাড়ায়নি। তরুণটি বলেছিল, আমার জীবন অমূল্য ব্যক্তিগত এবং সামাজিক — দুভাবেই। মজার ব্যাপার হল, বিমা কোম্পানি এজেন্টদের জন্য কমিশন কমিয়ে ফেলার ফলে আমার তথাকথিত

অমূল্য জীবন আচমকা মূল্যহীন হয়ে গেল — যা কিনা বিমা করার জন্যও আর যোগ্য নয়।

প্রয়াত ভীষ্মদেব ভট্টাচার্য ত্রিপুরার একজন স্বনামধন্য সাহিত্যিক। তাঁর লেখালেখিতে জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে সমসাময়িক জীবন। ভীষ্মদা একদিন আমাকে ঠাট্টাচ্ছলে বলেছিলেন, নাচ-গান কিছু না, আসলে মেঘনা বিড়ি।

খাঁটি কথা বলেছিলেন ভীষ্মদা। বাজারে বা মেলায় নাচ-গানের শব্দে আকৃষ্ট হয়ে ভিড় ঠেলে উঁকি মেরে দেখেছি — একটা লোক সঙ সেজে বিড়ি বিক্রি করছে।

মহাভারতের কথা অমৃতসমান

বার্ধক্য কখন আসে? প্রশ্নটি যত সহজ, উত্তরটি তত সহজ নয়। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়গুলো মোটামুটি এরকম — শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব এবং পরিশেষে বার্ধক্য। স্বাভাবিকভাবে বিভিন্ন স্তরগুলো পেরিয়ে এসে মানুষ তার বার্ধক্যে উপনীত হয়। বার্ধক্যের শেষে নেমে আসে যবনিকা। তাই বলা চলে, বার্ধক্য হল প্রতীক্ষাকাল। মজার ব্যাপার হল, জীবন, মানুষের দেওয়া সংজ্ঞা মেনে চলে না। জীবন প্রবাহিত হয় তার নিজস্ব ধারাতে। কেউ কেউ শৈশব থেকে যৌবনে চলে যায়, কৈশোর বলে তাদের জীবনে কিছু নেই। অনেক শিশুদের শৈশবও থাকে না, কৈশোর যৌবনও অনেকের হারিয়ে যায়। জীবন থেকে তাদের ঝরে যায় সোনালি দিনগুলো। কেন এমন হয়?

সংসার এক নির্মম জায়গা। এখানে অনেক কিছুই নিয়ম বা মানবিকতার সূত্র মেনে হয় না। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের কাঙালি তার মার মৃত্যুর পর মাত্র দুঘন্টার অভিজ্ঞতায় বুড়ো হয়ে গিয়েছিল। বুড়ো হবার নির্দিষ্ট কোনও বয়স নেই। এমনি মনে হতে পারে ষাট-সত্তর বয়স হলে লোকে বার্ধক্যে পৌঁছোয় বা বুড়ো হয়। অবশ্য বয়স দিয়ে কিছু মাপা যায় না। একসময় আমাদের দেশের মেয়েরা কুড়িতে বুড়ি হয়ে যেত। আর এখন?

আজকাল মেয়ে বোনঝিয়ের বিয়েতে মা-মাসিদের বিউটি পার্লারে সযত্ন রূপচর্চার ফলে বয়স দীর্ঘসময় একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকার জন্য, ভ্রম হয়, মনে হয়, ওদেরই কারো একজনের বিয়ে বুঝি আজ। সহপাঠিনী বান্ধবীদের কাছে আওয়াজ খেয়ে যে চক্‌রাবক্‌রা শার্টটি যুবা পুত্রটি পরা ছেড়ে দিয়েছে, বাবা সেটি পরেই অফিসে যাচ্ছে বুক চিতিয়ে। কে যে প্রকৃত যুবক, পিতা না পুত্র, বোঝা মুশকিল।

আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দৌলতে বার্ধক্যকে ঠেকানো সম্ভব। যৌবনকে করা যায় প্রলম্বিত — যা মানুষের চিরন্তন অভিলাষ। প্রাচীনকালের রাজা যযাতি এ ব্যাপারে অত্যাধুনিককালের প্রযুক্তিকেও টেক্কা দিয়েছিলেন। মহাভারত পড়ে জানা যায়, সম্ভবত যযাতির ডায়াবেটিস হয়েছিল। ডায়াবেটিস হলে যা হয়, শর্করা বৃদ্ধির ফলে যযাতির চামড়া কুঁচকে যায়, শরীরের যন্ত্রপাতি সব বিকল হতে আরম্ভ হয়। যৌবন ক্ষণস্থায়ী হয়ে যযাতির জীবনে অসময়ে বার্ধক্যের আবির্ভাব ঘটে। অনেক বিত্ত এবং সম্পদের অধিকারী হয়েও যযাতি সুখ ভোগে বঞ্চিত। কামনা-বাসনা সবই অতৃপ্ত থেকে যায় তাঁর। মৃত্যু সমাসন্ন জেনে রাজা যযাতি আরও বেশি অধীর হয়ে ওঠেন। স্বার্থপরের মতো তিনি যে কোনও মূল্যে যৌবন ফিরে পেতে চান। ডায়াবেটিসের ফলে সম্ভবত যযাতির দুটি কিডনিই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্টেশানের মাধ্যমেই যযাতি ফিরে পেতে পারেন যৌবন, এটা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। যযাতির পাঁচ পুত্রের মধ্যে দেবযানীর গর্ভে জন্মেছিল যদু এবং তুর্বসু আর শর্মিষ্ঠার গর্ভে জন্মেছিল দ্রুহ্য, অনু এবং পুরু। যযাতি পুত্রদের কাছে কিডনি চাইলেন। পুত্রেরা চালাক চতুর। তারা জানে, কিডনি দিলে, যে দেবে কিডনি তাকে জরাগ্রস্ত হতে হবে। কেউই রাজি হয়নি কিডনি দিতে বাবাকে। বাবা তখন লোভ এবং ভয় দেখালেন, তিনি বললেন, যে কিডনি দেবে তাকে রাজা করব। আর যারা দেবে না, তাদের দূর দূর করে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দেব। পুত্রদের মধ্যে পুরু ছিল সবার ছোটো এবং তুলনামূলকভাবে খানিকটা বোকাসোকা। কনিষ্ঠ পুত্রের কিডনি দানের ফলে যযাতি ফিরে পান যৌবন এবং অকালজরা থেকে মুক্তি। দীর্ঘকাল ধরে কামনা-বাসনা তৃপ্তির পর যযাতির অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও একসময় শিথিল হয়ে আসে বার্ধক্যের বিলম্বিত আগমনের ফলে। মৃত্যু অনিবার্য জেনে যযাতি পুত্র পুরুকে তার দেয়া কিডনি ফেরত দেন এবং শর্তানুসারে তাকে সিংহাসনে বসান। এটা মহাভারতের উপাখ্যান। মহাভারতের উপাখ্যান এখনও সমানভাবে সত্যি। অর্থবল থাকলে এখনও বার্ধক্যকে রুখতে পারা যায়। পারা যায় যৌবনকে প্রলম্বিত করতে। মহাভারতের উপাখ্যান। কালের চেয়ে এখন আরও বেশি পারা যায়। আপন পুত্র-কন্যার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত না করে, বাজারেই কিনতে পাওয়া যায় প্রয়োজনীয় বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। দাম দিতে প্রস্তুত থাকলেই হল — এখন কিডনি পেতে হলে মোটামুটি এক লক্ষ টাকা দিলেই হয়। রাজ্যপাট দেয়ার দরকার নেই। যত দিন যাচ্ছে,

অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রীর মতোই শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দামও কমছে।

হৃদযন্ত্রের বৈকল্যের জন্য অফিসের একজন সহকর্মী সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতে পারতেন না। নিচুকণ্ঠে চিঁহি চিঁহি করে কথা বলতেন। ইতিমধ্যে লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাইপাস সার্জারি করে এসে এখন দোতলা তিনতলা করছেন অবলীলায়। তার রিটায়ারমেন্টের মাত্র বছর দেড়েক বাকি, অথচ এখন দেখলে মনে হবে চল্লিশ অনুর্ধ্ব যুবক। বার্ধক্যকে ঠেকিয়ে তিনি এখন উৎফুল্ল জীবনযাপন করছেন।

আসলে দারিদ্র্যের সঙ্গে বার্ধক্যের একটা ওতপ্রোত সম্পর্ক আছে। অধিক দারিদ্র্য মানে আগে আগে বার্ধক্য। দারিদ্র্য হটলে বার্ধক্যও সাময়িকভাবে হটে যায়। মহাভারতের যযাতি গরিবগুর্বো মানুষ যদি হতেন, তাঁর অর্থ-বিত্ত-রাজ্য না থাকত, তবে তিনি কিডনি সংস্থাপন করতে সক্ষম হতেন না। তাঁকে জরাগ্রস্ত হয়ে অকালে মৃত্যুবরণ করতে হত। মহাভারতের কথা হত তখন অন্য রকমের।

জুতা না-আবিষ্কার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জুতা আবিষ্কার' একটি বিখ্যাত কবিতা। ছোটোবেলায় কবিতাটি পড়েনি, এরকম বাঙালি প্রায় নেই বললে ভুল বলা হবে না। বস্তুত 'জুতা আবিষ্কার' কবিতা নয়, একটি জোরালো শ্লেষাত্মক গল্প। হাঁটতে গেলে চরণ ধূলিময় হয়ে যায় — এর থেকে নিষ্কৃতি পাবার পথ কী? এর উত্তর খুঁজতে গিয়েই জুতা আবিষ্কার হয়েছে। তবে আবিষ্কারের পেছনের পর্যায়ক্রমগুলো খুবই চিত্তাকর্ষক এবং হঠকারিতাপূর্ণ। বিশেষজ্ঞেরা, যাদের ওপর ন্যস্ত হয়েছিল ধুলোর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় উদ্ভাবনের, তাঁরা অনেক পিপে নস্যি বিনষ্ট করে উদ্ভট সব সুপারিশ করেছিলেন। ঝাড়ু দিয়ে পৃথিবী থেকে ধুলোকে নিশ্চিহ্ন করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন তাঁরা। তাতে উল্টো পৃথিবীটি ধুলোময় হয়ে গেল। একসময় ভুবন জুড়ে জল ঢেলে ধুলোকে কাবু করতে বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দিয়েছিলেন। ফলে পৃথিবীটা কর্দমাক্ত হয়ে উঠল। একটা ক্ষুদ্র সমস্যাকে সমধান করতে অন্য একটা বৃহৎ সমস্যাকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসতে পণ্ডিতদের জুড়ি নেই। শেষ পর্যন্ত পণ্ডিত বা বিশেষজ্ঞ কেউ নয়, একজন

সাধারণ ছাপোষা মানুষ তার স্বভাবজ বাস্তব বুদ্ধি থেকে জানাল, ধুলোর হাত থেকে পদযুগল বাঁচাতে হলে বিশ্বকে ঝাড়ু দিয়ে ধুলোময় বা জল ঢেলে কাদা করার দরকার নেই। বিশ্বকে ঢাকারও দরকার নেই, শুধু চরণযুগলকে চর্ম দিয়ে ঢাকলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। এভাবে আবিষ্কৃত হল জুতো। সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সেদিন।

ত্রিপুরা এবং বাংলাদেশের সীমান্ত বরাবর কাঁটাতারের বেড়া দেবার কাজ চলছে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জুতা আবিষ্কার' কবিতাটি প্রাসঙ্গিক এবং তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে। একসময় ত্রিপুরা এবং বাংলাদেশের মধ্যে কোনও বিভেদের প্রাচীর ছিল না। স্বাধীনতার আগে পূর্ববঙ্গ এবং করদ রাজ্য ত্রিপুরা ছিল অবিভক্ত ভারতের অন্তর্ভুক্ত।

ভারত স্বাধীন হল, পূর্ববঙ্গ হল পূর্ব পাকিস্তান। হিল ত্রিপারা হল ত্রিপুরা আর সমতল ত্রিপারার অন্তর্গত চাকলা রোশনাবাদ পূর্ব পাকিস্তানের অধীনে চলে গেল। মূলত রাজনৈতিক কারণে ভৌগলিক মানচিত্রে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন এবং পরিমার্জন হল।

তাছাড়া আর সবই রইল আগের মতো। পাসপোর্ট ভিসার মাধ্যমে যত লোক এপার ওপার হয়, তার চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশি লোক পারাপার হয় তথাকথিত অবৈধভাবে। সীমান্ত সংলগ্ন অঞ্চলে যারা বসবাস করে তাদের আবার এপার ওপার কী? এমনও দৃষ্টান্ত আছে, কারোর রান্নাঘর বাংলাদেশে তো, শোবার ঘর ত্রিপুরায়। এসব ক্ষেত্রে সীমান্তরেখা অর্থহীন। ঘটনাচক্রে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে ভারতের চেয়ে অনুন্নত। যেখানে কর্মসংস্থান এবং আয়ের সম্ভাবনা বেশি, অনুন্নত অঞ্চল থেকে সেখানে শ্রম এবং অন্যান্য সম্পদ ধেয়ে আসবেই। বছর দশেক আগে আমি একবার বাংলাদেশে গিয়েছিলাম, সেখানকার একজন প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আমাকে বলেছিলেন, বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়া পুকুর বা খাল বিলের এক বিঘৎ কৈ মাছ কানকো দিয়ে পথ চলে কাছাকাছি বাজারের বদলে দূরের আগরতলার বাজারে গিয়ে ওঠে। তাজ্জব কাণ্ড বটে!

ইলিশ (নদীর রুপালি শস্য) রসনা তৃপ্তির জন্য একটি অবশ্য গ্রহণীয় মৎস্য। প্রায় সারা বছর ত্রিপুরার বাজারগুলোতে ইলিশ মাছের উপস্থিতি এক অনির্বচনীয় নান্দনিকতার নিদর্শন।

এখন প্রশ্ন হল, এই ইলিশ মাছ ত্রিপুরার কোন্ পুকুরে বা কোন্ নদীতে ভূমিষ্ঠ এবং লালিত পালিত হয়? জ্যান্ত কৈ কানকো দিয়ে হেঁটে বাংলাদেশ থেকে এদেশে আসে মেনে নিলেও, মৃত ইলিশ স্রোতের উল্টো দিকে ভেসে কী করে ত্রিপুরায় আসে? সব একমাত্র অর্থনৈতিক কারণে। সবাই জানে, বাংলাদেশ থেকে দিনমজুর রিক্সাচালকেরা এখানে আসে রুজি রোজগারের জন্য। দিনের শেষে উপার্জন করে আবার তারা ফিরে যায়। তুলনামূলকভাবে তাদের কাছে সস্তায় শ্রম বা পরিসেবা পাওয়া যায় বলে তাদের আমরা পছন্দ করি। আবার

উল্টোটাও সত্যি, ত্রিপুরা থেকে নয়জন ডেকোরেশানের কাজ জানা শ্রমিক বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কাজ করতে গিয়ে ধরা পড়ে গ্রেপ্তার হয়। মরশুমের সময় খোয়াই কমলপুরের অনেক মজুর ওই পারে গিয়ে পানের বরজে শ্রম বিক্রি করে আসে।

এগুলো জানে অনেকে, তবে না জানার ভান করে তৃপ্তি খুঁজে পায় সবাই। এখন সীমান্ত জুড়ে কাঁটা তারের বেড়া নির্মাণের কাজ চলছে জোর কদমে। এতে খরচ হবে প্রায় হাজার কোটি টাকা। বেড়া নির্মাণের উদ্দেশ্য হল, এপার-ওপার অবৈধভাবে মানুষ চলাচল এবং দ্রব্যসামগ্রীর স্মাগলিং বন্ধ করা। এই উদ্দেশ্য আপাত দৃষ্টিতে মহৎ হলেও কতটা কার্যকরী হবে বলা মুশকিল।

সংবাদে প্রকাশ, কাঁটাতার টপকানোর জন্য সীমান্তবাসীরা উঁচু উঁচু মই বানাচ্ছে। দ্রব্য সামগ্রী পারাপার করতে এখন খরচ বেশি পড়বে অনেক ব্যক্ত এবং অব্যক্ত কারণে।

তাছাড়া কাঁটাতার দেয়ার ফলে ত্রিপুরার অনেক উর্বর ভূখণ্ড চাষিদের নাগালের বাইরে চলে গেল। আন্তর্জাতিক নিয়মানুসারে দেড়শ মিটার উন্মুক্ত অঞ্চল হিসেবে রাখতে হয়। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, ভারতীয় কৃষকেরা নিজের জমিতে চাষবাস করার অধিকার পাবে যখন কাঁটাতারের বেড়ার মাঝে গেট খুলে দেয়া হবে।

যদি জমির ফসল লুণ্ঠিত হয়ে যায়, বেড়া পেরিয়ে তা রক্ষা করার কোনও উপায় নেই। যেখানে জমির পরিমাণ সীমিত, যেখানে জনসংখ্যা অধিক, সেখানে কাঁটাতারের বেড়া দেয়ার প্রচেষ্টাই হল দুর্মূল্য বিলাসিতার নামান্তর। যে কারণে পাচার বাণিজ্যের এবং লোক পারাপারের রমরমা — তা বন্ধ করলেই হয়। কাঁটাতারের বেড়ার কোনও প্রয়োজন ছিল না।

একসময় বার্লিন শহরকে ভেঙে মাঝখানে প্রাচীর তুলে দেয়া হয়েছিল লোকজন পারাপার রুখবার জন্য। এখন অবশ্য প্রাচীর ভেঙে দেয়া হয়েছে। আজকের ভুবনায়নের যুগে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ কতটা প্রাসঙ্গিক, তা প্রশ্নাতীত নয়। যদি ইতিহাসের শিক্ষণ মেনে নেয়া যায়, তবে এই কাঁটাতারের বেড়া একদিন উৎপাটিত হবে এবং হবে অর্থনৈতিক কারণে। সাময়িক এবং তাৎক্ষণিক লাভালাভের প্রশ্নে অনেক সময় রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে হয় যেগুলোর কোনো অর্থনৈতিক ভিত্তি নেই। সময়ের ধোপে এগুলো টেঁকে না।

আজকের লেখাটি বরং শেষ করি একটা প্রাসঙ্গিক রসসিক্ত ছোট্ট গল্প দিয়ে। ভোট প্রার্থী একজন ক্যান্ডিডেট, তার নির্বাচনী প্রচার সভায় ভোটারদের আকৃষ্ট করার জন্য প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি বইয়ে দিচ্ছেন। একসময় তিনি বললেন, আমি জিতলে এই এলাকায় একটা ব্রিজ বানিয়ে দেব। শ্রোতাদের মধ্যে একজন দাঁড়িয়ে বলে উঠল, আপনি ব্রিজ কোথায় বানাবেন, আমাদের এখানে কোনও নদী নেই যে। প্রার্থী তখন বললেন, ঠিক আছে। প্রয়োজন হলে আমি আপনাদের জন্য একটা নদীও বানিয়ে দেব।

বই বনাম পাশবই

ত্রিপুরা পাব্লিশার্স গিল্ডের সপ্তাহব্যাপী 'পুস্তক মেলা' সাড়ম্বরে চলছে শহরের প্রাণকেন্দ্র রবীন্দ্র ভবনের আঙিনায়। এমনিতে বইয়ের বেচা বিক্রি কেমন হচ্ছে আন্দাজ করতে না পারলেও পুস্তক মেলায় প্রতিটি সন্ধে আলোচনা বিতর্ক এবং আড্ডায় যে মশগুল হয়ে উঠছে সে বিষয়ে কোনও সংশয় নেই। গিল্ড কর্তৃপক্ষ প্রতিদিন সন্ধেয় এমন সব উস্কানিমূলক বিষয়বস্তুর উপর বিতর্ক বা আলোচনার আয়োজন করছে যে, এই শীতের সায়াহ্নেও উত্তেজনার উষ্ণতা ছড়িয়ে পড়ছে বক্তাদের অতিক্রম করে নিরীহ নিরুত্তাপ শ্রোতাদের মধ্যেও।

'বইমেলা লেখক তৈরি করে না' এইটি ছিল এক সন্ধের বিতর্কের বিষয়। বিতর্কের পক্ষে বিপক্ষে অংশগ্রহণ করেছিলেন ত্রিপুরার অতীত এবং বর্তমানের ডাকাবুকো এবং জাঁদরেল লেখক কবিরা। এমনিতে বক্তারা অন্তরঙ্গ বন্ধু হলও বিতর্কে কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলেননি। উত্তেজনায় টান টান বিতর্কসভা একটা সময় এমন অবস্থায় পৌঁছেছিল, তখন কে যে পক্ষে বা কে যে বিপক্ষে বলছেন বুঝতে পারা মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঘটনাচক্রে পরিস্থিতি এমনও হয়েছে, বিপক্ষের বক্তা কিছুক্ষণ বিপক্ষে বলে নিজেরই অজ্ঞাতসারে শেষের দিকে পক্ষের যুক্তিজাল বিস্তার করতে শুরু করেছেন। বিতর্ক অনুষ্ঠানটির সঞ্চালক ছিলেন যশস্বী প্রাবন্ধিক বিকচ চৌধুরী। আর পক্ষে ছিলেন অন্য সবাইয়ের মধ্যে, এককালের ডাকাবুকো কবি অজিত ভৌমিক এবং বিপক্ষে ছিলেন ষাটের দশকের দুর্ধর্ষ গদ্যশিল্পী মানস দেববর্মা। মজার ব্যাপার হল, শ্রোতাদের বিচারে দুপক্ষেরই পালের হাওয়া কুড়িয়ে নিয়েছিলেন সেদিন গল্পকার হরিভূষণ পাল। পুস্তকমেলার অন্য একদিনের আলোচনার বিষয় ছিল 'ত্রিপুরার লিটল ম্যাগ ও ত্রিপুরার লেখকদের বই স্থানীয় লেখকরাই কেনেন না'। উস্কানিমূলক বিষয়টির অন্তর্নিহিত অর্থ হল, লেখকরা নিজেরাই অন্য লেখকের বই কিনে পড়েন না, তো পাঠকেরা লেখকের বই কিনে পড়বে কেন? মজার ব্যাপার হল, বই কেন শুধু কিনে পড়তে হবে? বই না কিনেও পড়া যায়। এই প্রসঙ্গে স্বনামধন্যা লেখিকা মীনাক্ষী সেন তাঁর ভাষণে কালজয়ী সাহিত্যিক মার্ক টোয়েনের ব্যক্তিগত জীবনের একটি গল্পের উল্লেখ করলেন। এক বন্ধু মার্ক টোয়েনের বাড়িতে গিয়ে একদিন দেখেন সমস্ত মূল্যবান বইপত্রগুলো ঘরের মেঝেতে ছড়ানো। বইগুলো মেঝেতে

ছড়ানো কেন, প্রশ্নের উত্তরে মার্ক টোয়েন জানালেন, এই বইগুলো বন্ধুদের বাড়ি থেকে পড়বার নাম করে আনা হয়েছে। আর ফেরত দেয়া হয়নি। কোনও কোনওটা অবশ্য মালিককে না জানিয়ে স্রেফ চুরি করে আনা হয়েছে। মূলত এগুলো সব চুরি করা বই। মেঝেতে রাখা হয়েছে অগত্যা এজন্য যে বই চুরি করে আনা গেলেও বই রাখার জন্য র‍্যাক চুরি করে আনা যায়নি।'বইমেলা লেখক তৈরি করে না ' বা 'লেখকেরা নিজেরাই অন্য লেখকের বই কিনে পড়েন না' — এইসব বিষয়বস্তু পরোক্ষভাবে 'পুস্তক মেলা' আয়োজনের বিপক্ষে যায়। এই বিপক্ষগামী স্রোতকে কীভাবে স্বপক্ষে টেনে আনা যায় এ নিয়ে বিস্তর রাগ অভিমান এবং ক্ষোভ প্রকাশিত হয় অনেক হৃদয়বান এবং সংবেদনশীল লেখক পাঠকের কথাবার্তা এবং ব্যক্তিগত আলোচনায়।

আবেগ এবং অভিমানকে পাশে সরিয়ে রেখে খানিকটা নির্মোহ আলোচনা করা যাক। বইমেলা কেন লেখক তৈরি করবে? লোকে বই পড়ে না আজকাল। বই পড়ে আমার লাভ কী? নিজেকে নিজে একটা প্রশ্ন করি, শেষ বই কবে পড়েছি আমি? মনে পড়ে না। পরীক্ষা পাশের বই বা ডিপার্টমেন্টাল প্রমোশনের জন্য পরীক্ষার বইয়ের কথা আলাদা। সত্যি কথা বলতে কী, আমি বই পড়তে যাব কোন্ দুঃখে? লেখালেখি বই পড়ার দিন প্রায় শেষ এখন। একসময় লোকজন প্রয়োজনে চিঠি লিখত। আজকাল চিঠি লেখার পাটও উঠে গিয়েছে। পত্র সাহিত্য যেকোনও ভাষার একটি সমৃদ্ধ অঙ্গন। চিঠি লেখার দরকার নেই আর। কোনও ছেলে একসময় তার মাকে চিঠি লিখছে, তার শেষ লাইন হল, মাগো, তোমাকে শতকোটি প্রণাম — এরকম চিঠির কথা শুনলে ছেলে তো হাসবেই এমনকি একালে মাও হাসবে। প্রেমিক প্রেমিকাকেও চিঠি লেখে-না আজকাল। আগে একসময় লিখত, পাখির মতো ডানা থাকলে উড়ে তোমার কাছে চলে যেতাম। এখন ডানার দরকার নেই, মোবাইল ফোনে উড়ে যাবার আরও আগে তার কাছে পৌঁছে যাওয়া যায়। প্রযুক্তি এবং অর্থনীতিই বদলে দিচ্ছে জীবনের নীলিমা। পুস্তক মেলার এক অন্তরঙ্গ আড্ডায় আমার বন্ধু চিরযুবা ষাটোর্ধ্ব কবি দিব্যেন্দু নাগ বলল, 'কথায় কথায়' কলামটি তার ইদানীং ভালো লাগছে না। অর্থনীতির কচকচি বড্ড বেশি হয়ে যাচ্ছে। জীবন অর্থনীতিরও অধিক।

কথাটা ঠিক, আবার ঠিক না। ত্রিপুরা পাবলিশার্স গিল্ড আয়োজিত পুস্তকমেলার পরিপোষক হিসেবে একাধিক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এবং ব্যাংক এগিয়ে এসেছে। মেলায় ঢুকতেই ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার কাউন্টার। সেখানে বিরাট এক পোস্টার যা একবাক্যে নজর কেড়ে নেয়। তাতে লেখা, 'সব বইয়ের সেরা বই / ইউ বি আইয়ের পাশবই।' গ্রাম্য প্রবচনে বলা হয়, 'যার শিল যার নোড়া / তারই ভাঙি দাঁতের গোড়া।' বইমেলায় বইয়ের নয়, সেখানে ব্যাংকের পাশবইয়ের প্রশংসা। তাহলে আমরা যাই কোথায়!

জীবন ও প্রযুক্তি

সুভাষ মুখোপাধ্যায় আমার প্রিয় কবিদের মধ্যে একজন। তাঁর অনেক আস্ত কবিতা আমার একসময় মুখস্থ ছিল। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে আমি সেগুলো উদ্ধৃত করতে পারতাম। এখন আর সেভাবে পারি না — স্মৃতি প্রায়শই অসহযোগ করে। বিক্ষিপ্তভাবে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের একটি কবিতার একটি লাইন এখন অস্পষ্ট মনে পড়ছে। লাইনটি হল, 'আমি দেখেছি মানুষ জলের ঘাড় ধরে আদায় করছে বিদ্যুৎ।' সেই বিদ্যুৎ দিয়ে মানুষ কী কাণ্ডই না করছে। বিদ্যুৎ জীবনকে মসৃণ এবং স্বচ্ছন্দ করে তুলতে সাহায্য করছে। বিদ্যুৎ হল একটি প্রযুক্তি। প্রতিটি আবিষ্কৃত প্রযুক্তি আমাদের দাস — প্রয়োজন মেটাতে আমাদের হুকুম তামিল করতে সদা প্রস্তুত। প্রযুক্তি হল যন্ত্র — একটা সীমাবদ্ধতা থাকলেও তার নিজস্ব ইচ্ছে বা অনিচ্ছে বলে কিছু নেই। একবার প্রযুক্তিকে করায়ত্ত করতে পারলে তার যথার্থ ব্যবহার করা বা না করাটা নির্ভর করে মানুষের প্রয়োজনের ওপর।

টি ভি-র রিমোট কন্ট্রোল একটা প্রযুক্তি। টি ভি অন বা অফ করার জন্য বারে বারে উঠে গিয়ে স্যুইচ অন অফ করা প্রচণ্ড বিরক্তিকর। রিমোট কন্ট্রোল দূরদর্শনের পর্দায় আঠার মতো আটকে থাকা চক্ষুযুগলকে বিরক্তির হাত থেকে পলকে উদ্ধার করতে সক্ষম।

স্বামী-স্ত্রী রাত্রিবেলায় বিছানায় উঠে এসেছে। এখন নিদ্রাদেবী আসার পালা। কিন্তু দেখা গেল, নিদ্রাদেবী আসছেন না, কেননা ঘরে জ্বল-জ্বল করে আলো জ্বলছে। বিছানা থেকে আবার নেমে কে নেভাবে আলো, এ নিয়ে দাম্পত্য কলহের সূচনা যে কোনও অছিলায় গুরুতর পরিণতিতে পৌঁছুতে পারে। কী সেই পরিণতি — তা এখানে বিশদভাবে বলার দরকার নেই। সংসারের মধ্যবয়সি দম্পতিরা তা হাড়ে হাড়ে জানে। অযথা তা উল্লেখ করে আমি আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে চাই না। সম্প্রতি আমি মহানগরের পরিবারে দেখে এসেছি — একটি নতুন প্রযুক্তি আয়ত্তাধীন হয়েছে বিবদমান দম্পতির। এই প্রযুক্তির সুবাদে লাইট না নিভিয়ে ভুলে বিছানায় উঠে গেলেও আবার নেমে ওয়ালের কাছে গিয়ে স্যুইচ অফ করে আলো নেভাতে হয় না। হাততালি দিলেই শব্দের তরঙ্গে আলো নেভে এবং জ্বলে। একবার হাততালি দিলে বাল্বের আলো জ্বলে ওঠে, পরপর দুবার হাততালি দিলে বাল্বের আলো নিভে ঘরে নিকষ অন্ধকার নেমে আসে। 'একহাতে তালি বাজে না' কথাটা ঠিক, কিন্তু হাততালিতে

সংসারের দাম্পত্য কলহের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং সেটা ঘটে প্রযুক্তির দৌলতে। বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি থেকে নেমে চাবি দিয়ে গ্যারেজের তালা খোলা এক ঝকমারি কাণ্ড।

এখন এক প্রযুক্তি এসে গিয়েছে, গাড়িতে বসে টি ভি-র মতোই রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে গ্যারেজের শাটার খোলা যায় অনায়াসে। এমন কম্প্যুটার এসেছে যেখানে কি-বোর্ডে টাইপ করার দরকার নেই। হুকুম দিলে কণ্ঠস্বর শুনেই নিজে নিজে টাইপ করে নেবে। গলা শুনে কম্প্যুটার চিনতে পারে — এটা কার কণ্ঠস্বর, দাদাবাবু না দিদিমণির।

একসময় ভাবা হত, মোবাইল টেলিফোন একটি হাই-ফাই প্রযুক্তি, একমাত্র বড়লোকেরা তা ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে মোবাইল ফোন তথাকথিত কৌলিন্য হারিয়ে যত্রতত্র ছড়িয়ে পড়ছে। বাংলাদেশে আমি দেখেছি, গ্রামীণ ব্যাংকের গ্রামীণ মোবাইল ফোন নিয়ে ফোন পরিসেবা দুয়ার থেকে দুয়ারে ফেরি করে ফিরছে মলিনবেশী মধ্যবয়স্কা গ্রাম্য মহিলা। আমাদের দেশে ফোন করতে হলে নির্দিষ্ট পি সি ও-তে যেতে হয়। আর বাংলাদেশে পি সি ও নিজেই ঘুরে বেড়ায়। প্রায়শই বাংলাদেশে ঝড়বাদল হয় বলে সেখানের ল্যান্ডলাইন টেলিফোন পরিসেবার অবস্থা খুবই শোচনীয়। সেক্ষেত্রে মোবাইল পরিসেবা নির্ভরশীল, তাই বহু বিস্তৃত। মোবাইল ফোন পরিসেবা বিক্রি করে অনেক গ্রামীণ মহিলা অর্থোপার্জনের মাধ্যমে সংসারের অভাব অনটনকে প্রতিরোধ করতে সমর্থ হয়েছে। সম্প্রতি মুম্বইয়ে দেখলাম, বাড়ি বাড়ি ফেরি করে বিক্রি করে বেড়ায় কাঁচা শাক-সব্জি যে মহিলা, তার আঁচলেও বাঁধা আছে একটি মোবাইল ফোন। আরব সাগরমুখী একটি একুশতলা অট্টালিকার যোলোতলায় মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন চলছে। আমি আমন্ত্রিতদের মধ্যে একজন। হঠাৎ গৃহকর্ত্রী মোবাইলে ফোন করলেন কাকে যেন। তাঁর কণ্ঠে উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠা ঝরে পড়ছে। তিনি বলছেন, কী হল ? তুমি ফুলকপি মটর সব দিয়েছ ? কিন্তু লেবু দাওনি কেন ? ঘরে মেহমান এসে গিয়েছে। আমি কী করি এখন ?

ওপার থেকে সব্জিওয়ালি হেসে বলল, মাইজি, লেবু দিইনি নাকি ? চিন্তা মৎ করো। এ বাড়িরই অন্য তলায় অন্য ফ্ল্যাটে আছি আমি। এক্ষুনি নিম্বু পৌঁছে দিচ্ছি তোমাকে।

ফোন রাখতে না রাখতেই দরজায় কলিংবেল বাজল। খুলতেই দেখা গেল আকর্ণবিস্তৃত হাসমুখ্য সব্জিওয়ালি। মুশকিল আসান হল।

প্রযুক্তি আসলে নিরপেক্ষ — প্রযুক্তি আসলে ক্রীতদাস। তবু কেন যে জীবন মসৃণ হয়েও মসৃণ নয়, সেটাই বড় প্রশ্ন। এই প্রযুক্তির জয়জয়কারের দিনেও, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, তাঁর একটি কবিতার অংশ খুবই প্রাসঙ্গিক — (যা স্মৃতি থেকে উদ্ধৃত করছি) ... যার হাত আছে কাজ নেই / যার কাজ আছে তার ভাত নেই / যার ভাত আছে তার হাত নেই / ... কেন এমন হয়, কেন এমন হবে ?